सम् उ माम्य



अभिन्यस्त द्वार

% श्री ३ क्रीशिकी ३%

প্রথম ভাগ

रिपम मार्थित्रदी

প্রকাশন শ্রীমতী শ্রীলা রাজের আঁকা। এ গ্রন্থের কপিরাইট শ্রীমতী লীলা রাজের।

ভিতরের নামাপ্কন শ্রীমতী গীতা রায়ের।

প্রথম প্রকাশ প্রাবণ ১৩৬৩

তিন টাকা

প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজ্বুমদার ডি এম লাইরেরী ৪২ কর্ন ওয়ালিস স্ট্রীট কলকাতা

শুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় শ্রীগোরাংগ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা

মাতৃস্ম,তি পিতৃস্ম,তি

ভূমিকা

বছর বোলো বখন আমার বরুস তখন আমার হাতে এলো টলস্টরের ছোট-গলেপর বই। বার ইংরেজী নাম "টোরেন্টি প্লী টেল্স্।" বইখানি আমি পরুক্ষার পেরেছিল্ম, সেইজন্যে আমার চোখে তার এত দাম। তার একটি গলেপর বাংলা অনুবাদ করে সেই বরুসেই "প্রবাসী"-তে পাঠিয়ে দিই। সংশ্যে সংশ্যে চার্ বন্দ্যোপাধ্যারের পোস্টকার্ড আসে। মঞ্জ্র! তার পরের সংখ্যাতেই ছাপা হয়। তাজ্জব!

বাংলা মাসিকপত্রে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। বাঁর কল্যাণে একটি ষোলো বছরের ছেলে "প্রবাসী"-র আসরে আসন পেলো সেই টলস্টরের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক। টলস্ট্য় আমি মন দিয়ে পড়ি। বছর দ্ব'তিন পরে লাইরেরীতে গিয়ে "আনা কারেনিনা" পাঠ করি। তার দ্ব'এক বছর পরে "হোয়াট ইজ আর্ট।"

টলস্টরের জীবনকে দ্'ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যখন তাঁর অন্তঃপরিবর্তন হয়নি, যখন থেকে তাঁর অন্তঃপরিবর্তন হয়। যেমন আমাদের চণ্ডাশোক ও ধর্মাশোক তেমনি চণ্ড-টলস্টয় ও ধর্ম-টলস্টয়। আমার প্রথম পরিচয় ধর্ম-টলস্টয় বা খাষি টলস্টয়ের সংগে। দ্বিতীয় পরিচয় চণ্ড-টলস্টয় বা ভাগী টলস্টয়ের সংগে। তৃতীয় পরিচয় আবার সেই ধর্ম-টলস্টয় বা খাষি টলস্টয়ের সংগে। তৃতীয় পরিচয় আবার সেই ধর্ম-টলস্টয় বা খাষি টলস্টয়ের সংগে! এ রকম উল্টো পাল্টা পরিচয়ের ফল দাঁড়ালো এই যে আমি তাঁর "হোয়াট ইজ আর্ট"-এর থিয়োরির সংগে তাঁর দ্ই বয়সের দ্'খানি বই মিলিয়ে দেখে "আনা কারেনিনা"-কেই বেশী পছন্দ করলম্ম। থিয়োরি থেকে যা এলো তাকে নয়, থিয়োরির আগে যা এসেছিল তাকেই। তার মানে চণ্ড-টলস্টয় বা ভোগী টলস্টয়ের প্রতি আমার পক্ষপাত দেখা গেল। এটা টলস্টয় নিজে চার্ননি। তিনি তাঁর "আনা কারেনিনা"-কে আর্টা হিসাবে ব্যর্থ মনে করতেন। কারণ ও-বই লেখার সময় তিনি ছিলেন পাপীতাপী মান্ম। টাকার জন্যে ও-বই লিখেছিলেন। ওতে কেবল বড়লোকদের কথা। সেসব বড়লোকও খারাপ লোক।

টলস্ট্র জীবিত থাকলে আমার এই বিপরীত মনোভাব দেখে পীড়া বোধ করতেন। আমি তখন "ফলেন পরিচীয়ুটে," এই আর্ষবাক্যকে টলস্টরের খবি-বাক্যের চেরে মান্য করতুম। "হোরাট ইজ আর্ট"-এর ফল এমন কী হলো! খবি এমন কী স্থিট করলেন! তিনি বা পারলেন না অন্যে তা পারবে কেন? আমি পারব কেন? আমি ও-থিরোরি সরাসরি থারিজ করল্ম। কী করে আর একখানা "আনা কারেনিনা" লেখা যার সেই আমার জিল্ঞাসা। কোন থিরোরি থেকে এলো "আনা কারেনিনা?" না, তার পিছনে কোনো থিরোরি নেই? যদি কোনো থিয়োরি না থাকলেও তেমন একখান ক্লাসক লেখা সম্ভব হয় তবে থিয়োরির আবশ্যক কী? কেন থিয়োরির মুখন্থ করব?

ভিদকে ঋষি ওয়ার্ড স্তরাথের একটি থিয়োরি ছিল, কতকটা ঋষি টলস্টয়ের মতো। তার থেকে কিছ্ম ভালো কবিতা এসেছিল, যেমন "টোয়েনটি প্রী টেল্স্" এসেছিল টলস্টয়ের থিয়োরি থেকে। আমি কিল্ডু শেলী কীটসের অধিকতর অনুরাগী ছিল্ম। যা আমাকে শেলী বা কীটসের মতো কবি না করবে তা নিয়ে আমি কী করব! কী করব তেমন থিয়োরি নিয়ে? কিল্ডু টলস্টয় এবং ওয়ার্ড স্তরার্থ দ্বেজনের দ্বিট থিয়োরি আমার মন না পেলেও মনের কোণ্ডে ঘরকলা পেতে বসল। সেখানে থেকে তাদের হটানো গেল না।

এমনি সময় ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাংকার। তিনিও তো একজন ঋষি। শোনা যাক তিনি কী বলেন এ সম্পর্কে। তিনি বললেন, উচ্চতর গণিত ক'জন ব্রুখতে পারে? তা বলে তাতে জল মিশিয়ে সাধারণের বোধগম্য করা যায় কি?—এই ধরণের কথা। আটের সঙ্গে উচ্চতর গণিতের তুলনা তখনকার দিনে আমার অন্তরের সায় পার্যান। তব্ এইটেই আমি মেনে নির্মেছি। আমার ভিতরে একজন উচ্-কপালে হাইরাউ ইনটেলেকচুয়াল ছিল, সে তার মনের মতো সাফাই পেয়ে বর্তে গেল। আরে, আমি কি সাধারণের জন্যে লিখতে পারি! আমি লিখব বিদেখদের জন্যে। ফরাসীতে যাঁদের বলা হয় এলিং।

তখনকার মতো একটা সমাধান তো পাওয়া গেল। তাই নিয়ে হলো আমার বালা শ্রের। সাহিত্যে আমি "পথে প্রবাসে" লিখে উপনীত হল্ম। সেই আমার উপনয়ন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রমথ চৌধ্রী মহাশয় লিখলেন ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ

রম ও শ্রীমতী

বললেন, তুমি এর ইংরেজী অনুবাদ করে ছাপাও না কেন? স্বতটা সাফল্য আমি প্রত্যাশা করিন। আমি ভালো করেই জানতুম যে আমার শিক্ষানবীশী যথেও কাঁচা। কত কাল যে এক মনে সাধনা করতে হবে তার ইয়ন্তা নেই। কেননা আমার লক্ষ্য ছিল টলস্টয়ের মতো লেখা। যে টলস্টয় "আনা কারেনিনা" লিখেছিলেন। শেলীর মতো লেখা। কটিসের মতো লেখা। রবীন্দ্রনাথের মতো লেখা।

কোনো রকম খিরোরিতে আম্থা না থাকায় আমাকে অপরের দৃষ্টাম্ত দেখে পথ চলতে হচ্ছিল। এব মতো তাঁর মতো। করেক জনের নাম করেছি। আরো করেকজনের করি। রম্যা রলাঁর তখন আমার উপর অপ্রতিহত প্রভাব। এখনো রোজ রাত্রে তাঁকে আমি স্মরণ করি। এটা অনেক দিনের অভ্যাস। আর তাঁর লেখা পড়িনে। কিন্তু তাঁর নৈতিক গ্রণগ্রিল পেতে চাই। রলাঁ ছিলেন স্বাধীন ও ম্ব, সপত্টবাদী, আপোসহীন। অথচ রসিক ও বিদম্ধ। রলাঁর পর গ্যেটের প্রভাব হলো তেমনি অপ্রতিহত। যেমন তাঁর "ফাউন্ট" তেমনি তাঁর "ভিল্হেল্ম মাইস্টার" আমাকে দিল একাধারে দৃষ্টান্ত ও দৃষ্টি। আমার জীবনদর্শনিটাই বদলে গেল। লিখতে যদি হয় তো এমনি সব বই। যাতে আর কারো জীবনদর্শনি বদলে যাবে। হতে যদি হয় তো গ্যেটের মতো স্বকিছ্বর উধের্ব। সব ম্বন্ধের, সব সঙ্কটের। গ্যেটের মতো স্থিতপ্রস্কর।

এর পরে এলো গান্ধীর প্রভাব। আরো অপ্রতিহত। গান্ধীকে আমি আগে একবার গ্রের্ করেছিল্ম। পরে ছেড়ে দিরেছিল্ম। আবার ফিরে গেল্ম গান্ধী-মার্গে। সে মার্গ সাহিত্যে টলস্ট্র মার্গ। আবার পড়ল্ম "হোরাট ইজ আর্ট।" এত দিন যা আমার মনের তলে ফল্যুর মতো ছিল তা উপরে এলো গণগার মতো।

থিয়োরিকে অবহেলা করেছিল্ম, উপেক্ষা করেছিল্ম। এবার সে তার শোধ তুলল। আমি হয়ে উঠল্ম গান্ধীমাগাঁ, টলস্টরমাগাঁ। ততদিনে আমার বৃহৎ উপন্যাস "সত্যাসত্য" সারা হয়েছিল বারো বছরের তপস্যায়। থিয়োরি নিয়ে মাথা ঘামাইনি তার রচনাকালে। ভালোই করেছি। মাথা এমনিতেই ঘামছিল সরকারী কাজে, শাসক শাসিতের সংঘর্ষের যুগে। আরো ঘামলে লেখা বন্ধ হয়ে বেত। প্রথি অসম্পূর্ণ থাকত।

বছ ও শ্রীমতী

"সন্ত্যাসত্য" লিখতে লিখতে "রঙ্গ ও শ্রীমতী"-র পরিকল্পনা আমার মানসে উদর হর। সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা। ইচ্ছা ছিল একটা বই শেব হলে পরে আরেকটা ধরব, কিন্তু তত দিনে সাত বছর কেটে সেছে। লিখে লিখে আমি প্রান্ত, নিঃশেবিত। ছোট একখানা উপন্যাস হলে হাত দিরে দেখা বেত। কিন্তু এও তো বেশ দীর্ঘ হবে। লম্বা পাড়ির পর আবার লম্বা পাড়ি কে দের! জিরোতে হয়। আমার দরকার ছিল কয়েক বছর বিপ্রাম। কিন্তু শুনুর্ব তাই নয়। আরো কথা ছিল। জীবনটাকে আমি মার্গান্তরিত করতে চেরেছিলুম। চাকরি ছেড়ে দিরে গ্রামে বাব, সেখানে গতর খাটাব, চাবী হব। এমনি অনেক কথা। তার সন্থো সাহিত্যের সম্বন্ধ এই যে সাহিত্য হবে মাটির গন্ধে মাটির স্বাদে ভরপুর। কাগজের ফর্ল নয়, গাছের ফ্ল। ফ্যানাটিক হলে বা হয়। এক এক কয়ে আমি আমার সব ক'টি দেবম্তি ভেঙেছিল্ম। গ্যেটে, রলা, রবীদ্যনাথ।

এখানে বলে রাখি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই আমার জীবনের প্রথম না হলেও প্রধান প্রভাব। তেরো চোন্দ বছর বয়স থেকে ত্রিশ বত্তিশ বছর বয়স পর্যাস্ত তিনি আমার জীবনদর্শনের দার্শনিক ও দিশারী ছিলেন। তবে সাহিত্যক্ষেত্রে এড দীর্ঘকাল নয়। এই প্রসঞ্জে বলে রাখতে চাই যে আমার জীবনদর্শনে প্রমথ চৌধ্রী মহাশয়ের প্রভাব বড় একটা ছিল না, যেট্কুছল সেট্কু সাহিত্যক্ষেত্রে নিবন্ধ, তাও ভাষার বেলা। তবে তাঁর বৈদশ্যের আমি পরম পক্ষপাতী ছিল্ম। তাঁর মতো সংস্কৃত মন আমি এ দেশে খ্ব কম দেখেছি। তাঁর ভাষা তাঁর মনের ভাষা মনের ভাষা বলেই মুখের ভাষা। তাঁর মন মুখ এক ছিল।

প্রথম প্রভাব আমি যত দরে দেখতে পাচ্ছি বৈষ্ণব পদাবলীকারদের। বিশেষ করে চন্ডিদাসের। বৈষ্ণব কবিতাই আমার প্রথম প্রেম। রবীন্দ্রকাব্য আমার ন্বিতীয় প্রণয়। বাংলা দেশে এর চেয়ে ভালো আর কিছু লেখা হয়নি এখনো।

পার্যারশ বছর বয়সে প্রশোক পেয়ে এই চিন্তাই আমার মনে প্রবল হলো যে জীবন ঠিক না হলে সাহিত্য ঠিক হবে না। অতএব ধর্মাশোক হতে হবে। মার্গান্তরের জন্যে আমি ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হয়ে উঠলুমে। এই ব্যাকুলতা চারিয়ে গেল আমার সাহিত্যকর্মে, ছাড়িয়ে উঠল নতুন উপন্যাস রচনার উদক্ষকে।

রছ ও শ্রীমতী

"রম্ন ও শ্রীমতী" লেখা হোক বা না হোক তাতে কিছ্ আসে বার না, কিল্ছু আগের কাজ আগে। জীবনকে ঢেলে সাজতে হবে। চারল বছর বরসে একজন মান্বের কাছে কেন যে এটা এত জর্রি হলো তা আমারই ভালো মনে পড়ে না। তবে সেই সংগ্য এ কথাও আমি একদিনের জন্যে ভূলিনি বে আমাকে "রম্ন ও শ্রীমতী" লিখতে হবে। লিখতে হবে পঞ্চাশের প্রেই। নইলে লেখার জার পাব না। শরীর বিম্মুখ হবে। দ্বনিরায় বেসব জারালো বই লেখা হয়েছে সেসব বই লেখকদের বল বরস থাকতে। বাণপ্রশেখ গোলে "আনা কারেনিনা" লেখা হতো না। হয় অলিখিত রয়ে বেত, নয় ধর্মগ্রন্থ হয়ে দাঁড়াত। পঞ্চাশ পেরোবার আগে "রম্ন ও শ্রীমতী" শেষ হওয়া চাই, পরোয়ানা পেরেছিল্ম ভিতর খেকে। শ্রুম্ব ও শ্রীমতী" নয়, সেই পর্যায়ের আরো দ্ব'সেট বই।

কী করে তা সম্ভব? তখন কিন্তু মনে হতো যে মার্গান্তরের পরেই "রম্ন ও শ্রীমতী" লিখতে বসা সম্ভব, পণ্ডানের পূর্বে তিন সেট বই শেষ করাও সম্ভব। অথচ মার্গান্তর মানে বসে বসে বই লেখা নর। কারিক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পারে ফেলে জীবনযান্তা নির্বাহ। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাত আট খন্ড উপন্যাস বিরচন। এখন ব্রুতে পারছি পাগলামি। এসব বই এত শ্রমসাধ্য যে কারিক পরিশ্রমের পর মার্নাসক শ্রম ও লেখনী চালনার শ্রম উটের পিঠে শেষ কুটো হতো। উট মুখ থুবড়ে পড়ত। মরত। লেখকের জীবনে কারিক পরিশ্রম গোণ হতে পারে। কিন্তু মুখ্য হলে সে "আনা কারেনিনা" লিখতে পারে না, পারে বড় জাের "মান্টার য়্যান্ড ম্যান" বা "ডেথ অফ আইভান ইলিচ।" অর্থাৎ ছােট গল্প বা মেজ গল্প। উপন্যাস নর। উপন্যাস নিজেই একপ্রকার কারিক পরিশ্রম।

এত দিনে হোঁশ হয়েছে। কিন্তু দশ বারো বছর আগে আমি ছিল্ম সম্পূর্ণ অব্ব ও অন্ধ। অসম্ভবের আশায় দিনপাত করেছি। অসময়ে লিখেছি "দ্ব'কানকাটা" ও "হাসন সখাঁ" প্রভৃতি কয়েকটি ছোটগদ্প। বা মার্গান্তরের পরে লেখার কথা। আগে নয়। ব্যাকুল হয়েছি মার্গান্তরের জন্যে। পেছিয়ে দিয়েছি উপন্যাসের দাবাঁ। খিয়োরির ছক কেটেছি। খিয়োরি বে প্রোপ্রির টলস্টয়ের সংশ্য মেলে তা নয়। গোড়াতেই অমিল। তিনি

বছ ও শ্রীমতী

চেরেছিলেন সাহিত্যের মৃল স্বর হবে মানবপ্রীতি, ভাইরে ভাইরে ভালোবাসা। নরনারীপ্রেম নয়। সে ভালোবাসাকে তিনি তাঁর ভালোবাসার সংজ্ঞার বহিছুতি মনে করতেন। নইলে তিনি ধর্ম-টলস্টয় হবেন কেমন করে? আমি কিস্তু এ ক্ষেত্রে দাস্তে, গ্যেটে, চন্ডিদাস, রবীন্দ্রনাথের সংগ্যে। ধর্মসাধনার মধ্যে কেবল এক জাতের ভালোবাসার স্থান আছে তা নয়, সব জাতের ভালোবাসার ঠাঁই আছেও তাই যদি হলো তবে সাহিত্যসাধনার মধ্যে কেবল একটি রসের নয়, সব রসের জায়গা আছে। সাহিত্যের প্রেরণা কেবল মানবমৈত্রী নয়, নরনারীর বিচিত্র সম্পর্ক, সত্যের অন্বেষণ, র্পাভিসার, সামাজিক ন্যায়, বীরছ। সকলের সব সাহিত্যস্থি এক ছাঁচে ঢালাই হবে, সে ছাঁচ মানবমৈত্রীর, নইলে তার নাম সাহিত্য হবে না, এ গোঁড়ামি আমি কোনো দিন মেনে নিতে পারিন। কিংবা নরনারীর প্রেমকেও বিশ্বন্থ নিরামিষ বা সামাজিক করে তুলিনি।

তা হলে মিল কোথায়! মিল এইখানে যে লেখা হবে জনগণের জন্যে। তারাই সাহিত্যের ভোক্তা। এ ভোজ তারা না এলে বার্থ। লিখতে হবে কোটি কোটি মানুষের রসপিপাসা মেটাতে, রূপতৃষ্ণা তৃশ্ত করতে।

লিখতে হবে সরল মান্ধের জন্যে সরল করে, এত সরল যে ওর চেয়ে সরল কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সরল করতে গিয়ে তরল করা চলবে না। বিকৃত করা চলবে না। পূর্ণ সত্যটাই পাতে তুলে দিতে হবে। বাদসাদ দিয়ে নয়।

ভাষা হবে সরল, সহজ, স্বাভাবিক, অন্তরের অন্তঃপথল থেকে আসা।
চাতুরীবজিতি। অলাকারবিহীন। যে ভাষার মান্য ভগবানের সন্ধো কথা
বলে। জনগণও তো ভগবান। বৃন্ধ, মহাবীর, যীশ্ব সকলেই যাঁর যাঁর
দেশের প্রাকৃত ভাষার জনগণের সন্ধো কথা বলেছেন। ইংরেজীর খ্ব ভালো
নম্না হচ্ছে বাইবেলের ভাষা, নিউ টেস্টামেন্টের ভাষা। এ ভাষা স্ক্রঃ।
এ ভাষার মধ্ব আছে। এ ভাষা মধ্মার।

লেখা হবে মস্তিক্জাত নর, হৃদয়জ। উচ্চতর চিন্তাকেও হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসতে হবে, হৃদয়ের রসে সরস হয়ে। রস এখানে স্ভাবিত নয়, উইট নয়। কর্ণয়স, কান্ত রস, রয়ে রস। মানুষ বতই অশিক্ষিত বতই নির্বোধ

রম্ব ও শীমতী

হোক না কেন, হৃদয় তো তার আছে, সেই হৃদরে গিরে পেশিছবে, সাড়া ভূলবে। শৃথ্য মস্তিকের স্বারে গিরে ফিরে আসবে না।

চরিত্রচিত্রণ হবে প্রাথমিক বর্ণে, প্রাইমারি কালার দিয়ে। মোটা তুলিতে।
তা হলে সেসব চরিত্র সকলের ঘরের লোকের মতো আপন হয়ে যাবে। সকলে
তাদের চিনবে। ষেমন সেকালে চিনত। মহাভারত বা রামায়ণের চরিত্রগর্মিল
লাল নীল হলদে রঙে আঁকা। কোনো কোনোটি শাদাতে কালোতে আঁকা।
বর্ণাঢ্যতা যেই এলো অমনি এলো ক্যিফ্বতা বা ডেকাডেন্স। সাহিত্য ষেখানে
বর্ধিফ্ব সেখানে রঙের আড়ন্বর নেই।

এমনি আরো অনেকগ্নলি স্ত আমি স্বীকার করি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বানানো গল্প নয়, সত্যি গল্প। তা বলে যেমনটি ঘটেছিল তেমনিটি নয়। রূপান্তরিত।

থিয়ারির উপর একদা আমার অবিশ্বাস ছিল। মান্য তার জন্ম থেকে
শ্র্ব্ করে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টা হাতে কলমে বাঁচে। থিয়ারি অন্সারে নয়।
আমরাও লিখব হাতে কলমে। কিন্তু কমেই আমার মনে এ ধারণা দৃঢ় হলো যে
জীবনশিলপীরা কেউ প্রাকৃতজ্ঞনের মতো দিন থেকে দিন বাঁচেন না। তাঁদের
বাঁচার একটা পরিকলপনা আছে, সেটার পিছনে আছে তাঁদের ম্লনীতি, তাঁদের
জীবনদর্শন। তেমনি যেসব গ্রন্থ সকলের মধ্যে বাঁচবে তাদের বেলা থাকবে
বহ্নকালের প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতির নাম হাতে কলমে শেখা নয়। কী ও কেন
ও কেমন করে ও কতটা এসব নিয়ে প্রচুর ভাবতে হবে, তোলাপাড়া করতে হবে।
লিখতে বসল্ম আর লেখা আপনার বেগে আপনি চলল এমন করে কোনো
মহৎ স্থিত হর্মন।

"রম্ন ও শ্রীমতী"-র প্রস্কৃতি একটানা নর, খাপছাড়া। মাঝখানে এলো সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ ও স্বাধীনতার সুযোগ। এর অমৃত গরল আমিও আকশ্ঠ পান করেছি। এর প্রতি চোখ বুজে থেকে এক মনে সাহিত্য নিয়ে ভাবা আর যার ম্বারা হোক আমার ম্বারা হলো না। আমার চোখ কান সব সময় খোলা। তা ছাড়া আমিও তো আর দশজনের মতো ভুক্তভোগী। আগ্রনের আঁচ আমারও গারে লেগেছে। জীবনের পাঁচটি বছর সাহিত্য ছেড়ে জীবনেরই কথা ভেবেছি

রছ ও শ্রীমতী

ও লিখেছি। সে সব লেখা সাহিত্য হয়েছে বলে আশা করব না। তবে তার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য স্থিত করেছি। একেবারে কন্যা হইনি।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে আমি চাকরি থেকে অকালে অপসরণ করি। এ না হলে বৃহৎ উপন্যাসের জন্যে অবিভক্ত মনোযোগ পাওয়া যেত না। তার সংগ্রে ছেল সেই মার্গান্তরের প্রশ্ন। মার্গান্তর ওর চেয়ে বিলম্বিত হলে আমার জীবনের পরিকল্পনা ভেঙে পড়ত। ওই যথেন্ট বিলম্ব। মাঝখানে সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি এসে ব্যাঘাত না ঘটালে আমি বছর তিন চার আগেই বিদায় নিত্ম। কিন্তু তার জন্যে আমি পরিতাপ করিনে। কারণ চাকরি থেকে বিদায় নিলেও দেশেই তো থাকতুম। দেশ যখন অপ্রকৃতিম্থ আমিও তখন অন্যমনম্ব হতে বাধ্য। মনোযোগ কোনো মতেই একাগ্র হতো না, মন লাগত না অন্য মার্গে, মন যেত না বিশ্বম্থ সাহিত্য অভিম্বথে। প্রস্কৃতি আমার খাপছাড়া হতোই।

এর পরে ধীরে ধীরে জীবনটাকে নতুন করে নেওয়া গেল। কিন্তু গ্রামে বাস, কায়িক পরিশ্রম ইত্যাদি গান্ধী টলস্টয় নির্দিন্ট কার্যক্রম আমাকে দিয়ে হলো না। সাহিত্যের প্রস্তৃতির সপ্যে জীবনের প্রস্তৃতির অসামঞ্জস্য ঘটল। সাহিত্যের কাজ বকেয়া পড়ে আছে, চুকিয়ে না দিয়ে আমার অব্যাহতি নেই। যেমন তেমন করে চুকিয়ে দেওয়া নয়। সাহিত্যে যেমন তেমনের মার্জনা নেই। স্বৃতরাং দিনরাত কেমন করের কথা ভাবতে হয়। দেখল্ম আগে ফিরে পেতে হবে লেখার হাত। পাঁচ বছর সে হাত দিয়ে রসের লেখা হয়ন। হয়েছে কাজের লেখা। কদাচ কখনো রসের লেখা। হাত ফিরে পাওয়া যত সোজা ভেবেছিল্ম তত সোজা নয়। এ তো চাষীর হাত নয়, মজ্বরের হাত নয়। এ শিলপীর হাত। যারা ছবি আঁকে বা সেতার বাজায় তারা পাঁচ বছর ক্ষান্তি দিক দেখি! সে হাত আর ফিরবে না। আমারও ফিরত না, বাদি না ইতিমধ্যে আমি মনে মনে লিখতুম। হাতে কলমে নয়, ধ্যানে ও চিন্তনে। কোনো দিন এর বিরতি বা ছেদ ঘটেন।

"রত্ন ও শ্রীমতী" লেখার আগে অনিবার্য কারণে আমাকে "না" লিখতে হলো, "কন্যা" লিখতে হলো। এ দুটি পদক্ষেপ না নিলে চলত না। তার পর

নিজের খিয়োরিটা একবার ঝালিরে নিল্ম "সাহিত্যে সম্কট" উপলক্ষে। এ থিয়োরি টলস্টরের সংশ্যে কতক মেলে, কত মেলে না। লিখতে লিখতে ভাবতে ভাবতে আমি আমার নিজের পথ পেরে গেছি। এখনো এর সবটা আমার জানা নেই। মোটের উপর এটা নির্দেশ বালা। তা হলেও আমি প্রস্তৃত। বালার জন্যে প্রস্তৃত।

আমাকে অনেক দিন পর্যানত ধরে রেখেছিল জনগণের জন্যে লেখার বাধ্য-বাধকতা। জার করে এ দায় আমি কাটাল্ম। আমি লিখব জনগণের জন্যে নয়, বিদশ্ধ মণ্ডলীর জন্যে নয়, ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের জন্যে। বে পাঠক আমার চোখের সামনে নেই, কোথায় আছে আমি জানিনে। হয়তো আমারি অন্তরে। সে আমাকে অনেক বেশী ন্বাধীনতা দিয়েছে। আমি এখন অনেক বেশী ন্বাধীন। জনগণের বোঝা পিঠে নিয়ে হিমালয়ের শ্রেণা উঠতে যাওয়া ম্ট্তা। এভারেন্ট র্যাদ জয় করতে হয় তবে বোঝা সব চেয়ে হালকা হলেই রক্ষা। "রয় ও প্রীমতী" শেষ পর্যানত কেমন ওতরাবে জানিনে। হয়তো আদৌ ওতরাবে না। হয়তো দ্বহাজার ফ্ট উঠেই আমার দম ফ্রিয়ের য়বে, পথের প্রারম্ভেই বসে পড়ব। হয়তো দশ হাজার ফ্ট স্বর্যান পেরিয়েছি। এটা তো উঠিতর বয়স নয়, উঠব কী করে! কিন্তু বোঝা আমি এক এক করে নামিয়ে দেবই। জনগণের বোঝাটি সব প্রথম নামাল্ম।

তার পর "রত্ন ও শ্রীমতী" দ্রহ্ বই। হাজার সরল ভাষায় লিখলেও উচ্চতর গণিত বোধগম্য হয় না সকলের। এ বই ব্রুববে তারাই যায়া জীবনে কিছ্র পেয়েছে। তা সে সর্থ দ্রংখ যাই হোক। তা বলে আমি ইচ্ছা কয়ে দ্রবোধ্য ভাষায় লিখব না। বরং যত দ্র পারি সয়ল সহজ সয়স কয়ে লিখব। ভাষা যেন বোঝবার পক্ষে বাধা হয়ে না ওঠে। পল্লবিত অলঞ্চত বাক্য একটা বাধা। বাগ্বিভৃতির মাহে আমার নেই। ঐশ্বর্যকে আমি একটা প্রলোভন বলে মনে করি। শব্দের ঐশ্বর্যের কথা বলছি। কিল্ডু সৌল্দর্যের কথা আলাদা। সৌল্দর্য বদি প্রতি ছয়ে না ফ্রটল তবে লিখে আমার আশ মিটল না।

সৌন্দর্য বলতে এত দিন আমি জানতুম স্কুনর রূপ। অর্থাৎ বহিঃসৌন্দর্য।

সম্প্রতি দ্ববছর হলো আমার জ্ঞান হরেছে যে তাই সব নয়, যদিও অনেকখানি। অন্তঃসৌন্দর্য বা স্কুদর সন্তা না হলে আর্ট শ্রীহীন হয়। স্কুদর রূপ সন্তেও। ফর্মাল বিউটি তো থাকবেই। তার চেয়েও বড় কথা এসেনসিয়াল বিউটি। কোথায় পাই, কার কাছে যাই এর জন্যে? বই পেছিয়ে গেল এর জন্যেও কিছ্ব দিন। বছর খানেক।

সত্যের উপর জাের বরাবর দিয়েছি, আরাে জাের দিতে হবে এবার। কিন্তু আমি স্টোর লিখতে বসেছি। হিস্টার লিখতে বসিন। জাবিনী বা ইতিহাস লিখলেই তা উপন্যাস হয় না। জাবিনের সত্যকে আর্টের সত্য করতে হবে। অনেক বাদ যাবে, অনেক জােড়া হবে, অনেক বদলাবে। র্পান্তরিত না হলে জাবিন কখনাে আর্ট হবে না। তার পর তথ্যের সবটাই তাে সত্য নয়। যা ঘটে তাই দেখলে কেউ সত্যের স্বর্প দেখতে পায় না। আরাে গভাীরে যেতে হয়। তার জনাে চাই আরেক রকম দ্ভি। অন্তর্দ্িট। রিয়ালিটির উপর ম্রেটা শক্ত হবে কাঁ করে, যদি অন্তর্দ্িট মর্মাভেদা না হয়?

সংশ্যে সংশ্যে শক্ত হবে আরেকটি মুঠি। সেটি ডিলাইট প্রিন্সিংলার উপর। রসের উপর। আনন্দ দেওয়াই নৃত্য গীত চিত্র ভাস্কর্যের কাজ। সাহিত্যেরও। এ ছাড়া আর যদি কোনো কাজ থাকে সেটা অধিকন্তু। কিন্তু যে উপন্যাস রস দিতে না পারে সে তার আসল কাজই জানে না। তা বলে ক্লান্ত মান্বের অবসর বিনোদনকে আমি রসদান বলব না। এণ্টারটেনমেণ্ট আমার অভীষ্ট নয়। রস দেওয়া যেন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। মান্ম বাঁচে রস পেয়ে, এটা তার তৃষ্ণার জল। আর অবসর বিনোদন হলো চা কিংবা সরবং কিংবা মদ। সভ্যতার ব্যাধি দ্র হলে এত গাধা খাট্নিও থাকবে না, এত ক্লান্তিও থাকবে না, এমন অবসর বিনোদনও আবশ্যক হবে না। কিন্তু তৃষ্ণা থাকবে, তাই তৃষ্ণার জলেরও প্রয়োজন হবে। আর্ট চিরকালের। কারণ তৃষ্ণা চিরকালের। কিসের তৃষ্ণা? রসের। ও র্পের। যে র্প রসের সঙ্গো অভিন্ন। সাহিত্যের আনন্দ একাধারে রসের ও র্পের।

চরিত্রচিত্রণের বেলা কেবলমাত্র লাল নীল হলদে বা শাদা কালো ব্যবহার করব না। "রত্ব গু শ্রীমতী"-র চরিত্রচিত্রণে আরো বেশী রং লাগবে। এখনো

তো আমি মার্গাম্ডরিত হইনি। না হওয়ার একটা কারণই তো "রক্ষ ও শ্রীমতী"-র দাবী। এই পর্যারের আরো দ্বুসৈট গ্রম্থের দাবী। আপাতত আমি সাধ মিটিয়ে রঙের খেলা খেলব। কিন্তু আমার ধরণধারণটা মনস্তাত্ত্বিকের নয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণশীল। আমি বিজ্ঞান লিখতে বিসিনি। চরিয়কে চিরে চিরে দেখানো আমার ন্বারা হবে না। চরিয় আস্তই থাকবে। বিচিন্ন হবে। কোনো কিছ্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্যে আসরে নামবে না। নামবে কাহিনীর প্রয়োজনে।

কাহিনী না হলে উপন্যাস হর না। কাহিনীই উপন্যাসের প্রাণ। উপন্যাস মানেই কাহিনী। টলস্টয়ের এই উপদেশটি আমি বহুদিন থেকে মেনে আসছি, এখনো মানি, যে কাহিনী আমি উদ্ভাবন করব না। জীবনের কাছ থেকে নেব। কিন্তু কী ভাবে নেব, কতথানি নেব, কোন উদ্দেশ্যে নেব, এসব আমিই স্থির করব। জীবন এখানে নিয়ামক নয়। এটা আর্টেরই এলাকা। আর্ট মানেই রুপান্তর। রুপান্তর ঘটলে এক জিনিস অন্য জিনিস হয়ে য়য়। নইলে রুপান্তর কিসের? জীবনের কাছ থেকে যেমন নেব তেমনি রুপান্তর ঘটিয়ে জীবনের হাতে ফিরিয়ে দেব। জীবনের ধন জীবনই পাবে, কিন্তু আদিম রুপেনয়, আমার দেওয়া রুপে। রুপ দেওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে।

কিল্তু এ স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়। কাহিনীর একবার পত্তন হলে সে আমার হাত থেকে কলম কৈড়ে নেবে। তার পর নিজেই নিজেকে লিখবে। আমি যেন সাক্ষীগোপাল। এমন কত বার হয়েছে। এবারও হবে। গলপ তার নিজের নিরমে চলে। তার চলার নিয়ম আমাকেই শিখতে হবে, আমার নিয়ম তার উপর খাটবে না। চরিত্রগ্রলিও স্ববোধ বালক বা লক্ষ্মী মেয়ে নয়। তাদের পরিণতি তাদের অল্তানিহিত নিয়মে হবে। আমার মাল্টারি বা ম্রুর্ন্বিয়ানা চলবে না। পাঠক যখন অন্যোগ করেন, অম্ককে অমন কেন করলেন, আমি ফাঁপরে পড়ি। অমন কি আমি করেছি, না ও নিজে হয়েছে?

লেখকের স্বাধীনতা আছে, এটা সত্য। কিন্তু লেখা একবার শ্রের হলে ফ্রী উইল মারা। তখন ডিটারমিনিজম কাজ করে যায়। যা হয়ে দাঁড়ায় তা নিয়তি। নিয়তির সঞ্জে পদে পদে বোঝাপড়া করতে হয়। আমার দায়িছ

বছ ও শ্রীমতী

আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু আমি যেন ইংলণ্ডের রাজা বা ভারতের রাষ্ট্রপতি। আমারও নিয়ামক আছে। সে নিয়তি। জীবনকে নিয়ামক হতে দিলুম না, নিয়তিকে দিলুম, এই প্রভেদ লক্ষণীয়।

এখন আর একটি কথা বলতে চাই। শিল্পীদের সব সময়ের ধ্যান সত্য ও সৌল্পর্য। এর থেকে মনে হতে পারে শিবের জন্যে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। তা নয়। জগতে প্রচুর পরিমাণ ভালোর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মন্দ মিশিয়ে রয়েছে। এমন ভাবে মিশিয়ে রয়েছে যে আলাদা করার উপায় নেই। সাহিত্যে কিন্তু লোকে আশা করে যে ভালো থাকবে, মন্দ থাকবে না, আলাদা করার উপায় আছে। এটা দ্রাশা। এ শর্ত মেনে নিলে সাহিত্যের প্রের্থ একটা বিশেষণ বসিয়ে দিতে হয়। সং সাহিত্য। তার মানে অসাহিত্য। এ শর্তে কোনো সত্যিকার সাহিত্যিক রাজী হতে পারেন না। অনেকে বিদ্রোহ করতে গিয়ে প্রতীপগামী হন। ভালো দেখতে পারেন না, মন্দটাই দেখেন ও দেখান। সেইভাবে ভালোর থেকে মন্দকে আলাদা করেন। তা হলে আর বিদ্রোহ কাঁনিয়ে!

কারো কারো বিদ্রোহ অন্য র্প নেয়। ভালোমন্দের সীমানার বাইরে অভালো অমন্দ বলে কি তৃতীয় কিছ্ব নেই? এই হলো তাঁদের জিজ্ঞাসা। তাঁরাই উত্তর দেন, আছে। যা আছে তার নাম amoral। কিন্তু কী amoral তা জানতে হলে প্রথমে জানতে হবে কী moral ও কী immoral। তেমনি কী ভালো ও কী মন্দ। এই প্রাথমিক জ্ঞান যেখানে নেই সেখানে কেউ নিশ্চিত র্পে বলতে পারে না যে এটা amoral বা ওটা অভালো অমন্দ। ভালোমন্দের উপর ম্বিট শন্ত না হলে অভালো অমন্দ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। তা বলে পরের কথায় ভালোর থেকে মন্দ আলাদা করতে যাওয়াও সমীচীন নয়। শিলপীয়া ঋষি নন। ভালো মন্দের উপর তাঁদের ম্বিট শন্ত নয়। শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়তে তাঁদের ভয় করে। তবে যদি কারো শিবদর্শন ঘটে থাকে তিনি সত্যকে খর্ব না করে সোন্দর্যকৈ ক্ষ্বেম না করে শিবমন্দির গড়তে পারেন। থিয়োরর দিক থেকে এটা সম্ভব। কার্যত সহজ্ঞ নয়।

শিল্পীর কর্তব্য থিয়োরির খোঁজ খবর রাখা, কিন্তু প্র্যাকটিসের উপর জোর

দেওরা। রামা বদি মুখে দেবার মতো না হয় তা হলে পাকপ্রণালীসম্মত হলে কী হবে? পায়েদের প্রমাণ আম্বাদে। পাকপ্রণালী না পড়েও অমৃত রাধা বায়। রামার মতো লেখাও একটা প্র্যাকটিকাল ব্যাপার। একান্ডভাবে প্র্যাকটিকাল। উভয়ের একই লক্ষ্য। অমৃত কিসে হয়। লক্ষ্যভেদ করতে পারলে ধন্যতা। নয়তো ব্যর্থতা। তখন কোনো থিয়েরির দিয়ে এর কোনো সার্থকতা নেই।

অনেক বার ভেবে দেখেছি, এ উপাখ্যান কি না বললে নয়? কেন বলতে চাওয়া? ভিতর থেকে উত্তর পেরেছি, এটা একটা বলবার মতো উপাখ্যান। আমি যদি না বলি তবে আর কেউ কোনো দিন বলবে না। চিরকালের মতো না বলা রয়ে যাবে। অতএব বলতে হবে। বলতে হবে এর পরবতীর্ণ উপাখ্যানও। বলতে হবে আমাকেই। বিষয়টাকে আমি বরণ করে নিয়েছি। বিষয়টাও আমাকে বরণ করে নিয়েছে। এই যে পারস্পরিক বরণ এমনটি বহ্ন ভাগ্যে ঘটে। না বলে আমার নিস্তার নেই। না বলিয়ে কাহিনীরও নিস্তার নেই।

বলতে বসে আমি পণ করেছি যে আমি ঋষিকলপ হব না, রেন্পেক্টেবল হব না। লোকের মন রাখা কথা বলব না। থামিয়ে দেব না, বদলে দেব না, শ্বেরে দেব না, বাদসাদ দেব না, মোড় ঘ্রিয়ে দেব না, পল্পবিত করব না, অল•কৃত করব না, জনপ্রিয় করব না। তা বলে অকারণে গায়ে পড়ে আঘাত করব না, ব্যথা দেব না, অসভ্য হব না। যাঁর ভালো না লাগবে তিনি পড়া বন্ধ করে দেবেন। বেশীর ভাগ পাঠক যদি বির্প হন তা হলে প্রকাশক ছাপা বন্ধ করে দেবেন। লেখক কিন্তু লেখা বন্ধ করবে না। লিখে যাবে।

১লা অক্টোবর ১৯৫৫ শান্তিনিকেতন

পাদটীকা :

এই উপন্যাসের চরিত্রগঢ়িল কাল্পনিক। কারো সংশ্য কোনো রকম সাদৃশ্য দেখলেই তাকৈ সেই ব্যক্তি বলে সাবাস্ত করা ঠিক হবে না।

রছ ও শ্রীমতী

n e n

উপন্যাসকার একটি নিজস্ব জগং সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন। সে জগং এ জগং নয়। এ জগতের সঙ্গে তার মিল থাকতে পারে, কিন্তু থাকতে বাধ্য নয়। মিল না থাকলে সে মহাভারত অশ্বন্ধ হবে না। উপন্যাসের জগতে যদি কেউ এ জগতের প্রতির্প খ্রুজতে যান তা হলে তাঁর ব্যর্থতার ফলে উপন্যাস ব্যর্থ হবে না। উপন্যাসের সার্খকতা এ জগতের ছবি বা ছায়া হয়ে নয়, তার নিজস্ব জগতের সত্যতায় ও সৌন্দর্যে। যেখানে একটি নিজস্ব জগতের র্প দেখতে পাওয়া যাছে সেখানে সে তার নিজের জোরেই অস্তিম্বান। এ জগতের সঙ্গে তার মিল নেই বলে তার নাস্তিম্ব ঘটবে না। তাকে অস্বীকার করে পাঠকের রসবোধ চরিতার্থ হবে না। বরং মনে হবে পাঠকের রসবোধ নেই। পাঠককে উপন্যাসের জগতে প্রবেশ করতে হবে বিশেষ একখানি প্রবেশপত্র নিয়ে। দোকানদারকে রজতমন্ত্রা দিয়ে মন্ত্রিত প্রস্তুক সংগ্রহ করা এক। লেখককে স্বীকৃতি-মূল্য দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করা আরেক।

ভালো উপন্যাস বলতে আমি বৃঝি যে উপন্যাস একবার পড়লে ফ্রারিয়ে যায় না। যে উপন্যাস বার বার পড়তে পারা যায়। যতবার পড়ি ততবার নতৃন নতৃন স্বাদ পাই, নতৃন কিছ্ম আবিষ্কার করি, নতুন করে ভাবতে পারি। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" আমি অনেক বার পড়েছি। এখনো পড়তে ইচ্ছা করে। টলস্টয়ের উপন্যাসের মধ্যে এমন বস্তু আছে যা পড়ে নিঃশেষ করা যায় না। যেমন তাজমহল দেখে কোনো বারই মনে হয় না যে এই শেষ বার, আর দেখে কী হবে। উৎকলকবি রাধানাথ রায় লিখেছেন—

"স্কারে তৃশ্তির অবসাদ নাহি যেতে দেখিলেহে° নূআ দিশ্ব থাই।"

প্রথম লাইনের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দ্বিতীয় লাইনের অর্থ, যত দেখলেও নতুন দেখাতে থাকে। অর্থাৎ যতই দেখি ততই নতুন দেখায়। ভালো উপন্যাস চির ন্তন। নরতো সে ভালো উপন্যাস নয়। সামাজিক বিচারে ভালো হতে গিয়েই সে মরেছে।

রছ ও শ্রীমতী

ভালো উপন্যাসের চরিত্রগর্নল হবে চিরকালের মান্ব, বিশ্বের মান্ব। আর তার কথাবস্তু হবে মানবনিয়তি ও মানবপ্রকৃতি। মর্মভেদী দ্ভি না হলে এসব সৃষ্টি করা বার না।

১৮ই মার্চ ১৯৫৬ শান্তিনিকেতন

n o n

"রত্ন ও শ্রীমতী" বিশ কিংবা বাইশ বছর প্রের্ব কল্পিত। তখন আমার ধারণা ছিল এ বই তিন খণ্ডে সমাশ্ত হবে। বছর দুই আগে যখন ছকতে বিস তখন ব্রুবতে পারি আরো এক খণ্ড লিখতে হবে। সেই মর্মে ঘোষণাও করা হয়। লিখতে বসে দেখা গেল প্রথম খণ্ড যেখানে শেষ করা হলো সেখানে না করলে তেমন ভালো বিরতি পাওয়া যায় না। কাব্যের নিয়মে সেইখানেই সর্গের ঘতি।

অতএব এ বই পাঁচ খণ্ডে সারা হবে। কিন্তু মোটের উপর এর আয়তন চার খণ্ডেরই সমান থাকবে। "খণ্ড" না বলে আমি "ভাগ" বলতে চাই। প্রথম ভাগের চেয়ে দ্বিতীয় ভাগ শক্ত। দ্বিতীয় ভাগের চেয়ে তৃতীয় ভাগ। তৃতীয় ভাগের চেয়ে চতুর্থ ভাগ। চতুর্থ ভাগের চেয়ে পঞ্চম ভাগ। লিখতেও শক্ত। পড়তেও শক্ত। শেষপর্যন্ত ক'জন পাঠক আমার সঞ্চো থাকবেন জানিনে। প্রকাশককে আমি চেতাবনী দিয়ে রেখেছি।

প্রথম ভাগ আনন্দবাজার পত্রিকার গত শারদীয় সংখ্যার বেরিয়েছিল। তার পরে আমি ওটি আরেক বার লিখি। প্রনার্লখন সব সময় ভালো নয়। বাদসাদ দিতে দিতে স্বাদ বাদ যায়। কিন্তু সীমার মধ্যে আনতে হলে বাদসাদ না দিয়ে উপায় নেই। বিশেষত যদি কোনো অংশ আরেকট্র বাড়াতে হয়।

অমদাশতকর রায়

শান্তিনিকেতন ২১শে জ্বন ১৯৫৬

রত্ন ও প্রামতী

প্রথম ভাগ

মনের কথা বলবে যে, বলতে চাইলেই কি বলতে পারা যায়! যাকে বলবে তার মন থাকলে তাে! দিনক্ষণ অনুক্ল হলে তাে! প্রভাত কবে থেকে বলবে বলবে করছিল। রত্নকে—তার অভিন্নহ্দয় বন্ধকে। বলা ক্রমণ জর্রির হয়ে উঠছিল। কিন্তু ওকে ধরতে পারছিল না। যদিও একই কলেজের বিদ্যাথী, একই মেসের আবাসিক।

ও ছেলেটি যেখানেই যায় সেখানেই ওকে ঘিরে একটি বন্ধ্মণ্ডল গড়ে ওঠে। পশ্চিমের সেই বড় শহরটাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ওরা দ্বৃজনে একসণ্ডো বি-এ পড়বে বলে প্রবাসী হয়েছিল সেখানে। কিন্তু দেখতে দেখতে দ্বৃজনের মাঝখানে তৃতীয় জনের জনতা হয়। সেথানকার ইউনিভাসিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দিয়ে প্রভাতও তো একটি ছোটখাটো জন্গীলাট বনেছিল। তার চার দিকেও ঘ্রুর ঘ্রুর করত এক দল ভক্ত।

দ্বজনের উপর দ্বজনের অভিমান জমছিল। শৃথু এই নিয়ে নয়, আরো কারণ ছিল। আই-এ পড়তে পড়তে বাংলাদেশের কোনো মফঃপ্রল শহরে যখন তাদের প্রথম আলাপ তখন তারা ও তাদেরি মতো জনকয়েক উৎসাহী সতীর্থ মিলে একটি মন্ডলী রচনা করে। নাম রাখে "The Iconoclasts." সদস্যসংখ্যা সাতজনের অধিক হলো না, তাই ডাকনাম দাঁড়িয়ে গেল সাত ছাই চন্পা। ট্বলী স্ট্রীটের তিন দর্জি নাকি বলেছিল, "আমরা ইংলন্ডের জনগণ।" তেমনি ঘোড়ামারার সাত ছাত্র বলত, "আমরা ভারতবর্ষের উত্তরপ্রের্ব।" তাদের স্বাক্ষরিত ইশতেহারে লেখা ছিল কাঠপাথরের প্রতিমা তো তারা ভাঙ্বেই, আর ভাঙ্বে যত রাজ্যের মিথ্যা সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সনাতন সেজে ন্তনের পথ রোধ করেছে। বাশ্মিতায় অগ্রগণ্য বলে প্রভাতকেই দলপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। কেবল কথায় নয় কাজেও সে সকলের

অগ্রণী। বন্ধ্রা ডাকত কালাপাহাড় বলে। দেখতেও সে লম্বা চওড়া ভারিক্তি ও শামলা। বন্ধুতার সময় কথনো হাসাত কথনো কাঁদাত কখনো জলদগম্ভীর স্বরে রুদ্র রুপে ডমর্ বাজাত। অভিনয়ে তার কুশলতা ছিল। মঞ্চের বাইরেও সে নিজের অজ্ঞাতসারে অভিনয় করে যেত। বোঝা শক্ত ছিল কোনটা অভিনয় কোনটা নয়। ইউনিভাসিটি ট্রেনিং কোরে যোগ দেবার পর দেখা গেল সে অন্যপ্রকার প্রতিমাপ্তক হয়ে উঠেছে। সেলাম করছে নিবিকারে। হুকুম মানছে নিবিচারে। যথনি তার ঘরে যাও দেখবে ইউনিফর্ম পাট করছে বুট পালিশ করছে ভক্তিভরে। একট্ হাত দিয়েছ কি তোমার দিকে এমন চোখে তাকাবে যেন ভূমি চন্ডাল হয়ে বিগ্রহের অভ্যান্স্পর্ণ করেছ।

রত্ন ছিল সব রকম প্রতিমাপ্জার বিরোধী। কেবল শাস্ত্রবাদীদের প্রতিমার নয়, শস্ত্রবাদীদের প্রতিমারও। তার কাছে এটা স্বতঃসিন্ধ যে জাের বেখানে মান পায় প্রেম সেখানে হতমান, স্বাধীনতা সেখানে হীনমান। নতুন সভ্যতা চলবে প্রেম ও স্বাধীনতা এই দুটি চাকায়। পশ্চিমে আসার পর একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে ষায়। ঘটে রত্নর অশ্তক্ত্রীবনে। প্রভাতের অগােচরে। রক্ষর অশ্তশ্চক্ষ্ম উদ্মীলিত হয়। দীপ জবলে ওঠে তার অশ্তরে। সে এক অনির্বাচনীয় অভিজ্ঞতা। এ বিশ্বসংসার এমন অবর্ণনীয় র্পে প্রকাশিত হয় যে ক্ষণকালের জনাে সব সমস্যার সমাধান হয়ে য়ায়, সব ব্রুতে পায়া য়য়, দ্বঃখ দৈনা ন্বিধা ন্বন্ধ সব কেমন করে সংগতি ও স্বেমা পায় একখানি পরম সোন্দর্যময় চিত্রে। এই মরমী দ্ভির পর রত্নর প্রে অক্থা ফিরে এলাে। আবার সেই নিতা অপ্রত্বার সংগ্র ঘর করা। কিন্তু চেতনার অতলে প্রতায় রয়ে গেল যে পরিপ্র্তা কবে একদিন হবে তা নয়, পরিপ্র্তাও নিতা।

এর পরে দেখা গেল রত্নর চার দিকে একটি নতুন দল গজিয়ে উঠছে।
সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদায়। প্রভাত ভূল ব্রুল, ক্ষ্ম হলো। এরা রবীন্দ্রনাথকে
গ্রুদেব বলছে যখন, তখন এরা অনিবার্যভাবে গ্রুবাদী। গান্ধীকে মহাত্মা
বলছে যখন, তখন বস্তুগত্যা অবতারবাদী। এর পর এরা কালীঘাটে মাথা
নোরাবে, কাশী বিশ্বনাথে মাথা মুড়োবে। জাত মানবে। পৈতে নেবে।

বিধবাকে স্বামী গ্রহণ করতে দেবে না, সহমরণে পাঠাবে। আর বাকী রইল কী! বর্ণাশ্রম ধর্ম অক্ষর হলো। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল। প্রভাত জানল না যে রত্মর ভিতরে আগ্রন তথনো জ্বলছে। সে অণ্নি অনির্বাণ। আত্মসমর্পণ আর যেই কর্ক রত্ম করবে না কোনো দিন। ভাঙার কাজ তাকে চালিয়ে যেতে হবেই। তফাৎ শ্ব্রু এই যে, সেইসঙ্গে গড়ার কাজও ক্রতে হবে তাকে। এক হাতে ভাঙন, আরেক হাতে গড়ন। সে যেন অর্থনারীশ্বর। বিদ্রোহী ও মরমী। কালাপাহাড় ও সৌন্দর্যবাদী। তার ব্বকে আগ্রন চোখে স্বন্দ। সেসব স্বন্দ অভিনব স্থিতির। অভিনব প্রতিমার। কাঠপাথরের নয়। ভাবের। রসের।

প্রভাত জ্ঞানত প্র্ণিমা রাদ্রে রত্ন কারো সংগ মেশে না। তাকে একা পাওয়া যায় সন্ধ্যার পর গণগার ধারে। বাঁধের ঢালা দিকটাতে গা মেলে দিয়ে কুল-ছাপানো জলে পা ভিজতে দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে আসমানের দিকে। এ স্থা অপচয় করতে নেই, একে আকণ্ঠ পান করতে হয়। এমনি করে মান্ম অমৃত হয়। তাই রাত দশটা অবধি সে পড়ে থাকে ইন্টক শ্যায়। আহার নেই, নিদ্রা নেই, আহারনিদ্রার স্প্রা নেই।

এক প্রিমার রাত্রে প্রভাত গিয়ে রত্নর পাশে চাদর পাতল। আটটা বাজে।
নদীর ধার শ্না। রত্ন তখন মশন ছিল সৌন্দর্য অবগাহনে। বন্ধকে কাছে
পেরে প্রীত হলো। তন্ময় ভাবে বলল, "ভাই প্রভাত, এ কোন র্পকথার রাজ্যে
এল্ম আমরা! জ্যোৎস্না ফিনিক ফ্টেছে। সম্থে দ্ধের সায়র। এটা কোন
ব্গ! আমরা কি খ্রীস্টোত্তর বিংশ শতাব্দীতে? না খ্রীস্টপ্র্ব? আমি
যেন কবেকার সেই রাজপ্র আর তুমি যেন মল্যীপ্রত। পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে
আমরা যেন কোন আদি কালে যাত্রা শ্রুর্ করেছি। পেরিয়ে এসেছি দেশ আর
কাল। ছাডিয়ে এসেছি বাস্তব।"

মন্দ্রীপরে হতে প্রভাতের একট্রও সম্মতি ছিল না। তব্ সে মৌন হয়ে। শ্বনতে লাগল।

"ভাই প্রভাত, প্রিমার রাত্রে আমার মনে পড়ে ষায় প্রতার কথা। বে প্রতা এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত অপ্রতাকে আছেল করে প্রছেল রয়েছে।

অন্যান্য দিন অপ্রণতার সভ্গে ঘর করি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হই। এই একটি দিন প্রণতার অভিসারে গ্রহত্যাগ করি। তখন মনে হয় আমি প্রণতা থেকে প্রণতার চলেছি। আমি আর বিদ্রোহী নই, আমি বিম্বণ্ধ। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে থাকি, থাকতে থাকতে সহসা এক সময় অবগ্রন্ঠন খ্লে যায়। শ্রভদ্ভিট হয় স্কুদরীর সভ্গে। যে স্কুদরী এ বিশ্বের মর্মান্তের অধিষ্ঠিতা। তখন অন্তব করি আমি একা নই, আর একজন আছে, যাকে নিয়ে আমি প্রণ। তার সভ্গে সহবাস করে আমিও স্কুদর হয়ে উঠি।"

রত্বর মুখে এসব কথা নতুন। প্রভাত কান পেতে রইল।

"এবার শৃথ্য প্রিমা নর। তার সংশ্য মিলেছে বসন্তের সেনা। কোকিলের কুহ্, দখিনের বাতাস। ভাই প্রভাত, আমিও বসন্তের মতো এসেছি, বসন্তের মতো যাব। যেখানে যাব সেখানেও বসন্ত। আমাকে নিয়ে বসনত। আমি বন্ধনহীন আত্মা। আমি ফ্রী স্পিরিট। উনিশ বিশ বছর মানবের দেশে বাস করতে করতে মানব হয়ে গেছি। কিন্তু স্বাধীনতা দিইনি। আমি স্বাধীন মানব। ফ্রী ম্যান।"

প্রভাত আড় চোখে রঙ্গর দিকে তাকায়। তার মুখে প্রণিমার আলো পড়ে তাকে আরো কমনীয় করেছে। ক্ষীণকায়। অনতিদীর্ঘ। অনতিগোর। উনিশ বিশ বছর বয়স যদিও, তাকে দেখলে যুবক মনে হয় না। মনে হয় চিরকিশোর।

"আমি স্বাধীন সন্তা। বন্ধন আমার জন্যে নয়। সেই আমি মানবের দেশে এসে কেবলি ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি। বে'ধেছি, বাঁধা পড়েছি। এ বাঁধন খলতে গোলে লাগে। নিজে খলতে পারিনে। মৃত্যু যদি খুলে দেয় কে'দে আকুল হই। ভাই, একে মর্ত্যভূমি বললে মৃত্যুকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ধরণী প্রেমভূমি। এখানে আমরা আসি ভালোবাসা দিতে ও নিতে। বৈষ্ণবরা বলে স্বয়ং ভগবান মানবর্পে এসেছিলেন প্রেম আস্বাদন করতে। এমন প্রেম আর কোথায় আছে! স্বগেও না। বৈকৃশ্ঠেও না। সেইজনাই ব্রিঝ এখান থেকে স্বেছায় কেউ চলে যেতে চায় না। যত দিন পারে মরণকে এড়ায়। প্রেম বাদি না থাকত না বাঁধত মানুষ কি বাঁচতে রাজী হতো! আমার অন্তর্ভম

অভিলাষ কী, শ্বনবে? আমি হতে চাই সব স্বাধীন মান্ব্ৰের মধ্যে স্বাধীনতম, সব প্রেমিক প্রেব্ৰের মধ্যে প্রেমিকসত্তম।"

প্রভাত যেন এতক্ষণ এই সনুযোগটির জনোই ওং পেতেছিল। কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "ভাই রতন, আমি বার বার ভালোবাসিনি, এক বারই বেসেছি। বার বার ভালোবাসা পাইনি, এক বারই পেয়েছি। আমার অভিজ্ঞতা শনুনতে চাও তো বলি। যে প্রেমিক সে স্বাধীন নয়। তার মতো পরাধীন আর নেই। আর প্রেমের জন্মলা মরণজন্মলার চেয়ে কম কিসে! একটার তব্ব নির্বাণ আছে। অপরটা অনির্বাণ।"

প্রভাতের কণ্ঠস্বরে এমন একটা রোদন ছিল বে রত্ন তার বন্ধ্রর উল্তির প্রত্যুত্তি করতে কুণ্ঠিত হলো। শুধ্র বলল, "আমার প্রেমের অনুভূতি জ্বালামর নয়।"

বন্ধ্ যেন এর জন্যেও তৈরি ছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর আমাকে দশ্ধ করছে আশাহীন এক প্যাশন।"

দশ্ধতার অভিব্যক্তি ছিল তার কন্ঠে, তার বক্ষে। তার বক্ষ শ্বসিত হচ্ছিল প্রচন্ড আবেগে। না, অভিনয় নয়।

"প্যাশন!" চমকে উঠে সামলে নিল বত্ন। "তাই বল।"

"কেন? প্যাশন কি প্রেম নয়!"

"তা কী করে হবে?"

"হাওয়া যে করে ঝড় হয়। জল যে করে মেঘ হয়। আলো যে করে আগন্ন হয়। প্রেম যখন গাঢ় হয় তখন তাকে বলি প্যাশন। গোড়াতে এমন ছিল না। হালে এমন হয়েছে। তোমাকে খ্লে বলতে আমার আপত্তি নেই। শ্নবে?"

রত্ন সায় দিল। "শহুনি।" তথন প্রভাত শোনাল তার অক্থিত কাহিনী।

রান্ব তার বাল্যসথী। পাশাপাশি বাড়ী। বয়সের ব্যবধান বছর দ্ই। কত বার তারা বর বৌ খেলেছে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে এ খেলা বড়

হয়েও খেলবে। গ্রহ্মন জানতেন। ভাবতেন এটা ছেলেমান্ষী। এমন তো কত হয়। তাঁরা দেখেও দেখতেন না। মায়েরা পরস্পরকে বেহান বলে ভাকতেন। বড় হয়ে প্রভাত জেনেছে ওটা একপ্রকার শিষ্টাচার। তখন কিন্তু তার ধারণা ছিল কেউ কাউকে বেহান বলে ভাকলে ওরা সত্যি সত্যি বেহান হয়ে গেল। কেবল শ্ভকমটা বাকী। নাতজামাই নাতবোঁ এসব যে রসের কথা এটাও তার মাথায় ঢ্কত না। তার হোঁশ হলো যখন তেরো বছরের রান্কে তার সংগ্রামণতে বারণ করে দেওয়া হলো। কেন? না রান্র কাপড়ে রজের ছোপ দেখা দিয়েছে। প্রভাত ধরে নিয়েছিল কোথাও কিছ্ কেটে গেছে। যা দ্রন্ত মেয়ে। কিন্তু বোঁদিদিরা তার প্রাথমিক সাহায্যের বাক্স দেখে হেসে খুন। দ্র বোকা, রান্ যে এখন যা্গ্যমনত হয়েছে!

কাকে বলে যুগ্যিমন্ত, কী তার লক্ষণ, এসব ক্রমে ক্রমে তার বোধগম্য হলো। বেশ একট্ব ভয় পেয়েছিল সে। ঝালো বছর বয়সে ছেলের বাপ হলে তো তার বিয়েটা একটা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। না। সে চায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। দশজনের একজন হতে। ব্রাহ্মদের কাছে লেখাপড়া শিখে সে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিল। নিজে বাল্যবিবাহ করলে কি তার মুখ থাকবে! য়ান্ব কেন ব্রাহ্ম কুমারীদের মতো অপেক্ষা করবে না? কিন্তু রান্বর গ্রহ্জন তা কল্পনা করতে পারেন না। মেয়ে দিন দিন অরক্ষণীয়া হয়ে উঠছে। সময়ে বিয়ে না দিলে পরে হয়তো ওর বিয়েই হবে না। প্রভাত যদি বিয়ে না করে? তার গ্রহ্জন বদি টাকার লোভে তার অন্যত্র বিয়ে দেন? প্রভাতের আশায় বসে থাকলে একটির পর একটি সংপাত্র হাতছাড়া হবে। রান্বর ছোট বোন ট্নেব্ও তত দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে থাকবে। সমাজ ক্ষমা করবে না। এ কি তোমার বাহ্ম সমাজ!

রান্ যখন য্গিয়নত হয় প্রভাত তখনো যোগ্য হয়নি, স্তরাং যা হবার তাই হলো। কী কর্ণ ম্খখানি রান্র! কী কাতর কারা! যেন বিবাহে নয়, সহমরণে যাছে। জাের করে নিয়ে যাছে সমাজ। নইলে কী জানি কী অমণ্যল হবে! প্রভাত অসহায় চক্ষে দেখতে লাগল এ দৃশ্য। সংশা সংশা তার ভিতরটা কঠিন হয়ে যেতে থাকল। সে চােথের জল ফেলবে না। তাতে

শক্তিক্ষর। সে সমাজসংস্কারক হবে। যাতে আর কোনো মেরের অকালে বিরে না হয়। ধরে বে'ধে বিয়ে দেওরা না হয়। রাহ্যরাই আদর্শ।

কিশ্বু রান্ব যখন শ্বশ্রবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী এলো তখন তার চেহারা দেখে প্রভাতের চোখের জল বাগ মানল না। ধ্বশত বিধ্বশত ভিতরে ও বাইরে। সমাজসংশ্বার দিয়ে তার ভাঙা হ্দর জোড়া লাগবে না, পোড়া জীবন কাঁচবে না। রান্ব কি বাঁচবে? কী করলে বাঁচবে? প্রভাতকে পাগল করে তুলল এ চিশ্বা। তত দিনে সে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ সব ছেড়েছ্বড়ে দিয়ে উধাও হয়ে যায়। সে সময় কলকাতা কংগ্রেসে সবে অসহব্যোগের প্রশ্বাব গৃহীত হয়েছে। লোকে ঠাওরাল মহাত্মা গান্ধীর ডাক শ্বেনে সে গোলামখানা থেকে বেরিয়েছে। তার গ্রেক্তন এই রটনার প্রতিবাদ করলেন না। প্রকৃত ঘটনা চেপে গেলেন। একটি বছর সে নানান জায়গায় ঘ্রল। কোথাও রাহ্ম সমাজের কাজে, কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে। কিছ্ব দিন কংগ্রেসের কাজে জেলখানায় কাটাল। অবশেষে মনটাকে বাঁধল। কলেজে ফিরল।

এবার রত্নর সংগ্যে আলাপ। কাননের সংগ্যে। নবনীর সংগ্যে। কালাপাহাড়ী দলের পত্তন হলো। কত রকম কার্যকলাপ নিয়ে ব্যাপ্ত রইল ওরা। কালাপাহাড় তো নামে। আসলে ডন কুইকসোট। রান্র সংগ্যে দেখা হয় না। তার ন্বামীর বর্দালর চাকরি। প্রভাতের মনে হলো তার নিজের দিক থেকে প্রেমনেই। নিবে গেছে। রান্র দিক থেকে যদি থাকে তবে প্রশ্রেষাগ্য নয়। বছর তিনেক অদর্শনের পর সখীর সংগ্য চোখাচোখি হয়ে গেল তার বাপের বাড়ীতে। অবাক হয়ে লক্ষ করল প্রভাত, রান্র র্প খ্লে গেছে। কোনো দিন সে এমন স্থী ছিল না। আরো অবাক হলো যখন নিরীক্ষণ করল—সখীর নয়নকোণে প্যাশন। সে প্যাশন তারই অভিমুখে উদ্দিষ্ট।

প্রভাত বরাবর প্র্যাকটিকাল মান্ষ। তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গ্রটোতে বসল। আর একটা দিনও নয়। কিন্তু খবরটা কেমন করে রান্র কানে পেশছল। সেও তৎক্ষণাৎ অস্থে পড়ল। মেয়েদের এ বিষয়ে অশিক্ষিতপট্তা আছে। এ বিদ্যা শেখে না কোনো নারী। শ্বনতে পেলো প্রভাত, ও বাড়ীর রান্র

ভয়ানক জনুর। একবার দেখতে চায় তোকে। তা শুনে গেল দেখা দিতে।
সখী তার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। সে চোখে অন্তহীন নিরাশা। সেই
সঞ্জে অনির্বাণ জনুলা। প্রভাত কী যেন বলতে চায়। তার মুখ ফোটে না।
চোখে চোখ রেখে রানুর কাছটিকে বসে থাকে সে। কত কাছে! তব্ কত
দ্রো! যেন জন্মান্তরের বাবধান। তা সত্ত্বে ভিতরে ভিতরে টেলিগ্রাফ চলে।
বিনা বাক্যে। সখী বলে, দেখছ তো আমাকে। তোমার কি কিছুই করবার
নেই? প্রভাত বলে, এখন আমি কী করতে পারি? হয় খ্ব দেরি হয়ে গেছে,
নয় এখনো সময় হয়নি। সখী বলে, তুমি তা হলে আশা দিছে? প্রভাত বলে,
আশা দিতে পারি, কিন্তু সে অর্থে নয়। সখী বলে, তাই যদি না হলো তবে
কেন বাঁচব? প্রভাত বলে, জীবনে আরো অনেক কাম্য আছে। এই কি সব!
সখী বলে, তৃষ্ণতের কাছে পানীয়ই সব।

আশা নেই অথচ আকাৎক্ষা আছে, এইখানেই তো জনালা। এ জনালা জন্ম হয়ে রানন্কে দহন করছিল। ওয়্ধে কী করবে! তা বলে প্রভাত আশা দিতে পারে না সে অর্থে। দিন কয়েক বাদে রয়র সংগ দেখা করে বলল, তোমার পিশ্চমে যাবার বড় শখ? চল, পশ্চিমেই যাই। না, ইউরোপে না। তার আগে ভারতের বিভিন্ন প্রাশত পরিদর্শন করতে হবে। আপাতত বেহার। রয় রাজী হয়ে গেল। কানন, হৈম, গিরীন এরা পিছনে পড়ে রইল বাংলাদেশের সেই মফঃশ্বল শহরে। ললিত আর নবনী কলকাতা চলল। ভাই ভাই ঠাই ঠাই। সাত ভাই চম্পায় ভাঙন ধরল।

পশ্চিমে এসে প্রভাত মনে করেছিল রান্ব ছোঁয়াচ এড়াতে পারবে। কিল্ডু ধারে ধারে উপলব্ধি করল সেও ভূগছে ঐ জররে। যদিও থার্মোমিটারে ধরা পড়ে না দেহতাপ। প্রভাত বলিল্ট প্র্রুষ। তার আদর্শ ফ্রাী ম্যান নয়, স্ট্রাং ম্যান। কিল্ডু গত আট দশ মাস যাবং তার যাতনার বিরাম নেই। সেটাও সহ্য হতো। কিল্ডু ওদিকে রান্ব অস্থ বেড়ে চলেছে। তার স্বামাী পর্যল্ড অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন প্রভাতকে একবার যেতে।

ষেতে কি তার পা ওঠে! পরের বাড়ী যে। রান্দ এখন পরকীয়া। ষে হতো তার নিজের বৌ তার সঙ্গে কথা বলতে হলে পরের কাছে প্রাথী⁴ হতে

হবে। দুটো গোপন কথা বলার জো নেই। কে কী ভাববে! চায় না প্রভাত জেল কয়েদীর মতো অনুগ্রহ। কিন্তু যদি না যায়, যদি শেষ দেখা না হয় তা হলে রান্ হয়তো এই প্রথিবী থেকে বিদায় নেবে চির আফসোস নিয়ে। অপূর্ণ তৃষ্ণার সংগে চির আফসোস! কী মর্মানিতক ট্রাজেড়ী! বিস্বাদ হয়ে যাবে না প্রভাতের অবশিষ্ট জীবন! কোনো দিন কি সে সূখী হতে পারবে! কিন্তু যদি যায়, যদি রান্ প্রাণ পায়, যদি বার বার যেতে বলে তখন কি এই যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে না! একে প্রেষ রেখে কার কী সূখ! প্রভাত তায় সখীর মরণকামনা করে না, কিন্তু আপনাকে বাঁচাতে চায়। এই বয়সে তার যদি দুরারোগ্য ব্যাধি হয় তা হলে জীবনে কী ফল!সে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে। যদিও বাইরের ঠাট বজায় রেখেছে। সমরিক শিক্ষা নিছে। শক্ত মানুষ হছে।

রত্ন কী বলে? প্রভাত যাবে কি যাবে না?

রত্ন অভিভূত হয়েছিল। কী বলবে? সে তো বিশ্বাস করে না ষে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ। প্যাশন সম্বন্ধে তার প্রাণে ভয়। প্রেম বলতে সে বোঝে রস। যে রস হৃদয়জ।

"প্রভাত," রত্ন একট্ ভেবে নিয়ে বলল, "তুমি যাও। তোমার না যাওয়াটা অমানবিক হবে। গোলে দেখবে তুমি যা ভেবেছ তা নয়। প্যাশন নয়। বিরহ্। মান্য মান্যের জন্যে বিরহ বোধ করবে, এইটেই স্বাভাবিক। সামাজিক সম্পর্ক যাই হোক না কেন। আমিও তো বিরহ বোধ করি একজনের জন্যে যিনি আমার কেউ নন সমাজের চোখে। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে না। বিবাহ যদি বা হয় মিলন হবে না। এও তো আশাহীন। তা বলে প্যাশন নয়। প্যাশনকে বিরহে পরিণত কর। দেখবে আশাহীনতা সভ্তেও শান্তি পাবে। তবে একটা 'কিন্তু' আছে। আর কাউকে বিয়ে করতে পাবে না, যতদিন রান্র জন্যে বিরহবোধ থাকে।"

"হায়!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল প্রভাত। "যদি অন্তর থেকে বলতে পারতুম ও কথা! রান্ তো তব্ কিছ্ম পেয়েছে। আমি যে কিছ্মই পাইনি। কোনো আন্বাদ।"

"তা যদি বল," রত্ন শরমে রঙিন হলো, "মালাদি হয়তো কিছু পেরে থাকবেন। তিনি একদা বিবাহিতা ছিলেন। আমি পাইনি। পাবও না। তা বলে কি আমি সেইজনাই আর কাউকে বিয়ে করব? আর কারো সঙ্গে মিলিত হব? না, ভাই। নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ অবিধি মিলিত হব? না, ভাই। নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ অবিধি মিলিত হব? না, ভাই। নারীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকে শেষ অবিধি মিলিত । আর যা তা অধিকল্ড়। সে যদি বরদা হয় তবে ওটা তার কর্ণা। ভগবানের কর্ণা। সব প্রেমই তো ভগবানের কাছ থেকে প্রবাহিত। তিনিই দাতা, গ্রহীতাও তিনিই। বৈষ্ণবরা বলে পরমাত্মা কৃষ্ণ জীবাত্মাও তাই।"

প্রভাত বলল, "আমি তোমার মতো মিশ্টিক নই। ভগবানকে এর মধ্যে টেনে আনার মর্ম বৃঝিনে। বৈষ্ণবও নই যে পরকীয়াতত্ত্বের মহিমা অবগত হব। তোমার কথা শ্বনলে আমার গা জবলে। বিয়ে হবে না, বিয়ে যদি বা হয় ইয়ে হবে না। কেন এমন অর্চি! আমার অন্মান তোমার মধ্যে একটা কমশ্লেক্স কাজ করছে। যাঁর সঙ্গে দিদি সম্পর্ক—ওটা কি পাতানো না সহজাত?"

"পাতানো।" রত্ন উত্তর দিল প্রশ্ন শেষ না হতেই।

"ঘাঁর সংশা দিদি সম্পর্ক পাতিয়েছ তাঁর সংশা জায়া সম্পর্ক পাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু অমন তো কত হয়। মেয়েয়া যাদের দাদা বলে ডাকে তাদের সংশা বিয়ে হলে পরে ছোট বোনের অভিনয় করে কি? তোমার মালাদিও তোমার 'ওগো' হবেন। তথন দেখবে নারীর সংশা তোমার সম্পর্ক প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রাকৃতিক হবে।"

রত্ন এ কথা শন্নে ক্ষর্থ হলো। তথন তাকে বর্ণনা করতে হলো মালাদির আখ্যান। এত দিন গোপন রেখেছিল সাত রাজার ধন মানিকের মতো। বন্ধ্বকে খ্বলে দেখাল এই প্রথম।

ছেলেবেলায় একবারমাত্র তাঁকে দেখেছিল রথযাত্রার মেলায়। একদিনেই খুব ভাব হয়ে যায়। দু'জনে হাত ধরাধরি করে বেড়ায়, দোকানে দোকানে ঘোরে, এটা সেটা কিনে ভাগাভাগি করে খায়। তার পর গোর্র গাড়ী করে

মালাদিরা রওনা হন এক দিকে, রক্ষরা আরেক দিকে। ঐ ভিন্ গাঁরের দিদির সংশ্য আর কোনো দিন সাক্ষাং হর্মান, হবার কথাও নয়, কারণ বিয়ের পর তিনি স্বামীর সংশ্য বর্মা চলে বান। অকস্মাং দেখা হয়ে গেল সম্দ্রের ধারে। তথন তাঁর সি'থির সি'দ্রে মুছে গেছে। হাসিখ্লির সেই ফেনিল ঝরণা তথন কর্মা রসের বিশীর্ণ মর্ম্রোত। দ্বংখিনী মেয়েকে নিয়ে মা বাপ তীর্থবাস করতে এসেছেন। চেনা লোক আর কেউ নেই। রক্ষই অনাহ্তভাবে সাহায্য করে। লাইরেরী থেকে বই এনে দেয়। নিজের মাসিকপন্ত পড়তে দেয়।

বিষাদের প্রতিমা। মৃতিমতী নিরাশা। রক্ন সমবেদনায় গলে যায়।
কিন্তু মালাদির নিজের চোখে জল নেই। ফ্রিরের গেছে ঝরতে ঝরতে। তিনি
কাঁদেন না, কাঁদান। রক্নর সমবেদনা যে কবে কেমন করে প্রেমে র্পান্তরিত
হলো রক্ন হিসাব রাখেনি। প্রেম কি না তাই বা কেমন করে জ্ঞানত, যদি না
লক্ষ করত যে মালাদির উপর টান তাকে ন্থির থাকতে দিছে না, দিনে দশ বার
নানা ছলে তাকে নিয়ে যাছে তাঁর কাছে। রায়েও তাঁর সপ্গে মান্দরে যাওয়া
চাই, যদিও সে প্রতিমাপ্জক নয়, প্রতিমাভগ্গকারী। মালাদি কিন্তু ঘ্নাক্ষরেও
জানতেন না, এখনো জানেন না যে রক্ন তাঁর প্রেমে পড়েছে। জানলে হয়তো
লক্ষায় মরে যেতেন। তিনি সংস্কারবন্ধ হিন্দর্ বিধবা। ন্বিতীয় বার বিবাহ
তাঁর চক্ষে অসতীর লক্ষণ। রক্ন যদি তাকে বই কাগজ পড়িয়ে গল্প করে ও
ভিজিয়ে সংস্কারমন্ত করতে পারে তা হলে তিনি হয়তো একদিন বিয়ে করতে
রাজী হবেন, কিন্তু রক্নকেই বিয়ে করবেন এটা তার দ্রাশা। সমবেদনা যেমন
প্রেমে র্পান্তরিত হয়েছে স্নেহ কি তেমনি র্পান্তরিত হবে, না হতে পারে?
প্রত্যেয় হয় না।

তার পর রত্মও তো বিবাহের জন্যে ব্যাকুল নয়। সে স্বাধীন থাকতে চায়। স্বাধীন অথচ সপ্রেম। বিবাহ যদি কোনো দিন করে তবে প্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্যে, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়। স্বাধীনতাকে থব করে নয়। উভর পক্ষেই থাকবে অসীম প্রেম আর অপরিসীম স্বাধীনতা। তার মধ্যে বিচ্ছেদের স্বাধীনতাও পড়ে। যার সপ্যে বিষ্ণে হবে তাকে এ কথা

বোঝায় কে? বিশেষ করে মালাদিকে। এক বার যে মেরে বিধবা হয়েছে পরের বার সে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, এ কি মুখ ফুটে বলবার মতো কথা? অথচ না বললেও নয়। বলতে হবেই এক দিন না এক দিন। না বললে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। যাঁকে ভালোবাসে তাঁর সংগা বিশ্বাসঘাতকতা রয়র পক্ষে অসম্ভব। যতদিন ভালোবাসতে মন যায় ভালোবাসবে, যতট্বকু নিতে ইচ্ছ্বক থাকেন দেবে, যতট্বকু দিতে ইচ্ছা করেন নেবে। সে স্বাধীন নায়ক, তিনি স্বাধীনা নায়িকা। ফ্রী উম্যান। এই ভিত্তির উপর প্রেম বতদিন পারে দাঁড়াবে। আপাতত এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

ক্রমেই তার প্রতীতি হচ্ছে, সে যেমনটি চায় তেমনটি এ দেশে সম্ভবপর নয়। হলে এ শ্রেণীতে নয়। তেমনটির জন্যে তাকে পশ্চিমেই যেতে হবে, তার মানে ইউরোপে আর্মেরিকায়। নয়তো গ্রামে গিয়ে চাষী কিংবা কারিগর শ্রেণীর লোক হতে হবে। এর কোনোটাই তার পক্ষে স্থকর নয়। কত কাল প্রবাসে কাটাবে? শ্রেণীচ্যুত হলে তো আত্মীয়দের লজ্জার কারণ হবে। সে যে আরো দ্বঃসহ। সেইজন্যে বিবাহের চিন্তা সে একেবারে মৃছে ফেলেছে মন থেকে।

প্রভাত অন্য কথা ভাবছিল। নিজের ভাবনার রেখা টেনে বলল, "মালাদি যদি তাঁর মৃত স্বামীর ক্ষাতি বহন করে সারা জীবন অতিপাত করেন তবে তোমার দোষ নেই, কিন্তু যদি তোমার প্রেমের প্রতিদান দেন, যদি তোমাকে বিয়ে করেন, তা হলে বাকীট্রকু—শ্রনছ, রত্ন—তাঁর কর্ণা নয়, তোমার পোর্ষ।"

রত্ন আরম্ভ হয়ে জিব কাটল। "তার মানে কী? বলপ্রয়োগ?" প্রভাত ব্যংগ করল। "ওঃ! আমার মনে ছিল না তুমি আহিংসাবাদী।" রত্ন উত্তেজিত হয়ে বলল, "এ তোমার যুম্ধক্ষেত্র নয়। এ হলো প্রেমের রাজা।"

প্রভাত রঙ্গ করে বলল, "যুদ্ধে আর প্রেমে সব কিছুই ন্যাষ্য।" রত্ন কোণঠাসা হয়ে কী আর বলবে? ফস্ করে বলে বসল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে মেয়েদের মধ্যে প্যাশন আছে। ওটা তোমার দ্রুভিন্রম।"

প্রভাত দপ করে জনলে উঠল। "বল কী! মেয়েদের মধ্যে প্যাশন নেই! ওটা আমার দ্ভিদ্রম! রতন, তুমি কি জন্মান্ধ, না চোখ তুলে কখনো মেয়েদের দিকে তাকাওনি? সবাই কি তোমার মালাদি? আছা, শোন তা হলে তোমাকে একটা কাহিনী বলি। কাহিনীটা সত্য। এই তো সেদিনকার ঘটনা। এখনো চার মাস হয়নি। প্জার বন্ধে দেখে এল্ম স্বচক্ষে। তব্ তুমি বলবে দ্ভিদ্রম।"

এই বলে সে শ্বর্ করে দিল আরেক বয়ান।

প্জার অবকাশে সে বিশ্রাম পায়নি। তাকে বস্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে নবগঠিত স্বরাজ্য পার্টির অনেকগ্লো নির্বাচনী সভায়। এই পার্টির নেতা দেশবন্ধ্ব চিত্তরঞ্জন তাকে স্নেহ করেন। তাঁকে জিতিয়ে দেওয়া চাই। তাই তাঁর ভাক শ্লনে ছল্টে গেছে মুশিদাবাদ জেলায়। তাঁর বিশ্বস্ত অন্গামীদের সঙ্গে জল্টে গেছে।

বেগমপ্ররের মিটিং জমিদারবাব্বদের নবাবী আমলের চকমিলান বাড়ীতে। তার ঠাকুরদালানের সামনের দরদালানে নেতৃস্থানীয়রা। বাঁধানো উঠোনে গাঁয়ের লোক। উপরের তলার তিন পাশের বারান্দায় চিক। চিকের আড়ালে মহিলারা।

নেতাদের পিছনের সারিতে প্রভাত ছিল। তার হঠাৎ মনে হলো বাঁ ধারের চিকের একটি কোণ যেন একট্খানি সরে গেছে। নজরে এলো, উ'কি মারছে একটি চোখ। সে চোখ এত স্কলর যে কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছা হয়, উদয় হয়েছে একটিমান্ত তারা। তথন গোধ্লি লান। দীপ জ্বলেনি। অত বড় ভবনে ওই একটিমান্ত সন্ধ্যাদীপ।

কিছ্কুণ পরে আবার মনোযোগ ভণ্গ হলো প্রভাতের। এবার একটি নর, একজোড়া চোখ। আরো খানিক পরে আদত একখানি মুখ। চাঁদের উপমা দিলে মাম্বলি শোনাবে। কিন্তু উদর হয়েছে যেটি হোক একটি জ্যোতিষ্ক। আলো হয়ে গেছে দশ দিক। তার পর প্রভাত চমংকৃত হয়ে লক্ষ করল চিকটা কেমন করে পিছনে চলে গেছে। চিকের সামনে বসে আছে উদিতা।

বয়স কত হবে ? এই উনিশ বিশ। তন্বী। গোরী। পরিধানে শাদা রেশমের শাড়ী। তার উপর শাদা রেশমের ফ্ল তোলা। ঘোমটা খসে গেছে। ঘন কাল্যে কেশ অবিন্যুত ভাবে কপোলে পড়েছে। হাতে সোনা বাঁধানো শাঁখা। কোথাও আর কোনো অলঞ্চার নেই। এক হাতে ধরে আছে একটি রক্ত গোলাপ। টকটকে লাল।

প্রভাত ভালো করে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। পাছে কেউ কিছ্ মনে করে। তব্ একবার চুরি করে চেয়ে দেখল। অপ্র র্পলাবণ্যবতী। কিন্তু বহিশিখার মতো লেলিহান। কে জানে কোন যজ্ঞবেদীতে এর জন্ম! এই যাজ্ঞ-সেনীর! আধ্যনিক ব্রগের মহাভারতে প্রাচীন ব্রগের মহাভারতের এ নারী কোন ভূমিকার অভিনয় করবে কে জানে! কাকে প্রেরণা জোগাবে? কোন ভীমার্জ্বনকে?

প্রভাতের বন্ধৃতার সময় হলো। সে যে বোকার মতো কী বলতে কী বলে গেল নিক্সেই জানে না। 'না জাগিলে যত ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না' এও নাকি সেদিন সে বলেছে। বলতে বলতে একবার তার দৃষ্টি পড়ে তর্দীর দৃষ্টিপথে। সে চোখে কী প্যাশন! এমন প্যাশন সে আর কারো চোখে দেখেনি। রান্র চোখেও না। রান্ব এর কাছে কী! দাবানলের কাছে ত্যানল!

বলতে বলতে তার মাথা ঘ্রলিয়ে গেল, কথা জড়িয়ে গেল। বাক্যের মাঝখানে হঠাং থেমে গেল সে। অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ল। ক্ষণকাল পরে চেয়ে দেখল মেরেটি চিকের আড়ালে ল্রকিয়েছে। যেমন মেঘের আড়ালে এই প্রির্ণমার চাঁদ। বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে তার আভাস। সভাশেষে কে একজন এনে দিয়ে গেল সেই রক্তগোলাপটি। প্রভাতকে নয়। স্ভাষদাকে। প্রভাত শ্বনতে পেলো, এই সেই শ্রীমতী যে মহাত্মা গাশ্বীকে অলঞ্চার খ্লে দিয়েছিল।—এই সেই শ্রীমতী! সেই বিখ্যাত শ্রীমতী!

রত্ন নিবিষ্ট হয়ে শ্নাছিল। কাহিনীর যে এইখানেই ইতি তা সে অন্মান করতে পারেনি। ভেবেছিল প্রভাত একট্ন দম নিয়ে আবার বলবে, কিন্তু দীর্ঘ বিরতির পর যখন নিস্তস্থতা ভংগ হলো তখন রত্নর কানে এলো, "রান্কে নিয়ে কী যে করি কিছু ব্রুতে পারছিনে, ভাই! আমি নিজে ক'দিন বাঁচব!"

রত্ন তখনো শ্রীমতীর ধ্যান করছিল। বলল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে ওটা পলিটিকাল প্যাশন। গরম গরম বক্তৃতা শ্নেলে কে না গরম হরে ওঠে!" প্রভাত বলল, "কতক মেয়ে আছে যারা এমনিতেই গরম।"

म.रे

মাস ছ'সাত পরে।

রত্ন সোদন কার মুখ দেখে উঠেছিল। ক্ষান্তবর্ষণ বিদ্যুৎ চমকানো মেঘলা দিন। বেলা ন'টা বেজে গেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হলো যখন হস্টেলের চাকর ল্যাংড়া লালজী এসে ঘরে ঘরে ডাক বিলি করে গেল। তত দিনে সে ও প্রভাত মেস থেকে হস্টেলে উঠে এসেছে। দ্ব'জনেই দ্ব'খানা এক-আসনিক ঘর পেরেছে।

রক্স ভাক নিয়ে দেখল তার নামে একখানা "ভারতী" ও একখানা খাম। তার স্বভাব সে মাসিকপত্র পেলে সেখানাই আগে খোলে ও একবার চোখ বর্নলিয়ে যায়। তার পর চিঠিপত্র। কিন্তু এই খামখানা ছিল নীল রঙের ও স্ব্বাসিত। আর এর ঠিকানাটা মেয়েলি হাতের। মাসিকপত্র ফেলে খামখানা খ্লে দেখে—একী! এ কে!

বেগনি রঙের কালি দিয়ে নীল রঙের কাগজের এক পিঠে রুল-টানা লাইন ধরে লেখা। পাতার পর পাতা মেয়েলি হাতের অক্ষর। রত্ন বার বার উলটে পালটে দেখল। না, মালাদির চিঠি নয়। মালাদি সুগশ্ধি ব্যবহার করেন না।

প্রিয় ভাই,

একটি অচেনা অজানা বোনের চিঠি হঠাৎ পেরে চমকে উঠবেন হরতো।
কিন্তু যার জন্যে এ চিঠি সে আপনার অচেনা নয়। যার কথায় লিখছি সে
আপনার অন্তর্গ্য বন্ধ্য, আপনার মন্ডলীর সদস্য। সন্প্রতি আমার
মন্ডলীতে যোগ দিয়েছে। আন্দাজ কর্ন দেখি প্রথম জনটি কে? আর
ন্বিতীয় জনটি?

পারলেন না তো? আচ্ছা, আমিই তবে বলি। দ্বিতীয়টি ললিত।

সে আমার ননদের দেওর। তার সপো আলাপ বেশী দিনের নর। গোড়া খেকেই সে আপনার নাম করছে। আপনার আর প্রভাতদার। কিন্তু সন্নাম নর। আপনারা নাকি স্বার্থপিরের মতো পশ্চিমে চলে গেছেন সরস্বতীপ্রভা করে লক্ষ্মীলাভ করতে। আপনাদের সব আদর্শবাদ নাকি বাক্ষে। ব্রুতে পারছি তার অভিমান হয়েছে। ছেলেটি আপনাদের দ্বজনের পরম ভক্ত। এখনো তার বিশ্বাস সোনালীর জন্যে যদি কেউ কিছ্ব করে তো সে রত্ন, সে প্রভাত।

এই দেখুন। প্রথম নামটিও বলে ফেলল্ম। সোনালীকে কি মনে আছে আপনার? তিন বছর আগে যে হতভাগিনীকে উন্ধার করতে আপনারা অগ্রসর হয়েছিলেন সাত ভাই চন্পার সেই পার্ল বোনটি আজ কোথায়? একটি বার কি খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না আপনার? বা আপনার বন্ধ্বরের? হায়! সে বেচারির দ্বঃখে পাষাণও গলে যায়। প্র জন্মে কী মহাপাপ করেছিল! জ্যোতিদা আবার বলে, প্র জন্ম নেই। সব বানানো। তা হলে পর জন্মও নেই। আপনার কী মনে হয়?

যা বলছিল্ম। সোনালীকে সেই রাবণরা তাদের অশোকবনে ল্মিরের রেখেছিল, তা তো জানেন। শত চেন্টাতেও সেখান থেকে তাকে উন্ধার করতে পারা যায়নি। আপনাদের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। বছর আড়াই পরে ওরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে হতভাগিনীকে ম্মিরি দেয়। তখন মাল্ম হলো বন্ধনের চেয়ে বন্ধনমোচনেই বেশী দ্বঃখ। বাগানবাড়ী থেকে ছাড়া পেয়ে সে যাবে কোন চুলোয়! বাপ মা দ্র দ্র করে দরজা বন্ধ করে দিল। একট্ম আশ্রয়ের জন্যে সে ন্বারে ন্বারে ব্ররল। কেউ দয়া করল না। যেসব লোক দয়ার ভাণ করল তাদের অস্ফ্টে শত্র অবিকল রাবণদের মতো। লঙ্কায় কি সকলেই রাবণ? সোনালী তা হলে শস্তায় আপনাকে বিকিয়ে দেয় কেন? ব্রুতে পারলেন, না আরো খোলসা করতে হবে? সে সোজা বাড়ী-উলির কাছে গিয়ের ঘর ভাড়া করল, প্রিলশের কাছে গিয়ে নাম লেখাল।

রত্বভাই, কী লম্জা! কী লম্জা! আমি নারী হয়ে জন্মেছি বলে লম্জিত। আপনি প্রেয়ুষ হয়ে জন্মেছেন বলে লম্জিত নন? কিন্তু এই লম্জা যদি

ক্রোধে পরিণত না হলো তবে সোনালীর মতো সোনার মেরেদের কোনো প্রতিকার আছে কি? আমি তো অনেক আগে থেকেই অলম্কার ত্যাগ করেছি। ভাবছি এবার নতুন কী ত্যাগ করব। মাংস খাইনে, মাছ খাই। মাছ ছেড়ে দিলে কেমন হর? অন্যায় চির কাল জিতবে? কেউ পারবে না রুখতে?

ললিত বলছে আপনারা যদি চেণ্টা করেন সোনালীকে অপ্থান থেকে উন্ধার করে পারুপ্থ করা এখনো সম্ভব। ও আশ্রমে যাবে না। হয় বিয়ে করবে, নয় যা করছে তাই করবে। ওরও তো আত্মসম্মান আছে। আমি এটা সমর্থন করি। নারীর বেলা অন্য ব্যবস্থা কেন? প্রব্যের বেলা তো বিয়ে আটকায় না। ঐ যে বড় রাক্ষসটা ওটারও তো সেদিন মহা ধ্যধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। সবাই জানে ওর কাম্ড। অথচ একজনও অসহযোগ করবে না। সবংশে খাবে ও-বাড়ীর ভোজ। রায় বাহাদ্র নেমন্তম করেছেন বলে কী রকম কৃতার্থ গদগদ ভাব! সমাজপতি যে! ওটিও তো একটি পয়লা নম্বর পারাবত। কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে। কার ছেলে সেটা মনে রাখতে হবে। বড় রাক্ষস এখন পতিদেবতা হয়েছে। এর পয়ে একদিন সমাজপতি হবে। ছোট চলল কলকাতা। সেখানে ব্যবসা করবে। কে জানে কিসের ব্যবসা! নারীমাংসের নয় তো!

ভয়ে বলি কি নির্ভায়ে বলি? রক্নভায়, আমার তো মনে হয় আপনিই ওই পরমা স্কুলরী কন্যার উপযুক্ত বর। আপনার কথা আমি অনেক শ্রুনেছি যে। তাই তো অমন কথা লিখতে সাহস হলো। বেয়াদবি মাফ করবেন। প্রভাতদার উপরেও আমার সমান নির্ভারতা। তাঁর বীরত্বের তুলনা নেই। সোনালীর জন্যে তিনি যা করেছেন তা নিয়ে নতুন একখানা রামায়ণ লেখা যায়। শ্রুখায় তাঁর পায়ে মাথা ন্য়ে আসে। তাঁকে আর আলাদা করে লিখল্ম না। এ চিঠি যদি দয়া করে তাঁকে দেখতে দেন কৃতজ্ঞ হব। তিনিও তো এখনো কুমার। তাঁর মতো নায়ক কে না কামনা করে! ধন্য হবে সোনালী।

এবার আমার আত্মপরিচর দিল্ম না। যদি আপনার সাড়া পাই পরে ওসব হবে। সাড়া পাব তো? না পেলে কিছ্মনে করব না। ব্রুব আপনি ও আপনার বংধ্র আক্ষম। আজ তা হলে আসি। সোনালী দিন দিন তলিয়ে বাছে। একটি একটি করে দিন যায়, আর একট্র একট্র করে তলিয়ে যায়। যা করবেন জল্দি করবেন। নয়তো বড় বেশী দেরি হয়ে যাবে। উত্তরের জন্যে ডাকঘরে রোজ বিশ্বাসী লোক পাঠাব।

নমস্কার, রত্নভাই। ইতি। আপনার শরণাথিনী

শ্রীমতী দেবী

রত্ন এ চিঠি পড়ে প্রথমে কিছ্কেণ থ হরে রইল। চমক বলে চমক! পাতার পাতার চমক। পদে পদে চমক। তার পর রোমাণ্ড বোধ করল। কানে এলো কাকনের কন কন। আঁচলের খস খস। দ্বাণে এলো এসেন্সের স্রভি। প্রাণে এলো প্রথম পরিচয়ের চাণ্ডল্য। অচেনা অজানা বোন। অচেনা অজানা নারী।

তার পর বেদনার ঢলে পড়ল। তিন বছর আগে যা ঘটেছিল তার স্মৃতিও বেদনাবহ। তার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে বেশ তো নিশ্চিন্ডে ছিল এত দিন। সোনালী বোনের প্রতি যেন আর কোনো কর্তব্য নেই। যা কিছু করণীয় তা করা হয়ে গেছে। কোথাকার কে এক শ্রীমতী দেবী আজ আদিখ্যেতা করে স্মরণ করিয়ে দিছেন সে-সব ঘটনা। সোনালী চলেছে পতনের পথে। গড়াতে গড়াতে নিচে থেকে আরো নিচে। সিশিড়র ধাপ থেকে পা ফস্কালে যেমন হয়। এ ক্ষেত্রে স্বেছায় নয়, আকস্মিকভাবে, অপরের ধর্ষণে। তার জের এখনো মিটল না। মোমেশ্টাম এখনো থামল না। বাঘে ছালে আঠারো ঘা।

গণগাস্নান করে ঘরে ফিরছিল পাশের ঘরের ব্রিজনন্দন। রত্নকে তড়িতা-হতের মতো পড়ে থাকতে দেখে তার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল হিন্দীতে, "ব্যাপার কী! খুব কি খারাপ খবর!" রত্ন কথা কইতে গিয়ে দেখল কথা আসছে না। মুখ না মন কোনটা অসাড় কে জানে! কিন্তু চিঠিখানা সে ক্ষিপ্র হাতে খামে প্রে দ্রে সরিয়ে রাখল। আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয়। ব্রিজনন্দন অবশ্য বাংলা পড়তে জানে না। অপ্রতিভ হলো উভয়েই।

বছ ও শীমতী

না, আর কেউ পড়ে এটা তার ইচ্ছা নয়। প্রভাতও না। এ চিঠি রক্সকে লেখা, রক্ষর একার। কিন্তু কী করবে, প্রভাতকে না দেখিরে উপায় লেই। লেখিকার নির্দেশ। তখন কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছিল। কোনো মতে করেকটা ঘণ্টা কাবার করে বিকেলের দিকে প্রভাতের সংগ্যে দেখা। তত ক্ষণে রক্ষ সামলে নিয়েছে। ভিতরে ভিতরে লম্জায় জড়সড়। বাইরে দিব্য সপ্রতিভ ভাব। দ্বই বন্ধ্র কথাবার্তা এই রুপ নিল:

"শন্নেছ, ললিত আমাদের না বলে অন্য একটা মণ্ডলীতে ভিড়েছে?" "তাই নাকি? কার কাছে শ্বনলে?"

"আজ একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছি। মেয়েলি হাতের।"

"বেনামী চিঠি! মেয়েলি হাতের! কী করে ব্রুবলে?"

"মেরেলি হাতের তা তো দেখলেই বোঝা যায়। বেনামী এটা আমার অন্মান। ভদুমহিলার নাম হয়তো শ্রীমতী আমাকালী দেবী কি শ্রীমতী নিভাননী দেবী। মাঝখানটা চেপে গিয়ে লিখেছেন শ্রীমতী দেবী।"

প্রভাত কৌত্হলী হয়ে বলল, "কই দেখি?" সঞ্জে সংশোধন করে বলল, "দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়। তোমাকে দেখতে দিতে বলেছেন।"

চিঠি পড়ে প্রভাত রত্নর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। "অভিনন্দন। স্বয়ং শ্রীমতী তোমাকে চিঠি লিখেছে। দেশের লোক কেই বা তোমাকে চেনে। সে তোমার চেয়ে বহুগুলুণ বিখ্যাত। অথচ তুমি তার নামটাই জান না। জানবে কী করে? রাজনীতিক মহলে তো মেশ না। কেন, তোমাকে বলিনি তার নাম একদিন গণগার ধারে? মাস কয়েক আগে একদিন প্রিশিমার রাত্রে? সেই ষে গান্ধীকে অলঞ্কার খুলে দিয়েছিল।"

রত্ন ভুলে গেছল। মনে পড়ল শা্ধ্য একটি চিত্রকণা। শরমে লোহিত হরে। বলল, "সেই যাঁর চোখে প্যাশন?"

"সে-ই।" প্রভাত বলল রহস্যময় ভণ্গীতে। যেন জ্বন্ধ্ব ভয় দেখাছে। "তিনিই!" রত্ন নেতিয়ে পড়ল শৃষ্কায়, নিরাশায়।

প্রভাত চাপা গলায় বলল, "শুধু তাই নয়। ইতিমধ্যে কানে এসেছে আরো

বছ ও শ্রীমতী

জবর খবর। কশ্চিং সন্দ্রাসবাদী উপদল শ্রীমতীকে হিন্দ্তনীর মতো সামনে রেখে হন্দ্তী সংগ্রহ করছে। দেখছি ললিতকে দলে টেনেছে, এর পর তোমাকেও টানবে। কোনখানে কার দর্বলতা সেটা ওদের অজানা নয়, সেইখানেই ওদের আবেদন। তোমার দর্বলতা তুমি নারীর অপমান শ্নলেই লাফিয়ে ওঠ। ডন কুইকসেটের মতো ছোট আর ছোটাও। তার পর তুমি খেলোয়াড়ের মতো বসে থাক আরু আমি লাটুরে মতো বন বন করে ঘ্রির।"

এই বলে সে ছড়া কাটল, "প্রভাত শর্মা করিং কর্মা। রত্ন বর্মা স্লেফ অকর্মা।"

ওই "স্রেফ" কথাটির আমদানি হরেছিল কাজী নজর্মল ইসলামের কবিতা থেকে। প্রভাতের প্রিয়তম কবি। ইতিমধ্যে সে গিয়ে আলাপ করে এসেছে তাঁর সংশ্যে।

রত্ন মাথায় হাত দিয়ে বসল। এর মধ্যে এত রহস্য আছে! তার চেহারা দেখে প্রভাতের মায়া হলো। "থাক, তোমাকে ও চিঠির জবাব দিতে হবে না। আমিই দু'জনের হয়ে জবাব দেব। কী লিখব, শুনবে?"

রত্ন চোখ তুলে তাকাল। প্রভাত লিখবে শন্নে আশ্বদত। কী লিখবে শন্নতে উৎসক্র।

"লিখব, ভদ্রে, আমরা তিন বছর আগে পরাজিত হয়েছি। আর নতুন করে। লড়তে ইচ্ছা নেই। আপনি অপর সৈনিকের সন্ধান কর্ন।"

রত্ম মর্মাহত হলো। প্রভাতটা কী র্ঢ়! ভদুমহিলাকে অমন করে লিখতে আছে! আর পরাজিত কিসের? মানবাথা অপরাজেয়। তবে, হাঁ, লড়তে ইচ্ছানেই সে কথা ঠিক। গত কয়েক মাস ধরে রত্মর ভিতরেও একটা পরিবর্তন চলেছে। তার জীবনদর্শন বদলে গেছে। জগতে এত রকম এত বেশী মন্দ আছে যে তার সংগ্রে যুঝতে থাকলে আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে না। ফলে সৃষ্টি করা হয় না। যৌবন চলে গেলে নারী যেমন হাজার মাথা খ্রুলেও মা হতে পারে না তেমনি শত তপস্যা করলেও প্রুষ হতে পারে না শিল্পী বা কবি, স্বান্দিক বা ধ্যানী। প্রিশা ফিরে ফিরে আসে, বসন্ত ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু যৌবন একবার গেলে আর আসে না। দীর্ঘণবাসের সংগ্রে স্বীকার করতে

হবে যে স্থির বাসনা বার আছে তাকে বোবনের দিনে রণ্ছোড় হতে হবে।
তার পক্ষে এটা গোরবের নর। তার বিবেক সব সময় বিক্ষুপ। মদ্দ কি তা
হলে কায়েম হলো? হলো হয়তো, কিন্তু জগতে নবজাত সোন্দর্য এলো। তার
প্রভাব স্কুরপ্রসারী। যেমন অন্ধকার রাতে দীপের আলো। দীপ জনলে ওঠা
মাত্র একট্খানি তফাৎ হলো বইকি। কালিমার মহিমা খর্ব হলো।

প্রভাত লক্ষ করল রত্নর মুখ থেকে আভা মিলিয়ে গেছে। গাঢ় স্বরে বলল, "ভাই রত্ন, এই তিন বছরে আমি অনেক দেখেছি অনেক শিখেছি। তুমি কি জান না যে আমি নিজে প্ররোহিত হয়ে বিধবার বিয়ে দিয়েছি, অসবর্ণ বিবাহের সাক্ষী হয়েছি, পতিপরিতাক্তাকে মুসলমান করে মুসলমান বন্ধুর হাতে স'পে দিয়েছি? কিন্তু এই সোনালী মেয়েটির বেলা আমি পরাজিত। এ যদি মুসলমান হতে রাজী হয় আমি এর বিয়ের ভার নিতে পারি, কিন্তু আমি নিজে মুসলমান হতে নারাজ, আর হিন্দু হয়ে আমি পতিতা পরিগ্রহ করতে অক্ষম।"

"পতিতা কেন বলছ? পাতিতা।" রত্ন সংশোধন করল।

"আচ্ছা, তাই হোক। পাতিতা। কিন্তু আমার সাধ্য নয়। এই ইস্কৃতে আমি হিন্দু সমাজের সংগে লড়তে যাব না। গেলে আমার নির্দাত হার হবে।"

রত্ন রাগ করে বলল, "তা হলে সাত ভাই চম্পা ভেঙে দাও। পার্ল বোন যখন ভেসে গেল। তলিয়ে গেল।"

প্রভাত কর্মণ হেসে বলল, "তুমি থাকতে?"

"সোনালী যদি আমাকে ভালোবাসত আর আমি ভালোবাসতুম ওকে," রত্ন ঢোক গিলে বলল, "তা হলে আমাদের বিয়ের কথা উঠত।"

"তা যখন নয় তখন কী করার কথা ওঠে? ও যেখানে আছে সেখান থেকে ওকে সরিয়ে কোথায় রাখবে তুমি? বোনের মতো নিজের বাড়ীতে?"

"বাড়ী তো আমার নয়, আমার বাবার। তিনি রাজী হলে তো? না, ভাই। সে আশা নেই।" রত্ন আক্ষেপ করল।

"তা হলে নিজের বাড়ী যত দিন না হয়েছে তত দিন সব্বর করতে হয়। তত দিন সোনালীকে ভরসা দিতে চাও, দিতে পার। কিন্তু তুমি কি জান ঠিক কত দিন পরে তোমার নিজের বাড়ী হবে? আর সে বাড়ীতে কার

বন্ধ ও শ্রীমতী

অধিকার বেশী? বোরের না বোনের? বো এলে বোনকে বিদার করে দেবে না?"

রক্স সম্পূর্ণ অপদম্থ হলো। "সোনালী কি তা হলে ওইখানেই চিরকাল থাকবে?"

"অগত্যা। হিন্দ্র সমাজে ওই তার খবিনিদি ঘট স্থান। কিন্দু সমাজ বলছি বে, সমাজে কি ওর কেউ আছে! ও তো সমাজের বাইরে। তা হলে ম্রসলমানের সংশা বিয়ে হলে ক্ষতি কী? তবে বিয়েটা একটা সমাধান নয়। দেখছি তো রান্বক।"

রত্ন বহু কাল রান্ত্র কথা জিজ্ঞাসা করেনি। জানতে চাইল, "রান্ত কেমন আছে. প্রভাত?"

"বে'চে আছে। থাকবে যত দিন না আমার বিরে হয়েছে।" দীর্ঘ'শ্বাস ছাড়ঙ্গ প্রভাত। 'মানুষ বাঁচে আশায়। ওর এই একটিমার আশা যে আমি আইবৃড় থাকব আজীবন। তা কি আমি পারি!"

"ও বাঁচবে না জেনেও কি তুমি বিয়ে করবে?"

"আমার তো ভীন্মের প্রতিজ্ঞা নর। আমি চাই স্ক্রে স্বাভাবিক জীবন।" "তা বলে একটি নারীর জীবনের বিনিময়ে!" রত্ন অনুযোগ করল।

প্রভাত বলল ক্লান্ত কর্ণ কন্টে, "সেইজন্যেই তো বলি আমরা পরাজিত।" "না। আমরা পরাজয় স্বীকার করব না।" রত্ন ছোষণা করল দৃশ্ত স্বরে। "তা হলে তুমিই বল রান্কে নিয়ে আমি কী করি।"

"রান্ তোমাকে ভালোবাসে। তুমি রান্কে ভালোবাস। ভালোবাসার আইন আর বিরের আইন এ দ্বটোর সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অন্সারেই মান্ম চলবে। সমাজ বদি মান্বের সমাজ হয়ে থাকে তবে সমাজও চলবে। ভালোবাসার আইন কী করতে বলে? বলে, রান্কে বাঁচাও। যা করলে ও বাঁচে তাই কর। ওর স্বামীকে বল ওকে ছাড়পত্র দিতে। তার পর ওকে নিয়ে সংসার পাত।"

"বিয়ে না করেও?"

"সম্ভব হলে বিয়ে করে। না হলে না করেও।"

প্রভাত স্তম্ভিত হয়ে বলল, "রঙ্গ, ছি!"

রত্ন নিরম্ত হলো না। বলে চলল, "পরাজয় বরণের চেয়ে লোকনিন্দা বরণ শ্রেয়। প্রভাত, ভাই, তুমি যদি জীবনের প্রথম দিনের রণেই পরাজয় মেনে নাও তা হলে তোমার ভাঙা মাজা জোড়া লাগবে না আর। পার্থিব সাফল্য নিয়ে তুমি করবে কী? তার চেয়ে স্প্হনীয় মহৎ কর্মে বিফলতা। তেমন বিফলতা পরাজয় নয়।"

প্রভাতের স্বর কাঁপছিল আবেগে। "ভাই, তোমার য্তির জাের আমি মানি। কিন্তু আমার শান্তর দৌড় আমি জানি। আর রান্তকে তাে আমি চিনি। সে তার স্বামীটিকে ছাড়বে না। স্বামী ছাড়পত্র দিলে সেই দণ্ডেই মারা যাবে।"

রত্ন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ ঘা খেরে "রার্গী" করে উঠল।

তার বন্ধ, তাকে প্রবাধ দিল। "রত্ন, তুমি সরল মান্ধ। জটিলকে সরল করে এনে সমাধান করতে চাও। যেমন করে অব্দ কষতে। জীবনে তা হয় না। জটিলকে জটিল রেখেই সমাধান খ্জতে হবে। রান্ধ যে আমাকে না পেলে বাঁচবে না এটা সত্য। তেমনি ওটাও সত্য যে, সে যার সংশ্য মন্দ্র পড়েছে, অবিন সান্দ্রী করে যাঁর হাত ধরেছে, যাঁর ঘরে ঘরনী হয়েছে, যাঁর স্বজনদের বাঁমা বৌদি কাকিমা মাসিমা হয়েছে, যাঁর সন্তানের মা হবে কে জানে কোন দিন," বলতে বলতে প্রভাতের গলা ধরে এলো, "তাঁর সংশ্য বিচ্ছেদ কন্পনা করতে পারে না। ভালোবাসার আইন অন্সারে চলবে যে, ভালোবাসা কি তাঁদের দিক থেকে নেই, তাঁদের উপর নেই? আর সমাজভয় তো মেয়েদেরই বেশী। পার্ব্ব দানিন বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়। নারী কি ঘরের বৌ ঘরে ফিরতে পারে!"

রত্ন কোথার একট্বখানি সহান্ত্তি দেখাবে, না রেগে আকুল হলো। "ও সব সংসারী লোকের যুক্তি। প্রেমিক প্রব্রের নর। প্রেম অসাধ্যসাধনের সংকল্প নের। চরম বিপদের সম্ম্বখীন হয়। জীবন যদি আমাকে দিত তেমন একটা স্ব্যোগ যেমন দিয়েছে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতুম প্রেম কত বড় শক্তিমান।"

প্রভাত রুম্ধান্বাসে বলল, "একে তুমি সুযোগ বল, রক্ন! আমার মতো অভাগাকে ঈর্বা কর তুমি! এমন দুর্ভাগ্য যেন শুরুরও না হয়।"

বছ ও শ্রীমতী

"ভাই প্রভাত, তুমি ভূলে বাচ্ছ যে তুমি নারীর প্রেম পেরেছ। আমি পাইনি। তুমি ধন্য। আমি নই। তোমার কপালে রাজটীকা। আমার কপালে ভাই-ফোটা। মালাদি আমাকে তার বেশী দেননি, দেবেন না। রান্ তোমাকে তার বেশী দিয়েছে, আরো দেবে যদি তুমি তার প্রেমের মর্যাদা রাখ।"

প্রভাত কী মনে করে জিজ্ঞাসা করল, "রত্ন, জীবনে নারীর প্রেমই কি সব চেয়ে মূল্যবান? তার উপর আর কিছু নেই।"

রত্ম সকালবেলার উদ্দীপনায় তখনো উদ্দীপত ছিল। বলল, "রাধার প্রেমই সাধ্যশিরোমণি। তার উপরে যদি কিছ্ম থাকে তবে সে-ই দেখতে পায় যে তত দ্রে উঠেছে।"

এ কথা শন্নে প্রভাত সহসা গম্ভীর হলো। শাহুক কশ্ঠে বলল, "রত্ন, ভাই, কখনো কোনো বিবাহিতা মেয়ের প্রেমে পোড়ো না।"

রত্ন আশ্চর্য হলো। বলল, "সে ভয় নেই। আমার মালা আছে। আমি মালা জপ করি। তা কি তুমি জান না?"

সেদিন বিদায় নেবার সময় রত্নর মনে পড়ল যে শ্রীমতী দেবীর চিঠির উত্তর দিতে হবে। প্রভাতকে বলল, "বেশ, তুমিই এ চিঠির উত্তর দিয়ো। তবে আমারও এক লাইন লেখা উচিত। না লিখলে অসৌজন্য হবে।"

"কী লিখতে চাও তুমি?"

"লিখব, দিদি, আপনার পত্রের উত্তর প্রভাত দিচ্ছে। ওটা আমারও উত্তর।" প্রভাত তার রোমশ ভুরু কু*চকিয়ে বলল, "দিদি! দিদি কেন?"

"রক্সভাই বলে ধখন ডেকেছেন তখন বয়সে বড় নিশ্চয়।"

"দেখে তো মনে হয়নি তখন। খ্যাতিটা বয়সের অনুপাতে বেশী।"

রত্ন মনে মনে এই সংবাদটি জানতে চেয়েছিল। আর একটি সমাচার জানতে বাকী ছিল তার। তা না না করে প্রশ্নটা তুলল। তুলতে গিয়ে রেঙে উঠল।

তার উত্তরে প্রভাত দন্তন হাসি হাসল। "হাঁ। বিবাহিতা। লক্ষ করনি, পোলত আমার ননদের দেওর?' বিয়ে না করলে ননদ হয় কখনো?"

রত্নর অত খেরাল ছিল না। অপ্রস্তৃত হলো।

ঘরে ফিরে এসে রত্ন শ্রীমতীর চিঠিখানা আরো একবার পড়ল। ইতিমধ্যে পড়া হয়ে গেছে দ্বতিন বার। চিঠির উত্তর না দিলে বা এক লাইন উত্তর দিলে কী মনে করবেন শ্রীমতী বোন!

বোন? হাঁ, বোনই তো। ভাই বলে ডেকেছেন যখন তখন বোন নর তো কী? এই অচেনা অজানা বোনটির প্রতি রত্নর দ্রাতৃদ্দেহ সন্থারিত হয়েছিল। আমার বোন! আমার নতুন বোন! আমার শ্রীমতী বোন! আমার বোনকে আমি চিঠি লিখব না? লিখবে আরেকজন? দেখ দেখি কত বড় একখানা চিঠি! এ চিঠির উত্তর বদি এত বড় না হয় তা হলে দ্নেহের পরিচয় দেওয়া হবে কী করে?

স্নেহ? হাঁ, স্নেহই তো। বাকে চোখে দেখিনি তার প্রতি স্নেহ অন্ভব করা এমন কী নতুন কথা হলো! মাসীর মেয়ে মিন্কেও তো দেখিনি। সে এখন তার স্বামীর সংগ্য নাগপ্রের না কোথায়। এক কালে খ্র চিঠিপত্র লিখত আমাকে। উত্তরও পেত। বিয়ের পর থেকে চুপচাপ। স্নেহ অন্ভব করা চোখের দেখার অপেক্ষা রাখে না। সম্বন্ধটা স্নেহের সম্বন্ধ হলেই হলো।

রত্ন স্থির করে ফেলল চিঠির জবাব সে নিজেই দেবে। এক লাইনে নয়, সবিস্তারে। কেন সোনালীর জন্যে কিছু করা সম্ভব নয় তা ব্রিরেরে বলবে, গ্রুছিয়ে বলবে। প্রভাতের বিয়ে না করার কারণ এক। রত্নর বিয়ে না করার কারণ অন্য। প্রভাত কেন পারবে রত্নর মনের কথা রত্নর মনের মতো করে লিখতে? তা ছাড়া গত কয়েক মাস ধরে রত্নর অন্তজীবনে একটা সংকট চলছিল। এই সম্প্রতি তার সংকট মোচন হয়েছে। ভাঙার কাজ সে অপরের উপর ছেড়ে দিতে চায়। গড়ার কাজ নিয়ে থাকতে চায় নিজে। সোনালীর ভার নিয়ে সংগ্রাম করাও তো ভাঙার কাজ।

কিম্পু কেউ যদি কিছু না করে তা হলে কী করে রক্ষা পাবে সোনালী? সে কি তবে অকুল সাগরে ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যাবে মিলিয়ে যাবে? সেও তো একটি বোন। তার জন্যে রত্নর মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। যেমন ভারাক্রান্ত সেই ভাদ্রের আকাশ।

তিন

পরের দিন রবিবার ছিল। সারা দিন ধরে বার বার মুসাবিদা করার ফলে রক্মর উদ্ভরটা অবশেষে এই রূপ নিল:

অচেনা অজানা বোন.

বছর তিনেক আগে যে যদ্মণা আমাকে অধীর করে তুর্লেছিল আজ এত কাল পরে তার প্নারাবৃত্তি আমাকে দ্বিতীয় বার অস্থির করলেই কি আমি এক হাতে কিছু করতে পারব? সোনালীর কথা বলছি।

আপনি যা লিখেছেন তা আপনার যোগ্য হয়েছে। এই তো চাই। আমাদের মেরেরা তাদেরই মতো আর কয়েকটি মেয়েকে বিপন্ন দেখে মুখ ফিরিয়ে না নিলে ঘূণা না করলে সোনালীরা এমন ভাবে নির্যাতিত হতো না। তাদের বিয়ে হতো, ঘরসংসার হতো, লোকে ভূলে যেত সাময়িক একটা দূর্ঘটনা। যেমন ভূলে যাবে বড় রাক্ষস ও ছোট রাক্ষসের বেলা। যদিও এদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। এমনি আমাদের সমাজ যে উদোর শাস্তি পড়ল বুধোর ঘাড়ে। ভূগতে হলো সোনালীকেই। রামায়ণের যুগেও তো যত দুভোগ সীতারই। রাবণের আর কী এমন দুর্গতি হলো! সে তো রামের হাতে মরে বৈকুণ্ঠে গেল। শত্ররূপে সাধনা করলে নাকি ভগবানকে তিন জন্মে পাওয়া যায়। ভন্তরপে সাত জন্ম। পুরুষ যাই কর্ক না কেন তার সাত খুন মাফ। যত নির্দোষ হোক না কেন সাজা কেবল নারীর বেলা। আমি কিন্তু অবাক হই ভেবে যে, মেয়েরা কেন এটা মেনে নেয়, কেন নারীর পক্ষ নেয় না, কেন সীতার পক্ষ নিল না সেকালে, সোনালীর পক্ষ একালে? তার চেয়ে আরো অবাক হচ্ছি দেখে যে, এ পোড়া দেশে এত যুগ পরে এমন একজন মহিলার অভ্যুদয় হয়েছে বিনি সোনালীর পক্ষে। এ বিসময় আনন্দের।

অচেনা অজানা বোন, কেন আপনি এলেন না তিন বছর আগে যখন কেউ ছিল না আমাদের প্রেরণা দিতে? এলেন যদি, তবে এত দেরিতে কেন? আমাদের মণ্ডলী ভেঙে যাবার সামিল। আমরা নানা জারগার

ছড়িরে পড়েছি। মতভেদ ও পথভেদ দেখা দিয়েছে। একজোট হরে আর আমরা কাজ করিনে। করতে পারিনে। প্রভাতকে আপনার চিঠি দেখাতে সে বলল, আমরা পরাজিত। আমরা নতুন করে লড়তে অনিচ্ছন্ক। আমি অবশ্য স্বীকার করব না ধে, আমরা পরাজিত। কিন্তু আমার নিজের একটা সাধনা আছে। আমি যাকে ভালোবাসব তার ভালোবাসা পেলে. তাকেই বিয়ে করব, বদি বিয়ের উপার থাকে। কিবো বে আমাকে ভালোবাসবে সে আমার ভালোবাসা পেলে সেই হবে আমার বধ্, বদি বিশেষ কোনো বাধা না থাকে। ভালোবাসার আইন ও বিয়ের আইন এ দনুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না হলে ভালোবাসার আইন অন্সরণ করব। একসংশ্য থাকব। ভালোবাসা বত দিন একসংশ্য থাকা তত দিন। হয়তো আজীবন।

সত্যি বলতে কি, বিবাহ নামক প্রথাটা আমার চোখে স্কুলর নয়, তবে প্রয়োজনীয়। প্রয়োজন হতো না যদি প্রয়্য নায়ীর সংশা বিশ্বাসভংগ না করত, নায়ী না করত প্রয়ুষের সংশা। কিন্তু অবিশ্বাস দিয়ে যায় শ্রুর কী করে তা স্থের হবে! বিশ্বাসের অভাব বা অল্পতা যায় মধ্যে দেখব কেমন করে তাকে চিরদিন ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দেব! যে নায়ী আমাকে এত বেশী বিশ্বাস করবে যে বিয়ের কথা মুখে আনবে না অথচ ভালোবাসার চ্ডান্ত প্রমাণ দেবে তাকেই বিয়ে করব আমি, তায় বিশ্বাসের মর্যাদা রাখব। আর যে বলবে আগে বিয়ে তার পরে বিশ্বাস, তার সংগ্র আমার বিবাহ কোনো দিন হবে না।

তার পর বিবাহ একবার হলে আমরণ স্থায়ী হবে এমন কোনো
নিশ্চয়তা দিতে আমি নারাজ, কারণ মান্ধের হ্দয়ের উপর তার নিজেরই
হাত নেই, সে জাের করে ভালোবাসতে পারে না সবদিন। ভালোবাসার
ভাণ কি ভালো? আমি বলি, না। ভালো নয়। তার চেয়ে ছাড়াছাড়ি
ভালো। ছাড়াছাড়ির পর আবার বিয়ে। যদি নতুন করে প্রেম আসে
জীবনে। এ স্বাধীনতা প্রুবেরও থাকবে, নারীরও থাকবে। নারী যদি
পাঁচ বার বিয়ে করে মহাভারত অশৃশ্ব হবে না। বরং সেইটেই হবে

মহাভারতসম্মত। একসংখ্য পাঁচজনকে নর কিন্তু। তাতে আমি অসম্মত। এই যার মতবাদ তারই সংখ্য সোনালীর বিরে দিতে চান আপনি? কিন্তু সোনালী কেন রাজী হবে?

সোনালীকে আমি চোখেও দেখিন। ভালোবাসা তো দ্রের কথা। সে হয়তো আমার নামটাও শোর্নোন। ভালোবাসা তো আরো স্কুরে। এমন অবস্থায় বিয়ে করতে আমার সাধনায় বাধে। বিয়ে করলে পরে হরতো একপ্রকার ভালোবাসা জন্মায়, কিল্ড সে ভালোবাসা প্রেমিককে নয়, স্বামীকে। প্রেমিকাকে নয়, স্থাকৈ। সে না হয়ে আর কেউ যদি স্বামী হতো বা স্থাী হতো তবে তাকেও ঠিক তেমনি নির্ধারিত মাপে ভালোবাসা মেপে দেওয়া যেত। এক ছটাক এদিক ওদিক হতো না। অর্থাৎ এ হলো কর্তব্য হিসাবে ভালোবাসা। সংসারে এই রকম ভালোবাসাই বেশী চলতি। আমি সংসারী মানুষ নই, আমি এ রকম ভালোবাসা চাইনে। আমাকে স্বাধীন থাকতে হবে সত্যিকারের ভালোবাসার খাতিরে। বিপন্না কুমারীকে শত ভাবে সাহায্য করতে পারা যায়। কিন্তু জোর করে ভালোবাসা যায় না। জোর করে ভালোবাসা, জোর করে বিয়ে করা, জোর করে হরণ করা এসব একই মার্নাসকতার রকমফের। জোরকে যারা নারীর ইচ্ছার উপর জিতিয়ে দিতে চায় আমি তাদের কেউ নই। আমি বলি, জোর কিছুতেই জিতবে না। জোরকে কিছুতেই জিততে দেওয়া হবে না। সেই আমি কখনো জোর করে ভালোবাসতে পারি! জোর করে ভালোবাসা আদায় করতে পারি! না, বোন, তাতে বিপন্নাকে আরো বিপন্ন করা হয়। অন্য সমাধান খ্রন্ধতে হবে। তিন বছর আগে আমরা অন্য সমাধান খ্রন্ডেছিল্ম।

একদিন দ্পরে বেলা কানন এসে খবর দেয় তার প্রতিবেশী ভদ্রলোকের বিবাহযোগ্যা র্পসী কন্যা সোনালীকৈ পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেছে। আগের রাত্রে কীর্তন মহোৎসব ছিল পাড়ার বড় বাড়ীতে। যেমন প্রতি মাসে হয়ে থাকে। কীর্তন শ্বনতে সোনালীরা তিন বোন পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যায়। কীর্তনের শেষে সবাই ফিরল, ফিরল না শৃথ্ব একজন। হরির লাবুটের গোলমালে পাঁচশো লোকের

ভিড়ে সোনালী লটে হরে গোল। কেউ টের পেলো না। তার পর খোঁজ খোঁজ। সারা রাত খাঁজে হারানিধি পাওয়া বারনি। জনপ্রতি বড় বাড়ীর বাব্রোই সেই ভাবে নারী সংগ্রহ করে কোথার লাকিরে রাখেন।

কাননের মন্থে ব্তাশ্ত শন্নে আমাদের রক্ত গরম হরে উঠল। গেল্ম আমরা সোনালীর বাপের কাছে। লোকটি পাঠশালার পশ্ভিতমশাই। গরিব লোক। এমন ভীতু যে পর্নিশেও খবর দেবে না, আদালতেও বাবে না, পণ্টারেণ্ড ডাকবে না। পাছে জানাজানি হরে যায়। ও মেরের তো বিয়ে হবেই না, পাছে ওর ছোট বোনদেরও বিয়ে না হয়। আর সমাজটিও এমন যে পরিবারশন্ত্রশ সবাইকে পতিত করবে। আর রায় বাহাদ্রে যদি শন্নতে পান যে তাঁর প্রদের বির্দেখ অভিষোগ আনা হয়েছে তা হলে ভিটেমাটি উচ্ছয় করতে কতক্ষণ! মহাজনও তিনি, জমিদারও তিনি, উকীল মোক্তারের প্র্তিপোষকও তিনি, উচ্চতর কর্মচারীদের চাঁদার ভাল্ডারীও তিনি, নিশ্নতর কর্মচারীদের বকশিষের কাল্ডারীও তিনি। জলে বাস করে কুমীরের সভেগ বাদ!

প্রভাত একজন ঝান্ ডিটেকটিভের মতো শহরের অন্ধিসন্ধি ঘ্রের রাদ্রে এক গাড়োয়ানের কাছে সন্ধান পেলো ধে বাব্রদের বাগানবাড়ীতে উদ্ধ রাদ্রে একটি অলপবয়সী মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেয়েটি খ্রব কাঁদছিল। প্রভাত ওই লোকটিকে গাড়ীতে করে শহরের দ্বায়ইল দ্রে সেই বাগানবাড়ীতে যায় ও মালীদের সঙ্গে ভাব করে। ধর্মাধর্মজ্ঞান তাদেরও ছিল। অল্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পা টিপে টিপে মালীদের একজনের সঙ্গে প্রভাত বাগানবাড়ীর বারান্দায় ওঠে। কাঁচের জানালা দিয়ে সোনালীকে দেখতে পায়। সে কাঁদছে, কে'দে মিনতি করছে, "আমাকে ছেড়ে দিন, বড় দাদাবাব্র। আপনার পায়ে পড়ি, মেজ দাদাবাব্র।" তা নিয়ে হাসাহাসি পড়েছে ইয়ারবকশী মহলে। আরো কয়েকটি স্ফীলোক রয়েছে সেখানে। তারাও হাসছে।

থানায় গিয়ে প্রলিশের সণ্গে দেখা করল প্রভাত। দারোগা বলল, "বাপ কাকা যদি না আসে, নিকট আত্মীয় যদি না আসে, তা হলে কার

রছ ও শ্রীমতী

কথার আমরা কেস রুজ্ব করব? বাইরের লোকের কথার? ডোমার মতলব কী, হে ছোকরা? কবে থেকে এমন সাধ্পুর্য বনলে? এরা ভোগ করছে, তোমার ভাগ দিচ্ছে না, এই তো তোমার প্রাণের কথা!" তথন প্রভাত চলল উকীলের কাছে। ইনি একজন ত্যাগী ব্যক্তি। টাকার খাঁই নেই। বললেন, "যাদের সংশ্য ঝগড়া তারা লাখ টাকা থরচ করবে, বার-এর সেরা মাথাগ্রলা কিনে নেবে, সাক্ষী ভাঙিরে নেবে, ঘ্য দিরে লাল করে দেবে প্রালশকে। প্রথম তাস আমার হাতে, কিম্তু হাতের পাঁচ ওদের হাতে। সোনালীকে দিয়েই ওরা বলিয়ে নেবে যে, সে কাউকেই সনাক্ত করতে পারবে না, কেউ তার আগে থেকে চেনা নর।"

তখন প্রভাত চলল নেতাদের সকাশে। সপ্যে আমরাও ছিল্ম। তাঁরা কী বললেন শ্নবেন? "শারতানী সরকারের সপ্যে অহিংস অসহযোগ করার পর তার থানার বা আদালতে বাওয়া দেশদ্রেহ। পঞ্চারেৎ ডাকলে অপর পক্ষ আসবে না, সোনালীকে হাজির করবে না। দাঁড়াও, এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ হতে যাছে। ভারত উম্থার হলে তখন কি আর সোনালী উম্থার হবে না! গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে শ্রভদিনটিকে এগিয়ে দাও তোমরা। সোনালী অপেক্ষা করতে পারে, স্বরাজ পারে না।" আমরা হাল ছেড়ে দিতে যাছিল্ম, কিন্তু প্রভাত ছাড়বে না। সে চলল ম্যাজিস্টেট সাহেবের বাংলায়। সঙ্গে হৈম। ওর ইংরেজীর উচ্চারণ সাহেবদের মতো। সাহেব বললেন, "আমি আপনাদের উত্তির উপর নির্ভার করে সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্ম করছি। আপনারা প্রলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। অসহযোগ করেই তো দেশটা গেল। আশা করি আপনাদের বোনটিকে আপনারা আজকেই ফিরে পাবেন।"

সাহেবের হ্রকুম। পর্নালশের লোক তৎক্ষণাৎ রওনা হলো। কিল্ডু সোজা রাস্তার গোল না। বাব্দের প্রকারান্তরে জানিয়ে রাখল যে তাদের পোছতে যেট্রকু দেরি হবে সেইট্রকুই সোনালীকে সরাবার পক্ষে যথেষ্ট সময়। হলোও তাই। রিপোর্ট গোল যে বাগানবাড়ী যাকে বলা হয়েছে সোটা তপোবন। সেখানে একটিও স্থীলোক নেই। সানালী নামে কোনো

মেরেকে দেখিরে দিতে পারেনি প্রভাত বা হৈম। ওদিকে রায় বাহাদরের সাহেব বাহাদরের সংশ্যে মোলাকাং করে বললেন, "আমি সদাচারী হিন্দর। আমার ওটা ভজন কুটির। ওখানে স্মালাক আসবে কোন স্কৃতে? প্রকিশ ওখানে হানা দেওয়ায় আমার অকলন্দ নামে কলন্দ লেগেছে। ওটা কংগ্রেসের কারসাজি। প্রভাত হৈম কংগ্রেসের এজেন্ট। প্রভাত তো জেলও খেটেছে। আমি এ প্রাণ রাখব না, সার। একে তো আমি রায় বাহাদরের বলে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে। ওরা কোন দিন ওই সার্চ-ওয়ারেন্ট পরিকায় ছাপাবে। তখন কি আমি—" এই বলে রায় বাহাদরের ভেউ ভেউ করে কে'দে উঠলেন।

সার্চ ওয়ারেণ্ট রদ হলো। সাহেব প্রভাতকে হৈমকে দর্শন দিলেন না। তাঁর কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। কোনো দিকে কোনো প্রতিকার না পেয়ে, প্রতিকারের আশা না দেখে আমরা নিবৃত্ত হলুম। প্রভাত বলে, ওটা পরাক্লয়। আমি বলি, বিফলতা। সোনালীর জন্যে হাতে কলমে কিছু করতে পারা গেল না বলে তখন থেকেই আমার মনে একটা কটা বিখে রয়েছে। এটা সব সময় খচখচ করে না। কিল্টু যখন করে তখন বড় বাগা দেয়। তখন বার বার জপ করি, Force shall not win. কেবল সোনালীর বেলা নয়, যে কোনো মেয়ের বেলা। আমি হচ্ছি স্বভাবত knight। আমার বত হলো lady বিপদে পড়লে তাঁকে বিপদ্মক্ত করা। কিল্টু সাধ্যে যদি না কুলোয়, সাধনায় বদি বাধে তা হলে আমি করি কাঁ! ইতি।

আপনার রত্বভাই

চিঠিখানা ডাকে দেবার আগে প্রভাতকে একবার দেখতে দিল রছ। প্রভাত বলল, "লিখেছ ভালোই, কিন্তু 'আমি অক্ষম' বা 'আমি পরাজিত' এই কথা ক'টি এড়াতে গিয়ে এ যা করেছ এ তো একপ্রকার ইণ্গিত যে সোনালী যদি তোমাকে ভালোবাসে তা হলে তাকে তুমি বিয়ে করতে রাজী। অবশ্য আরো একটা যদি আছে। যদি তুমিও তাকে ভালোবাস। কিন্তু কার্যকালে দেখবে একটি

0

রছ ও শ্রীমতী

প্রেমে-পড়া অবলাকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ্ব নর। তার প্রেম বদি সন্ত্য হর তোমাকে চুন্বকের মতো টানবে। তুমি ভালো না বাসলেও সে তোমাকে ভালো-বাসাবে। ভালোবাসিরে ছাড়বে। তখন ব্রুবে বিয়ে না করাটাই কাপ্রুর্বতা। তখনি শ্রুর্ হবে তোমার অন্শোচনা। বিয়ে করলেও পশতাবে। না করলেও পশতাবে। আর যদি বিয়ে করে বিয়ে ভেঙে দাও সেটা হবে কাপ্রুর্বতার চ্ড়োল্ড। অমান্রতা।"

রঙ্গ ভেবে বলল, "তা নয়। প্রশ্নটা এই রকম। একটি অনিচ্ছন্ক নারীর উপর জার খাটানো হয়েছে। যারা খাটিয়েছে তারাই জিতবে? সে হারবে? এ কখনো হতে পারে? হওয়া উচিত কখনো? আমরা যারা একালের নাইট তারা আছি কী করতে? না। হারতে দেওয়া হবে না সোনালীকে। তার মনোবল বাতে অট্ট থাকে সে জন্যে বিয়ের পথ খোলা আছে বলতে হবে। খোলা রাখতে হবে। কোনো দিন কোনো অবন্ধায় তাকে আমি বিয়ে করব না, কেন একথা বলতে যাব? যা অভাবিত তাও সময় সময় ঘটে। আমি শ্বেম্ লক্ষ রাখব যে আমার প্রমের মান উচ্চ আছে। সোনালীর খাতিরে না, মালাদির খাতিরে না, দ্বনিয়ায় কারো খাতিরে আমি আমার প্রমের মান খাটো করব না। তেমনি আমার প্রাধীনতার মান। স্বাধীন ও সপ্রেম থেকে যদি নাইট হতে পারি তবে অন্বশোচনার কী আছে!"

প্রভাত বলল, "ব্রেছি। কিন্তু জাের কি ওই একটি মেয়ের উপরেই খাটানাে হয়েছে? জাের কি রান্র উপরে খাটানাে হয়নি? অং বং দ্টো সংস্কৃত মল্য আওড়ালেই কি সেটা ধর্মাচরণে পরিণত হয়? কিন্তু তার তুমি কী করছ, বল? কী করতে পারো? নাইট যদি হয়ে থাকি আমরা তাে কই আমাদের ঢাল তলােয়ার? ওহে নিধিরাম, তিন বছর আগে সাত ঘাটের জল খেয়েও কি তােমার শিক্ষা হয়নি? কবে হবে? আমার কথা যদি বল, আমি আর ওই ইস্তে লড়তে যাচ্ছিনে। সোনালীর যা হয় হবে। য়ান্র যা হয় হবে। আমি কাউকে আশাও দেব না, কারাে আশাভশ্যও ঘটাব না। তােমাকেও বলে রাখছি, এখন থেকে তােমার যুখে তােমার। তুমি লড়বে, আমি পড়ব।" আক্ষরিক অর্থে না হলেও প্রভাত সশক্ষে দরজা বন্ধ করে দিল। বাইরে

বছ ও শীমতী

দাঁড়িরে দ্বটি অভাগিনী নারী। একটি সমাজবির্শ্ব ভাবে ধর্মিতা। একটি সমাজসম্মত ভাবে।

"আছো।" বলে রক্ন প্রভাতের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চিঠিখানা দিরে এলো ডাকে। কাটকুট করল না। স্বীকার করল না বে সে পরাজিত বা অক্ষম। তার দরজা খোলা রইল সব অপমানিতা নারীর জন্যে। কেউ বা সোনালীর মতো। কেউ বা রান্র মতো। সে নাইট। তা বলে সে তার প্রেমের মান বা তার স্বাধীনতার মান খর্ব করবে না।

শ্রীমতীর চিঠি পাওয়ার পর খেকে শ্রীমতীকে চিঠি লিখে ভাকে দেওয়া পর্যশত এই ক'দিন রত্ন অন্য দিকে দৃণ্টি দেবার অবসর পারনি। উত্তেজনা প্রশমিত হলে ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল যে আকস্মিক ব্যাঘাতে কী যেন একটা স্কুর হারিয়ে গেছে। কথা হারিয়ে গেলে কথা মনে পড়ে। স্কুর হারিয়ে গেলে স্কুর ফিরে পাওয়া কঠিন। তাকে বিমৃত্যু করল এ ক্ষতি।

প্রভাত ষেমন তার পর্রাতন বন্ধ্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি তেমনি নতুন বন্ধ্দের মধ্যে। তেউ খেলানো বড় বড় চুল, কপালে রন্ধ চন্দনের ফোঁটা, গোলগাল মান্ষটি দিনরাত কাব্যচর্চার বিভার। তার সঞ্চে প্রারই দেখা বেত অলপবরসী আরেক জনকে। তার নাম অঞ্জন। স্বন্দবিলাসী কবিপ্রকৃতির। এরা আর এদের মন্ডলী রন্ধকেই মধ্যমণি রূপে বরণ করেছিল। যাকে বলে বন্ধ্ব দার্শনিক ও দিশারী। এদের আলাপ আলোচনা পার্থিব লাভালাভের নর, সমাজ ভাঙাগড়ার নর, দর্বলকে রক্ষা করার নয়। এরা অমৃত আন্বাদন করে পরস্পরকে ভাগ দের। কে কী নতুন বই পড়েছে, নতুন ভাব আবিষ্কার করেছে, নতুন রস আহরণ করেছে, নতুন প্রেরণা পেরেছে জানার ও জানে। রন্ধ এদের নিরে গণগার ধারে আভা দের। বৃষ্টি পড়লে বিদ্যাপতির ঘরে। প্রভাত বোগ দের না। উপহাস করে।

্ এটা জীবন থেকে পলায়ন নয়। এটাও জীবন। একে উপেক্ষা করে কেবল আঘাত সংঘাত নিয়ে মত্ত থাকলে সেই মত্ততার ফাঁক দিয়ে এমন কিছু হারিয়ে বায় বার জন্যে পরে আফসোস করতে হয়। জগতে মন্দ থাকবে, তার সংশো দ্বন্দ্ব থাকবে, এই বদি হয় শেষ কথা তা হলে সৌন্দর্য হবে প্রথম ক্যাজ্বয়ালটি।

সভ্যও কি ক্যান্ত্র্রালটি হবে না? স্বন্দ্বসর্বস্ব মন সত্য আর সোন্দর্ব উচ্চরকেই অবহেলা করবে, উপবাসে রাখবে।

শ্রীমতীর উপর রক্ন মনে মনে বিরক্ত হয়ে রয়েছিল। বেশ তো ছিল সে তার নতুন বন্ধ্বদের নিয়ে। কেন তাকে প্ররোনো মন্ডলীর কার্যকলাপ আবার উল্জীবিত করতে বলা! সোনালীর প্রসংগ ক্ষরণ করিয়ে দেওয়া কেন! 'অক্ষম' কি না প্রমাণ করতে চ্যালেঞ্জ করা কেন!

হারানো স্বর খাজে পাওয়া যার না। মন বিরস হয়ে যার। অপরিচিতার চিঠি পেরে দোলা যেটুকু লেগেছিল সেটুকু থেমে বার।

"রঙ্গ, তোমার কী হয়েছে? অমন মন-মরা কেন?" বিদ্যাপতি স্থায়। "কী যেন একটা স্র ছিল, হারিয়ে গেছে, মিলছে না।"

"কী স্র?"

"গানের স্বর নয়। কবিতার স্বর নয়। জীবনের স্বর।" রঙ্গ বোঝাতে। পারে না।

"কী করে হারাল?"

"একখানা চিঠি পেরে ও তার জবাব দিতে গিরে।"

"ওঃ! সেই খারাপ খবর! শানেছি ব্রিজনন্দনের কাছে।" বিদ্যাপতি শোক ভেবে সমবেদনা জানাল। রত্ন তার প্রান্তিমোচন করল না। বিদ্যাপতির সংখ্য তার সম্বন্ধ প্রভাতের মতো নয়।

স্বর কেটে যাওয়ার অস্বস্থিত কাউকে বোঝানো যায় না। রক্স একাই ভোগে। সোনালীর জন্য সতিয় কিছ্ করবার নেই, তব্ মনে হয় কী যেন একটা করবার ছিল। শ্রীমতী হয়তো তাকে কাপ্বর্য ভাববে, অচেনা অজানা বোনটির চোখে সে নেমে যাবে। তা বলে কি সে মার্গচ্যুত হবে? চলতে পারবে না তার নিজের মার্গে? তার জীবনের উপর তার নিজের ইচ্ছা খাটবে না? খাটবে সোনালীর ইচ্ছা, শ্রীমতীর ইচ্ছা?

সামান্য একখানা চিঠি। অমন তো কত আসে। কিন্তু সেই চিঠিখানার আসার আগে রক্নর জীবন যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল আসার পরে সে ধারায় নয়। ধারাবাহিকতার ছেদ পড়েছে। রক্ন মানতে চায় না যে সামান্য একখানা

চিঠির অত প্রভাব। কারো প্রভাব স্বীকার করা তার স্বভাব নর। কোনো জিনিসের প্রভাব।

সে আশা করতে থাকল যে শ্রীমতী আর চিঠি লিখবে না। কেন লিখবে? কী দরকার? তবে তার আশব্দা ছিল যে সোনালীর জন্যে দরজা খোলা আছে জানলে ও মেরে হয়তো তাকে রেহাই দেবে না। রেহাই পাবে প্রভাত। প্রভাতের দরজা বন্ধ।

সিন্দ্রদেশ থেকে একজন বিখ্যাত সুখী এসেছিলেন। বোধ হর স্কী ভাবাপন্ন। বিদ্যাপতি, অঞ্জন, রত্ন এ'র রচনা অনেক দিন থেকে পড়ে আসছিল। অন্তরে সৌন্দর্য না থাকলে যা হয় তা নিছক বাক্যযোজনা। কিন্তু এ'র প্রত্যেকটি বাক্য স্কুলর। মানুষ্টি স্কুলর কি না দেখতে তিনজনেরই কোত্হল ছিল। চলল দেখতে।

তাদেরই মতো বিশ প'চিশজন শ্রোতা ও দর্শনাথী তাঁর সামনে বসেছিল মাটিতে। তিনিও মাটিতে। সকলের অন্বরাধে তিনি মোনভঙ্গ করলেন। নীর ও ক্ষীর একসঙ্গে মিশে রয়েছে। হংস জানে কোনটা ক্ষীর। শ্বধ্ব সেইট্রকু বেছে নেয়। এই যে নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জানা এরই নাম জ্ঞান। এটি যাঁর আছে তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞানীদের অপর নাম হংস। নীর হলো তথ্য। ক্ষীর হলো সত্য। এক রাশ তথ্য নিয়ে আমরা কী করব, যদি অন্তর্নিহিত সত্যট্রকু চিনতে না পারি, বেছে নিতে না পারি? ডিগ্রী পার, ডিগ্রী ভাঙিয়ে চাকরি পাব, চাকরি ভাঙিয়ে নিরাপদ জীবনযাতা পাব এই যাদের ভাবনা সিন্ধিও তাদের তাদৃশ। কিন্তু সত্য অত সহজে ধরা দের না। জীবনের অন্তিম মৃহত্বে মনে হয় জীবনটাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। কী নিয়ে প্রয়াণ করবে!

ফেরবার পথে রক্ষ বলল, "কই, দেখতে তো তেমন স্কের নন!" বিদ্যাপতি বলল, "রীতিমতো কদাকার।"

অঞ্চন বলল, "তোমরা নীর থেকে ক্ষীর বেছে নিতে জান না। তোমরা হংস নও। নইলে লক্ষ করতে তাঁর চোখ দুটি মাঝে মাঝে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। তখন চোখের ঝরোকা দিয়ে সোক্ষির্য আভাসিত হয়।"

এ কথা শন্নে বিদ্যাপতি বলল, "তা বটে।" কিন্তু রন্ন সহসা অন্যমনক্ষ্ হয়ে পড়ল। তার স্মরণ হলো শ্রীমতীর চোখে প্রভাত কী লক্ষ করেছিল। প্রভাতের সাক্ষ্য যদি সত্য হয় তবে প্রীমতীর চোখের ঝরোকা দিরে কিসের আভাস পাওয়া যায়?

"কি হে, রত্মহংস! কী ভাবছ?" জানতে চাইল বিদ্যাপতি। "কিছনু না।"

"ব্রুতে পারছি তুমি নিরাশ হয়েছ।" অঞ্চন বলল, "তা কী করবে, বল! 'কাব্য পড়ে বেমন ভাব কবি তেমন নয় গো।' রবীন্দ্রনাথ তো তোমার জন্যেই লিখেছেন।"

"তা নয়। আমি ভাবছিল্ম অন্য কথা।" কিশ্চু কী কথা সে খ্লে বলল না। তার বদলে বলল, "জীবনের অশ্তিম মৃহ্তে আমারও কি মনে হবে যে জীবনটাই ধরাছোঁরার বাইরে থেকে গেছে?"

"তাই তো। তুমি তা হলে কী নিয়ে প্রয়াণ করবে!" পরিহাস করল অঞ্চন। বয়সে নাবালক, বালকের মতো চেহারা, কিল্তু বাক্যবাণে দর্ভায়।

বিদ্যাপতিও হাস্য পরিহাসে যোগ দিল। কিন্তু রত্ন সত্যি সাত্যি ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে নীর থেকে ক্ষীর বৈছে নিতে না জানলে জীবনটাই জনাস্বাদিত থেকে যাবে। অবশ্য এটা তার কাছে নতুন কথা নয়। জীবনের পক্ষে কী essential, কী নয়, এ নিয়ে তার নিভ্ত চিন্তা বহুকালের। কিন্তু তার চিন্তাপন্থতি জ্ঞানীর মতো নয়। শিল্পীর মতো। রসিক্রের মতো।

স্বাধীনতা এসেনসিয়াল। এ না হলে বাঁচতে ইচ্ছা করে না। বাঁচলে এর জন্যেই বাঁচা। কিস্তু এই সব নয়। প্রেম চাই। ভালোবাসব। ভালোবাসা পাব। সব মান্ধকে ভালোবাসব। সব মান্ধের ভালোবাসা পাব। সব প্রাণীকে ভালোবাসব। সব প্রাণীর ভালোবাসা পাব। সব সংহত হবে একটিতে। সে আমার প্রিয় নারী। সবাই থাকবে তার মধ্যে। তাকে ভালোবাসালেই সবাইকে ভালোবাসা বায়। তার ভালোবাসা পেলেই সকলের ভালোবাসা মেলে।. স্বয়ং ভ্যবান প্রিয়ার্পে আসেন। প্রিয়ারে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়া।

তার পর সৃষ্টি করাও এসেনসিয়াল। এবং প্রয়োজন হলে বিনাশ।

রত্ন সেদিন হস্টেলে ফিরে গিয়ে দেখল তার নামে চিঠি এসেছে বিকালের ডাকে। আবার সেই মেরেলি হাতের। এবার তার অচেনা নয়। সে তেমন প্রসম্ম হলো না। ঠেলে সরিয়ে রাখল চিঠিখানা। চা তৈরি করতে স্টোভ ধরাল।

কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি তাকে সমস্তক্ষণ টানছিল। টানছিল স্কান্থ দিয়ে, স্বর্প দিয়ে। টানছিল চুম্বকের মতো। না খ্লে তার গতি ছিল না ওই খাম। পড়ল—

প্রিয় রত্নভাই,

আপনার কর্ণা অপার। আমার চিঠির উত্তরে বা লিখেছেন তা আমার পক্ষে পরম গোরবের। কিন্তু আমি তো আমার জন্যে কিছ্ চাইনি, চেরেছি সোনালীর জন্যে। অভাগীকে আপনি কী দিলেন? একটি ভালো মেরে, ভালো ঘরের মেয়ে বিনা দোষে পাঁকে তলিয়ে বাছে। দিন দিন গভীর খেকে গভীরতরে। আপনি তো উপদেশ দিয়ে হাত ধ্রে ফেললেন। পাঁকে নামবে কে? এ কি আমার কাজ? আমি বদি প্রেষ্ হয়ে জন্মে থাকতুম তা হলে কি আর কাউকে সাধতে যেতুম? কত লোককে সেথেছি, কেউ যদি পাঁকে নামতে রাজী হতা!

ভীষণ রাগ হলো আপনার উপর। প্রভাতদার উপর। পরে ভেবে দেখলুম আপনাদের অপরাধ কী? আপনারা তব্ চেণ্টা করেছেন। আপনাদের উপর যদি ভীষণ রাগ করি তবে যারা নিশ্চেণ্ট তাদের উপর কী করব? ভীষণতর রাগ? আর যারা শয়তান? তাদের উপরে? মহিষমর্দনের সময় চণ্ডী যা করেছিলেন? জিঘাংসা? কিন্তু তাদের গায়ে আঁচড়টি দেয় কার সাধ্যি! একখানা চিঠি লিখেও বে ক্রোধ জানাতে পারি সে সাহস আমার নেই।

আমি অসহায়। সম্পূর্ণ অসহায়। আমাকেই কে বাঁচায় তার ঠিক নেই। আমি কাকে বাঁচাব! কিন্তু সে কাহিনী আরেক দিন। তার আগে

আপনাকে বলব রুপালীর গলপ। সেও আজ নয়! আজ আমার মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। কিন্তু শনুনে আপনি হয়তো আবার পাশ কাটিয়ে বাবেন। আপনার দাশনিকতার আমি আবার অভিভূত হব। তার পর দেখব সমস্যা বেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। জলে নামবে না কেউ। নিমন্জমানকে ক্লে বসে উপদেশ দেবে। তা সত্ত্বেও শোনাব একদিন আপনাকে। আর কিছু না হোক চমংকার একখানা চিঠি পাব আপনার। আমার প্রভাণভারে সন্ধিত হবে একটি রত্ন।

আমার ক্রমে প্রত্যর হচ্ছে প্রেমই এর একমার সমাধান। একজন প্রবল পর্ব্বের প্রবল প্রেম ভিন্ন সোনালীকে পাঁক থেকে তোলার আর কোনো কার্যকর উপায় নেই। সাধারণ প্র্বুষের সাধারণ কর্বা দিয়ে এসব সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু কোথায় সেই প্রবল প্র্বুষ! কোথায়ই বা তার প্রবল প্রেম! এই নিরস্তপাদপ দেশে যাদের দেখি তারা কাপ্রুষ্ব কিংবা শিখাভী। আর তাদের প্রেম? ঘেনা ধরে গেছে তার উপর। প্রেম না শেম!

ললিতের মনুখে যা শনুনেছিলন্ম তার কতক সতা। আপনি অনন্য। আপনার সংশা চেনা হলো। আপনাকে ভালো লাগল এইটনুকুই যা লাভ। কিন্তু মাছ আমাকে ছাড়তেই হলো। পরশনু আপনার উত্তর পেরে আমার মংসাবাসনা লোপ পেরেছে। আর খাইনি। সোনালীর জন্যে যদি কোনো দিন কিছনু করে উঠতে পারি তা হলে আবার খাব। আমার শ্রম্ধা জানবেন। ইতি।

আপনার শ্রীমতীবোন

শ্রীমতীর শ্বিতীয় চিঠি পেয়ে রক্ন আগের মতো বিম্ট হলো না, কিল্ছু বৈদনা বোধ করল তেমনি বা তার চেয়েও বেশী। এই মেয়েটি কে তা সে জানে না। কার কন্যা কার স্থাী কাদের আত্মীয়া প্রভাত তাকে বলেনি। যেই হোক, আর-একটি মেয়ের জন্যে কেউ কিছ্ম করছে না দেখে মনের দ্বঃখে অশন ত্যাগ করেছে। আংশিক ভাবে অব্শ্য।

শুখ্ বৈদনা নর, অপমানও বোধ করল রছ। সে প্রবল পুরুষ নর, সাধারণ পুরুষ। এই নিরস্তপাদপ দেশে সেও একটি কাপুরুষ কিংবা দিখাতী। তবে সে অননা। এইট্কুই বা লাভ। কাটা খায়ে এইট্কুই মলম। অননা হয়ে কোন সূখ, বদি কাপুরুষ বা দিখাতী বা সাধারণ পুরুষ হলো! তার ভালোবাসার সম্ভাবনা হলো সাধারণ করুণা! প্রেম না শেম!

স্বীকার না করলে কী হবে, তার মনের অগোচরে সেও দরজা বস্থ করে দিয়েছিল। পরাজিত বা অক্ষম বলে নয়, হৃদয়হীন বলে তো নয়ই, জড়িয়ে পড়তে চায় না বলেই। আর মাস ছয়েক পরে তার বি-এ ফাইনাল। পরীকার পরের দিনই সে বেরিয়ে পড়তে চায় বিশাল জগতে, যে জগৎ বংগোপসাগর বা আরব সাগরের স্বারা পরিমিত নয়। নারী যদি বোঝা না হতো একসংগ চলা আনন্দের হতো। সোনালীকে কাঁধে করে বয়ে বেড়ানোর নাম কি পথে বেরিয়ে পড়া!

তার পথে বেরিয়ে পড়া নিছক পথের প্রেমে নয়। একটা স্রের অন্বেরণে। যেমন রাধা বাহির হরেছিলেন বাঁশির সরুর শানে। রত্মর জীবনে এ সরুর এখনো স্পন্ট হরনি। এ যে কিসের সরুর, কোনখান থেকে আসছে, তাও অস্পন্ট। তব্ কিছন্দিন থেকে সে ব্রুতে পারছে এ সরুর তাকে ঘরে থাকতে দেবে না। তাকে দেশের বা সমাজের কাজ করতে দেবে না। তাকে ডাক দেবে বাইরে ও অকাজে। এমন মান্যকে যদি কেউ প্রবল প্রেষ্ না বলে সাধারণ প্রুষ্ বলে তবে চুপ করে সয়ে যাওয়াই ভালো।

সেদিন খেতে বসে সে বাবাজীকে বলল তার পাতে মাছ না দিতে। এখন থেকে সে মছলি খাবে না। বাবাজী তো মহা খ্রিশ। রতনবাব্ হিন্দ্রুখানী বন জায়েণো।

কথাটা প্রভাতের কানে গেল। সে বিকেলের দিকে রঙ্গর ঘরে গিয়ে জানতে চাইল ব্যাপার কী! হঠাং মাছে অর্চি কেন! রঙ্গ তখন শ্রীমতীর চিঠিখানা বন্ধরে হাতে দিল। উচ্চবাচ্য করল না।

হা হা হো হো। প্রভাত অটুহাসি হাসল। "বেড়াল বলছে, মাছ ছেড়ে দিয়েছি। কে বিশ্বাস করবে এ কথা! বরং বেড়াল ছাড়লেও ছাড়তে পারে

বছ ও শ্রীমতী

মাছ, কিল্পু হিন্দরের থরের সধবা মাছ ছাড়বে আর আমি এ কথা বিশ্বাস করব এত বড় আহাত্মক আমি নই। সেদিন এক ব্যুড়ী এক পরসার শাকের দাম দ্ব'পরসা শ্বনে হাটের মাঝখানে বলেছিল, ক্যা বংগালী সমঝা! তেমনি আমিও বলতে চাই শ্রীমতীকে, আমাগো কি বাঙ্গাল সমবেসেন!"

রত্ন হাসছে না, রাগছে, দেখে প্রভাতের আরেল হলো যে সে প্রকারান্তরে উক্ত মহিলাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। স্বর পরিবর্তন করে বলল, "আহা! আমি কি জানিনে যে ও সত্যানিষ্ঠ! ওর মতো ত্যাগ ক'জন করেছে! আমার বক্তব্য শুধ্ এই যে, হিন্দরে ঘরের বিধবা যা পারে সধবা তা পারে না। মাছ খাওয়া হলো এয়োতির লক্ষণ। মংস্যবর্জন কি মুখের কথা! আমার মতে অসম্ভব।"

"কিসে অতটা নিশ্চিত হলে?" রত্ন বলল কঠোর স্বরে। "হিন্দর্র ঘরের সধবা কি সব অলঙকার খ্লে দেয়? সোনাবাঁধানো শাঁখাভিন্ন আর কিছ্তু পরে না!"

"ছিল। নোয়া ছিল।" প্রভাত স্মরণ করে বলল, "তবে তাই যথেষ্ট নয়।
বেগমপ্রের ছোট তরফের আয় যদিও শ্নোর কোঠায় ঠেকেছে তব্ মরা হাতী
লাখ টাকা। বাড়ীতে ভাঙন ধরেছে। শরিকরা প্রায় সবাই চলে গেছে সদরে
বা কলকাতায়। পাঁচিল ধনুসে পড়েছে, কাঠের ভিনিসিয়ান খসে পড়েছে,
ইটের পাঁজর গোণা যায়, অশথ গাছ উঠেছে পাঁজর ভেদ করে। তব্ ছোট
তরফ ওখান থেকে নড়বেন না। যথের ধন আগলাবেন। শোনা য়ায় সিন্দ্কভরা মোহর। সব বাদশাহী আমলের। ওরা খানদানী রাজপ্ত বংশ।
বাংলাদেশে এসেছিল শাহ স্কার সংগে। তার পর থেকে বেমাল্ম বাঙালী
বনে গেছে। মাছে ভাতে বাঙালী।"

হস্টেলে উঠে আসার আগে রত্ন ও প্রভাত যে মেসে থাকত সেখানে রমেনদা বলে একজন আইনের ছাত্রও থাকতেন। মিদ্টভাষী স্নেহশীল প্রকৃতির যুবক। কনিষ্ঠদের সমীহ করেন সমবয়সীদের মতোই। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আইন পড়ছেন, কিন্তু উকীল হিসাবে সফল হবেন বলে মনে হয় না। দয়ার শরীর। কোনো রকম প্রতিযোগিতার ভাব নেই স্বভাবে। স্বাই তাঁকে ঠেলে এগিয়ে

যার। তিনি পড়ে থাকেন পিছনে। খেতে বসেন সকলের শেষে। যে দিন যা বে'চে থাকে।

প্রভাত বলল, "চল, রমেনদার পরামর্শ নেওরা যাক। সোনালীর জনো কী আমরা করতে পারি যার ফলে শ্রীমতীর মুখে মাছ রুচবে। রত্নর মুখেও।"

কতকাল পরে দেখা। রমেনদার চোথ সজল হরে উঠল। তিনি তাদের দ্ব'জনকে ধরে নিরে গিয়ে আপনার দ্ব'পাশে বসালেন। কাঁধে হাত রাখলেন। কুশলপ্রশ্নের পর পড়াশ্বনার খোঁজখবর। তার মাঝখানে প্রভাত গলা খাটো করে বলল, "রমেনদা, আপনার সংগে একটা গোপনীয় পরামশ ছিল।"

সোনালীর উপাখ্যান গোড়া থেকে শন্নে রমেনদা বললেন, "না। সোজা রাস্তা নেই। তবে রাস্তা যে একেবারেই নেই তা নয়। সোনালী যদি বোষ্টমী হয়ে কোনো বোষ্টমের সঞ্চো কণ্ঠীবদল করত তা হলে আর কোথাও না হোক ব্নদাবনে ওদের ঠাঁই হতো। হিন্দ্র সমাজের সদর দরজায় কড়া পাহারা, কিন্তু খিড়াকি দিয়ে হাতী ঘোড়া পার হয়। কাশী ব্নদাবন আময়া স্থিট করেছি কেন? সোনালীদের জন্যেই। সেখানে ওরা হাফ গেরস্ত। ওদের ছেলে-মেয়েরা এক প্রেষ্ব বাদে ফ্ল গেরস্ত। হিন্দ্র সমাজের সমস্তটাই মন্শাসিত নয় হে। কতক অংশ মন্যুগাসিত। নইলে ও সমাজ অত দিন টিকত না।"

প্রভাত হাঁফ ছেড়ে বলল, "বাঁচা গেল। এখন প্রথম কান্ধ একটি বোষ্টম জোটানো। দ্বিতীয় কান্ধ কণ্ঠীবদল ঘটানো। রমেনদা, আপনার সন্ধানে কোনো বৈরাগী আছে?"

রত্ন অনুযোগ করল, "কিন্তু বার উপর অন্যায় করা হয়েছে সে কেন চোরের মতো খিড়কি দিরে চ্কুবে? সমাজকেই সদর দরজা খ্লে দিতে হবে। ক্ষতি-প্রেণ করতে হবে। কণ্ঠীবদল নয়, রীতিমতো বিবাহ। ঐ হাফ গেরুত কথাটা ভালো নয়।"

"কেন? কণ্ঠীবদলটা এমন কী মন্দ? তুমিই তো বলে থাক বিয়ে সন্ভব না হলে একসংগ্যে থাকাও ভালো। সেও তো হাফ গেরস্তালি।" প্রভাত রক্ধকে কাহিল করল।

বছ ও শ্রীমতী

বিয়ে বসবে না। সম্পদের স্বাদ পেয়েছে। সম্পরী বখন, তখন ও বিনা ম্ল্যে বিকোবে না। পতিতা যতদিন হয়নি ততদিন ভয়ভর ছিল। একবার পড়লে পরে তখন ভয়ডর ভেঙে যায়। সোনালী কি আর সেই সোনালী আছে!"

খারে ফিরে আবার সেই একই প্রাচীরে পেশিছনো গেল। কিছাই করবার নেই। হস্টেলে ফিরে প্রভাত বলল কর্ণ স্বরে, "রতন, শ্রীমতীবোনকে লিখো আজকের কথাবার্তার বিবরণ। ও কেন মিছিমিছি কন্ট পাচ্ছে, কন্ট দিছে? তুমি মাছ ছাড়লে কি আমি মাছ খাব ভেবেছ? খাদ্য ত্যাগ করা প্রকৃতির অনুমোদিত নয়। এর সাজা আছে।"

রত্ন আবেগভরে বলল, "আমি পরাজয় মানব না। শ্রীমতীবোনকেও পরাজর মানতে দেব না। ত্যাগ বলতে এই বোঝায় যে আমরা অপরাজিত। কিন্তু তুমি কেন ত্যাগ করবে? তুমি তো পরাজয় মেনে নিয়েছ।"

শ্রীমতীকে চিঠি লিখতে খ্র যে উৎসাহ ছিল তা নর। একে তো নতুন কোনো সমাধানের ইশারা দিতে পারছে না। তার উপর শ্রীমতীকে ভিতরে ভিতরে তার ভয়। ভয় দুই কারণে। শ্রীম্তীর চোখে প্যাশন। শ্রীমতী সন্দাসবাদীদের হস্তিনী।

অপর পক্ষে হস্টেলের ঐ নারীবজিত জীবনে দ্র থেকে যেট্কু রমণীয় পরশ আপনা হতে মিলে যায় তার জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হয়। তাকে অবহেলা করতে নেই। মালাদি তো চিঠি লেখেন না। আর কেই বা লিখছে পারিবারিক মণ্ডলের বাইরে! তা ছাড়া রত্নর কপালে এ রকম কত বার ঘটেছে যে, সে অলপ সময়ের মধ্যে মেয়েদের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে। তাকে বিশ্বাস করে তারা এমন সব কথা বলেছে যা মেয়েরা মেয়েদেরই বলে, প্রুষদের বলে না। এই যে শ্রীমতী রুপালীর কাহিনী বলতে চেয়েছে এটা হয়তো সে আর কোনো প্রুষকে বলেন। এসব মেয়েলি গলপ শ্রুতে তার নিজেরও ভালো লাগে। মেয়েদের প্রতি তার যেন একটা নাড়ীর টান আছে। সেও কতকটা মেয়েলি। তার নাম রত্ন, তা সত্তেও অনেকে তাকে রত্না বলে ভাকে।

লিখবে কি লিখবে না করতে করতে দিন করেক কাটল। যুক্তি দ্ব'দিকেই সমান। লিখলে স্বরু কেটে যায়। না লিখলেও তাই। শেষে স্থির করে

ফেলল লিখবে। সোনালীকে একটা স্যোগ দিয়ে দেখা যাক সে বোষ্টম পেলে বোষ্টমী হল্পে মালাচন্দন করতে রাজী কি না। কে জানে হয়তো সে হাতে স্বর্গ পাবে। তার পর বৃন্দাবন, নতুন জীবন। দ্রে থেকে সাহাষ্য করবে শ্রীমতী, শ্রীমতীর মণ্ডলী, রক্স, রক্সর মণ্ডলী। যার যেট্কু সাধ্য।

রক্ন শ্রীমতীকে এবার যে চিঠি লিখল তার গোড়ার দিকে ছিল রমেনদার পরামর্শ। শেষের দিকে তার নিজের মতবাদ।

শ্বাধীন প্রেব্রের সপ্সে শ্বাধীনা নারীর স্বাধীন ভাবে হয়েছে বে প্রেম তারই উপসংহার বিবাহ, বিদ সম্ভব হর। উপসংহারকে আমি উপদ্রুমণিকা করার পক্ষে নই। তাতে প্রেম এবং স্বাধীনতা উভরেরই অমর্যাদা হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমি আমার মতবাদ জাহির করব না, রমেনদার খাতিরে সরে দাঁড়াব। সোনালীর যথেন্ট বয়স হয়েছে। সে বিদ রমেনদার পরামর্শ ব্রিষ্কুর মনে করে তা হলে আমিও স্থী হব। কেননা এই সমস্যার সমাধান না হলে আপনি হিন্দুর ঘরের সধবা হয়েও মংস্যগ্রহণ করবেন না এটা আমার পক্ষেও স্কুথের কথা নয়। নয় বলেই আমিও মংস্য-অনশন আরম্ভ করেছি।

দেখতে দেখতে শ্রীমতীর চিঠি এলো ফিরতি ডাকে। তেমনি নীল রঙের খাম। তেমনি স্বাসিত। তেমনি মেয়েলি হাতের ঠিকানা। চিনতে দেরি হয় না। খুলতেও না।

আমার প্রিয় রত্নভাই,

আপনার প্রতির তুলনা কোথার! আর কে আমার ব্যথার ব্যথিত হরে আহার ত্যাগ করেছে! কিন্তু আপনাকে আমার মাথার দিব্যি, ওসব করতে যাবেন না। এ কী ছেলেমান্বী বল্ন দেখি! আমি যা করেছি তা ঝোঁকের মাথার করিনি, অনেক দিন থেকে ভাবা ছিল যে এই কাজটি আমি করব, যদি ওই কাজটি আর কেউ না করে। শুখু সোনালীর স্বাহা হলে চলবে না। র্পালী বলে আর-একটি মেয়ে আছে তারও স্বাহা হওরা চাই। কিন্তু আজ ও কথা নর। আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ডাক ধরতে হবে,

বছ ও শ্রীমতী

ষাতে আপনি তাড়াতাড়ি এ চিঠি পান ও পশ্রপাঠ মংস্য-অনশন ভশ্ব করেন। এখানে টেলিয়াফ নেই, নয়তো জর্বি তার পাঠাতুম। উত্তর পাব তো? সম্বর।

রমেনদার পরামর্শ মন্দের ভালো। আমরা ভেবে দেখব। কিন্তু আপনার নিজের মতবাদ নিছক মন্দ। জ্যোতিদার মতবাদও অনেকটা ওই রকম। ওসব পাশ্চাত্য প্রতিধর্বনি এ দেশের উপযোগী নর। আমাদের ঐতিহ্য জন্যর্প। ভারত পরাধীন না হলে তার সমাজের এ দশা হতো না। এ দশা চির দিন থাকবে না। পরিবর্তন ঘটবেই। কিন্তু তার জন্যে চাই দেশের স্বাধীনতা। দেশকে স্বাধীন করবে কে? গান্ধী ফেল। সি আর দাশ কাউন্সিলে গিয়ে শেষ। বৃন্ধদের ন্বারা কী আর হবে! তর্গরাই ভরসা। রক্বভাই, আপনি কি ললিতের মতো যোগ দিতে পারেন না আমার মন্ডলীতে? প্রভাতদাও? শানেছি তিনি বেগমপ্রের এসেছিলেন, আমাদের দালানেই বক্তৃতা করে গেছেন। আমার কিন্তু ক্ষরণ হচ্ছে না কোন জন।

আজ তা হলে আসি। মনে থাকবে তো, যা বলেছি? ইভি। আপনারই শ্রীমতীবোন

এমন বে হবে তা তো প্রভাতের কাছে আগেই শোনা ছিল। আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না, তব্ আশ্চর্য হলো রত্ন। শ্রীমতী কি এইজন্যেই তার সংশ্য আলাপ করতে চেয়েছে? সোনালীর ব্যাপারটা কি আলাপের ছল? চিঠিখানা প্রভাতকে দেখাতে ইচ্ছা ছিল, কিল্তু সাহস ছিল না। শ্রীমতী বেভাবে তাকে সন্বোধন করেছে, বেভাবে ইতি করেছে, প্রভাত দেখলে হো হো করে হাসবে। হয়তো ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে।

সে রাত্রে ভোজ ছিল। প্রজার ছ্বটি আসর। যে যার দেশে যাবে। তার আগে একট্ব আমোদ আহ্বাদ করতে চায়। খেতে খেতে প্রভাত বলল বাবাজীকে হিন্দীতে, "রতনবাব্র পাতে মাছ দিচ্ছেন কেন? ও মাছ আমার পাতে দিন। আমি দ্ব'জনের মাছ খাব। ওকে দিন আমার আল্বর দম।"

বাবাজী মুচকি হাসল। রক্ন বলল, "আমিই দিতে বলেছি।" প্রভাত বিদ্রুপ করল। "লোভ সংবরণ করতে পারলে না বুঝি?"

রত্ন সে বিদ্রাপ পরিপাক করল। কিন্তু ফাঁস করল না বে ওটা শ্রীমতীর মাধার দিবিয়। ভোজের পর কথাপ্রসংশ্যে বলল, "ভাই প্রভাত, শ্রীমতীর প্রশতাব ওর মন্ডলীতে আমরাও বোগ দিই ললিতের মতো। বৃন্ধদের দিয়ে কিছেই হবে না। তর্গরাই ভরসা।"

"আমি জানতুম।" প্রভাত বলল এক গাল হেসে। "ঝ্লি থেকে বেড়াল এক দিন বেরোবেই। কিন্তু শ্রীমতী দেখছি আন্তে আন্তে খেলিয়ে খেলিয়ে ইন্দর ধরতে জানে না। ওর দাদারা বোধ হয় ওকে ঠিকমতো তালিম দেননি। হয়তো দাদারাই ওকে তাড়া দিচ্ছেন।"

"কিন্তু আমরা যে ওঁদের কথামতো কাজ করব এ নিশ্চরতা ওঁরা কার কাছে পেলেন?"

"তার জন্যে," প্রভাত বলল দোষীর মতো মুখ করে, "আমিই বোধ হয় দায়ী। স্বরাজ পার্টির কমীদের সপো অত বেশী মাথামাখি না করলেও চলত। তথন কি ছাই জানতুম যে ওঁরা বর্ণচোরা আম! তলে তলে সন্দাসবাদে বিশ্বাসী। ওঁদের কাছে আইনসভা একটা আছোদন। আমার কাছে রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনের একটা ধাপ।"

এর পরে রক্ন শ্রীমতীকে লিখল যে সে আবার মাছ খেতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তার তাতে একটন্ও রুচি নেই। মাছ দেখলেই তার মনে পড়ে যে তার শ্রীমতীবোন আংশিক অনশনে। অর্মান বিস্বাদ লাগে অশন। তার পর লিখল—

বিশর্শ রাজনীতি আমার ভালো লাগে না। বাই হোক না কেন তার লক্ষ্য। স্বরাজ বা স্বাধীনতা বা খেলাফং বা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিকার। একদা আমাকে যা আকৃষ্ট করেছিল তা রাজনীতির অন্তরালে নৈরাজ্যবাদ। যে মতবাদ রাষ্ট্রকৈ বাদ দিয়ে রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে ভাবে। গাল্ধীর মধ্যে আবিষ্কার করেছিল্ম আমার কল্পনার নৈরাজ্যবাদীকে। বার সংগ্রাম কেবল পরদেশী রাজশক্তিকে হটাবার জন্যে নয়, তার সিংহাসনে

সেই সব ক্ষমতার অধিকারী প্রজাশন্তিকে বসাবার জন্যে নয়। তিনি চান ভরের শাসনের পরিবর্তে প্রেমের শাসন। যে শাসনব্যবস্থার সৈন্য লাগবে না, পর্নিশ লাগবে না, আদালত লাগবে না, কারাগার লাগবে না। লাগবে না আইনসভা বা পার্লামেন্ট, উকীল বা কোম্বলি। তাঁর অসহযোগের প্রোগ্রাম এমন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যে বিদেশী সরকার গেলে স্বদেশী সরকারকেও এর সম্মন্থীন হতে হবে। তখন তার সরকারত্ব চলে যাবে, ক্রটে বেরোবে মন্বাছ।

তার পর সরকার বললে দৃশ্যত মনে হয় সরকারী আমলা ও ফোজ।
আড়াল থেকে যাদের অদৃশ্য হসত রশি টানে ও প্রতুল নাচায় কেউ তাদের [†]
খোঁজ রাখে না। তারা হলো বিদেশী ও স্বদেশী স্বার্থ। ধনিক, বাণক,
ভূম্যথিকারী, মালিক। তাদের স্বার্থই যদি আড়ালে রয়ে গেল তা হলে
আবার এলো সেই ভয়ের শাসন। সেইজন্যে প্রেমের শাসনের প্রতীক
চরকা। সকলেই হাত লাগাবে, গতর খাটাবে, কেউ পরাসক্ত হবে না।
এর থেকে আসবে শোষণবিরতি। শোষণহীন সমাজ।

এত বড় একটা আদর্শ বাঁর তাঁর উপায়ও তো হবে আদর্শের স্ক্রে বাঁধা। অহিংসা ভিন্ন আর কোন উপায়ে এসব হবে? কিন্তু আহিংসা কি দেশের লোক মেনে নিয়েছে? তা হলে কেন বলব গান্ধী ফেল? বরং বলব দেশের লোক প্রস্তৃত নয়। যখন প্রস্তৃত হবে তখন দেখব গান্ধী পাশ।

প্রভার ছ্রটি এসে পড়ল। সবাই গোছগাছ করছে, রক্ষও। বিকালে কলকাতার ট্রেন। সকালের ডাকে এলো শ্রীমতীর চিঠি। রক্ষর হাতে সময় ছিল না। খামখানা পকেটে প্রেল। তার পর দ্বপ্রের খেতে বসে পকেট খেকে বার করে পরিবেশনের দেরি দেখে পড়তে শ্রুর করল। গান্ধীর বিরুদ্ধে লম্বা নালিশ। আসলে ওটা তাঁর সহক্মীদের বিরুদ্ধে। তাঁদের আদর্শবাদ নাকি একটা মুখোশ। কেউ কাউন্সিল কেউ জেলাবোর্ড কেউ মিউনিসিপালিটি যিনি যেখানে বা পাছেন হাত করছেন। বলছেন দেশের স্বার্থে, আসলে আপন স্বার্থে

রত্ন ও শ্রীমতী

বা উপদঙ্গের স্বার্থে। জ্যোতিদার মতো নির্বোধ বেশী নেই। বোকারাই শূ্ধ্ চরকা নিয়ে পড়ে আছে।

তার পর জন্ম স্বরে প্রশ্ন করেছে, "আপনি যদি এমন অসাধারণ গান্ধীভব তো তাঁর অনুগামী হন না কেন? কলেজে পড়েন কী করতে? জানেন না ওটা গোলামখানা? দাস বানাবার কারখানা ওটা। সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি।"

চাব্বের মতো বাজল রম্বর পিঠে। এমন করে কেউ তাকে শাসন করেনি। গায়ের জনালায় জনলতে থাকল কিছ্কেল। খাওয়া সেরে বিদায় নিল বিদ্যাপতি, অঞ্জন প্রভৃতি বন্ধ্দের কাছ থেকে। প্রভাত তার সংযাতী হবে কিউল তক। তার সংগ্য এজায় উঠে বসল।

"কি হে! কী অত পড়ছিলে?" সুধাল প্রভাত। চোখে দুক্টু হাসি। "কিচ্ছু না। একখানা বাজে চিঠি।" রত্ন এড়িয়ে গেল।

ট্রেনে উঠে রত্ন সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। কী উত্তর দেবে এই প্রশ্নের? যে মেয়ে গান্ধীকে অলম্কার খুলে দিয়ে নিরাভরণ হলো তার মোহভণ্ণ হয়েছে । সে জানতে চায় রত্ন কেন কিছ্ম ত্যাগ করেনি, কেন মোহ পোষণ করছে। কলকাতায় পেণছৈ দ্মপ্র বেলা শ্রেয় শ্রেয় রত্ন এর একটা জবাব লিখল। জবাবদিহি।

কেন গান্ধীন্ধীর অন্থামী হইনি? কলেজে কেন পড়ি? শ্রীমতীবোন, আপনার মতো আমিও নিজেকে প্রশন করেছি। করেছি অনেক বার। এক এক বার এক এক উত্তর পেয়েছি। কাল থেকে আবার আত্মপরীক্ষা করিছ। এবার যা মনে আসছে তাতে সব একাকার হয়ে গেছে।

গান্ধী যেখানে নৈরাজ্যবাদী আমি সেখানে তাঁর সঞ্চো। চার বছরে এ
মিল অমিলে পরিণত হয়নি। সেইজন্যে আমি এখনো খন্দর পরি। এটা
একটা প্রতীক। কিন্তু এই ক'বছরে তাঁর সঞ্চো আমার অমিল দিন দিন
পরিক্ষার হচ্ছে। যেমন রাজনীতিকদের সঞ্চো। তার ফলে রাজনীতি থেকেই
আমার মন উঠে গেছে। আমি খবরের কাগজ পড়িনে। শ্নেছি তাতে
আপনার নাম বেরোয়।

রাজশব্রির সংশ্যে প্রজাশব্রির বলপরীক্ষা অন্যান্য দেশেও ঘটে গেছে।

8

এ দেশে এত কাল ঘটেনি। এই প্রথম ঘটছে। এই যে বলপরীক্ষা এটা।
গান্ধীনেতৃত্বে অহিংস রূপ নিয়েছে। এ শৃন্ধ ভারতের ইতিহাসে নমা,
জগতের ইতিহাসে অপূর্ব। কিন্তু কী শ্নিছি? শ্নিছি এটা নাকি
ইংরেজের সংগ্যে ভারতীয়ের সংগ্রাম। ইংলন্ডের সংগ্য ভারতের ঘৃন্ধ। তার
মানে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরোধ। তালিয়ে দেখলে এক প্রজাশন্তির
সংগ্য আরেক প্রজাশন্তির বিবাদ।

তার পর আরো এক পা এগিয়ে তাঁরা বলছেন এটা প্রাচ্যের সংশ্য পাশ্চাত্যের স্বন্ধ। পূর্ব হচ্ছে পূর্ব, পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম, কোনো দিন ওরা মিলবে না। কারণ এক পক্ষ নাকি অধ্যাত্মবাদী, অপর পক্ষ জড়বাদী। এক পক্ষ দৈবী, অপর পক্ষ আস্বানী। এক পক্ষ শ্রেষ্ঠ, অপর পক্ষ নিকৃষ্ট। কিপলিংকে ওলটালে যা হয়।

আরো শোনা যাচ্ছে আধ্বনিক সভ্যতা নাকি একটা ব্যাধি। ইংরেজ স্বয়ং ও রোগে ভূগছে। ছোঁয়াচ লাগিয়ে ভারতকেও ভোগাচ্ছে। স্বতরাং এটা আধ্বনিকতার বির্দ্ধে অভিযান। ফিরে চল প্রাচীন সভ্যতায়। সেইটেই প্রকৃত সভ্যতা। অপরটা ছম্মবেশী অসভ্যতা। ইতিহাস উজ্ঞান বইবে আমাদের হৃতুমে।

তা হলে দেখছেন তো, বলপরীক্ষা কেবল রাজশক্তির সভেগ নয়, ইংরেজের সভেগ, ইংলন্ডের সভেগ, পশ্চিমের সভেগ, আধ্নিকের সভেগ, ভূলেলের সভেগ, ইতিহাসের সভেগ। অহিংস মনোভাব কোথার! হাওরার মিশিরে আছে জাতিতে জাতিতে বৈর, দেশে দেশে শার্তা, কাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা, য্গ সম্বন্ধে অম্থতা। আমি স্বীকার করিনে যে প্রের সভেগ পশ্চিমের গভীর কোনো অমিল আছে বা মিলন কোনো দিন হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে আধ্নিকের সহস্র দোষ থাকলেও সে আমার আপন য্গ, যেমন ভারত আমার আপন দেশ। রাজশন্তির সভেগ প্রজাশন্তির বিরোধকে আমি ইংলন্ডের সভেগ ভারতের বা ইংরেজের সভেগ ভারতীয়ের বিরোধ করে তুলব না, যদি করি সেটা হবে ম্টেতা। রাজশন্তির পিছনে যারা আছে তারাই সমগ্র ইংলন্ড বা সমস্ত ইংরেজ নর। বরং তাদের একাংশ ভারত বা ভারতীয়।

কলেজে কেন এল্ম? কারণ কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হর তার সংশ্য আমার চিত্তের মিল আছে, বেমন হাওয়ার সংগ্য জানালার। কলেজে এসে আমি দাস হইনি, মনে প্রাণে স্বাধীন হরেছি। ইউরোপীর সাহিত্যে ও দর্শনে মানব মানসের যে মারি, ইউরোপের ইতিহাসে মানবাজার যে জরবারা, আমরা যদি তার অংশ না নিই তবে আমরাই বঞ্চিত হব আমাদের উত্তরাধিকার থেকে। যে উত্তরাধিকার প্রত্যেক মানবসম্ভানের।

তা বলে ভারতীর উত্তরাধিকারকেও উপেক্ষা করব না। এ উত্তরাধিকারও সর্ব মানবের। তা যদি না হতো রবীন্দ্রনাথের দিশ্বিক্সর সম্ভব হতো কী করে? কলেজে এসেছি বলে আমি ভারতীর সাধনা থেকে স্রুট হইনি। তার সংখ্যে নিত্য সংখ্যক্ত রয়েছি। রস আকর্ষণ করিছ মূল দিয়ে সেই ম্ত্তিকা থেকে। পশ্চিমের সঙ্গে যোগ প্বের সঙ্গে বিয়োগ নর। তেমনি আধ্নিকের সঙ্গে অভেদ প্রাচীনের সঙ্গে ছেদ নর।

রক্স তার কলকাতার চিঠিতে কুন্দিয়ার ঠিকানা দিতে ভূলে গেছল। শ্রীমতীর চিঠি এলো কলকাতা ঘ্রে। পড়ল পিতার হাতে। নীল খাম, স্বাসিত, মের্মেল হাতের লেখা। এসব দেখে মল্লিক মহাশয় জানতে চাইলেন কে লিখেছে।

রত্ম ফাঁপরে পড়ল। ভাগ্যিস চিঠিখানার উপর ঠিকানা কাটাকুটি ছিল, তাই বলতে পারল, "সম্পাদকের দশ্তর থেকে ঘুরে ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে। বোধ হয় কোলো পাঠক কি পাঠিকা।"

মা নেই। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই। ছোট বোন। সংসার দেখাশন্না করেন বিধবা জ্যাঠাইমা। ছাদের উপর একখানি করোগেট-ছাওয়া ঘর। সেখানে রক্ন যত দিন থাকে তত দিন তার আস্তানা। সমবয়সী বন্ধ্জন এলে বাইরের সির্ণড় দিয়ে উপরে উঠে যায়। নইলে আর কেউ বিরক্ত করে না। রক্ন যখন খ্লি পড়ে, যখন খ্লি লেখে, যখন খ্লি শনুয়ে শনুয়ে ভাবে। পায়চারি করে।

শ্রীমতীর চিঠিথানা ভারী ঠেকছিল। খুলে দেখল ছোটখাটো একখানা মহাভারত। এ মহাভারতের পাশ্ডব কারা বোঝা যায় না, কিন্তু কোরব হচ্ছে ইংরেজ। ক্রাইভ থেকে আরম্ভ করে হাল আমলের লাট লিটন পর্যানত কেউ বাদ

কার্মান । সকলের সব দ্ব্রুতির জন্যে দারী রত্ন। যা হোক মহাভারত থেকে এটাকু উত্থার করা গেল বে শ্রীমতীর পিতৃকুলের এক প্রেপ্রের্থ পলাশীর যুন্থে সিরাজের পক্ষে প্রাণ দিরোছিলেন। তার পর তার মাতৃলানীর প্রপিতামহ সিপাহী যুন্থে—সিপাহীবিদ্রোহ বললে মানহানি হয়—ঝাঁপ দিরোছিলেন। তার ফাঁসি হয়। ইংরেজের বিরুপ্থে তার ব্যক্তিগত ক্রোধ বংশান্ত্রমিক।

তার চিঠিগুলোর সম্বোধনগুলো দিনকের দিন আবেগময় হরে উঠছে।
"আমার প্রিরতম ভাই" বলে স্চনা। "আপনারই স্নেহের বোন শ্রীমতী" বলে
ইতি। লিখেছে—

একটা দেশ আরেকটা দেশকে গায়ের জায়ে দখল করে তার ব্রকের উপর জগদল পাথরের মতো চেপে বসেছে। একটা জাতি আরেকটা জাতিকে ঘরে কয়েদ করে দোর জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। এর জন্যে আমি নিত্য জর্লছি, রক্নভাই। আপনি কেন জরলেন না? আপনার শরীরে কি রক্ত নেই? আপনি কি মান্য নন, প্রাণী নন, গাছ কি পাথর? না আপনি দেবতা?

আপনার কথা শানে মনে হয় না যে পরাধীনতা বলে একটা জনালা আছে। বে জনালা মান্যকে অনবরত অপ্রির করে তোলে, যে জনালার নিবৃত্তি না হলে মান্য পাগল হয়ে যায়, নয়তো পাষাণ হয়ে যায়। পাষাণকে যদি অহিংস বলেন আমার আপত্তি নেই। অহিংসাবাদীয়া পাষাণই বটে। যেমন জ্যোতিদা। কিন্তু তার চেয়ে আমার মতে পাগল হওয়া হিংস্ল হওয়া শ্রেয়। আগন্ন জনলছে যায় বনুকে তাকে নিবৃত্ত হতে বলা বৃথা। নিবৃত্তি চাই তার নয়, তার জনালার, তার পরাধীনতার। এ পরাধীনতা কি অক্ষর্ম বটের মতো অননতকাল থাকবে! অসহা! অসহা!

পাঁচ

ক্ষণকালের জন্যে ঝলকে গেল রত্নর মনে এই চিন্তা, এ কোন পরাধীনতার ক্ষা বলছে শ্রীমতী? যে পরাধীনতা হিন্দ কোটি মানুষের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা,

দেড়শো বছরব্যাপী, সে কি এমন তীর ভাবে বাজে? না এ তার ব্যক্তিগত পরাধীনতা, স্বন্ধকালব্যাপী, সেইজন্যে এত তীক্ষ্য?

কিন্তু কাজ কী অনুসন্ধিংস, হয়ে! শ্রীমতী জন্তছে, এই যথেন্ট। কেন জন্তছে, তা অবান্তর। রত্ন তার জন্যে সমবেদনা বোধ করল। এবার বে চিঠি গেল তার সন্বোধন 'আমার স্নেহের শ্রীমতীবোন।" তাতে থাকল—

আপনার জনলা আমাকে দংশ করছে। বছর পাঁচেক আপে আমিও জনলোছ। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ আমাকেও জনলিরেছিল। কিন্টু ওই তো আমার জাঁবনের একমাত জনলা নয়। মা যখন ছিলেন মায়ের দয়খ দেখে জনলোছ। সে দয়খ বাবার দেওয়া। পরে দিদির বিয়ের সময় বাবার দয়খ দেখে জনলোছ। এ দয়খ বর পক্ষের দেওয়া। ভুচ্ছ কারণে ওরা বরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। কা ভাগ্যি কনেকে ফেলে রেখে য়য়ান। নইলে বাবাকে হয়তো অপমানে আছাঘাতী হতে হতো। বিয়েতে পণ দেবেন না বলে বাবার এ দয়গতি। পণ নেবেন না, দেবেন না, এই ছিল তাঁর পণ। কিন্টু বিয়ের সময় তিনি যা দিলেন না পরে ওয়া তা মোচড় দিয়ে আদায় করে নিল দিদিকে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিয়ে য়ন্টুণা দিয়ে। পারবারের ভিতরে ও বাইরে এ রকম কত অপমান ও অত্যাচার সইতে হয়েছে আমাকে। একটা তো আপনারও জানা। সোনালার ব্যাপার। প্রত্যেক বার জনলোছ। জনলতে জনলতে যা হয়েছি তা একপ্রকার ডাইনামাইট। সব দিন ফাটে না। ফাটে এক দিন। যে দিন ফাটে সে দিন পাহাড় ফাটিয়ে দেয়। অপ্যারের মতো আমি ছাই হয়ে যাইনি। আমি অপরাজিত।

জন্দতে জনলতে এই সিম্পান্তে উপনীত হয়েছি যে হাজার হাজার বছর এ দেশে সামাজিক পরিবর্তন হয়নি, বিরাট বিরাট পরিবর্তন বকেরা রয়েছে। যারা এক বার চাকার উপরে উঠে বসেছে তারা চাকাটাকে ঘ্রতে দেয়নি, শাস্ত্র বানিয়ে স্বাইকে ব্রুঝ দিয়েছে যে তাদের ভাগ্য বদলাবার নয়। জন্মান্তরে ব্যক্তির ভাগ্য বদলাতে পারে, তার জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে চেন্টা চলতে পারে, কিন্তু স্মন্টির ভাগ্য কোনো কালেই বদলাবে না, স্মন্টিগত চেন্টা বৃথা। যারা এক বার চাকার

নিচে পড়েছে ভারা চিরকাল চাকার নিচেই পড়ে থাকবে, কারণ পা হলো নিচে, মাথা হলো উপরে। জনসাধারণ ভো সমন্তিগত ভাবে আশা ছেড়ে দিরে উদাম ছেড়ে দিরে মুখ থ্বড়ে পড়ে ররেছিল। এমন সময় বাইরে থেকে এক দল লোক এলো। তারা পতিতকে আশা দিল, ভীতকে অভয় দিল। লক্ষ লক্ষ লোক মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু অধিকাংশ লোক এক শান্তের বদলে আরেক শান্ত মানতে রাজী হলো না, তার চেয়ে স্বধর্মে নিধন গ্রেয়। ইংরেজ এসে আরেক দফা আশা দেয়। ধর্ম বদলাতে বলে না, শহরে টেনে নিয়ে যায়, প্রেপ্রেম্বর পেশা ছাড়ায়, সংস্কার ছাড়ায়। কক্ষ লক্ষ লোক অভূতপ্রে স্ব্যোগ পায়, স্বাধীনতা পায়। সমন্তিগত ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক গ্রামেই রয়ে যায়, ব্রি ছাড়ে না, বরং না থেতে পেয়ে মরে। এবার আশা দিতে হবে এই মানুষগ্রিলকে।

ইহজন্মে ইহলোকে সমষ্টিগত চেন্টায় অধিকাংশের ভাগ্যপরিবর্তনের আশা দিতে হবে। ধর্ম না বদলিয়ে। গ্রাম না ছেড়ে। ধর্ম থাকবে, অথচ তার মধ্যে থাকবে ধর্ম নিতরের মৃত্তি। গ্রাম থাকবে, অথচ তাতে থাকবে না জ্ঞাতপাত অস্পৃশ্যতা টিকি পৈতে মনসা শীতলা গৃরু প্রেরাহিত সাধ্বাবা। ইসলামের অন্তঃসার, ইউরোপের মর্মবাণী অবিকৃত ভাবে আত্মসাং করতে হবে। সাধারণত যা দেখি তা বিকৃতি বা অস্বীকৃতি। অসাধারণদের মধ্যেও এই দ্বর্শিতা লক্ষ করেছি। এটা কাটিয়ে ওঠা চাই। জাতীয় স্বাধীনতা হবে বিপ্লেসংখ্যকের বিপ্লেতর মৃত্তি। যে মৃত্তি বৃদ্ধ অশোকের পর দেখা যায়নি এ দেশে। যার জন্যে বাইরের লোকের আসার দরকার ছিল। যার জন্যে জন্মানোর দরকার ছিল আপনার, আমার ও আমাদের বরসের তর্ণ তর্ণীর। আমরাও বাইরে থেকে এসেছি। এসেছি কোন সৃদ্রে লোকান্তর থেকে কোন নতুন সমাধান নিয়ে যা এখনো আমাদের কাছেই অস্পন্ট। চিন্তা করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, নিরীক্ষা করতে হবে। শৃধ্য জনুলে প্রুড়ে মরলে তো হবে না। তবে, হাঁ, জ্বেলাটাও আমাদের স্বধর্ম। আমরা লক্ষ্য ও নীহারিকা। আমরা এই

রয় ও শ্রীমতী

প্রথিবীর মতো শীতল নই। আমরা জ্বলব, জ্বালাব, ভাঙব, চুরব, নতুন করে বানাব। কিন্তু নতুন নিগড় নয়, শাল্য নয়। এক দাসত্বের পরিবর্তে আরেক দাসত্ব প্রবর্তন করা আমাদের শ্বারা হবে না। আমরা স্বাধীন প্রব্ধ, স্বাধীনা নারী। ফ্রী মেন, ফ্রী উইমেন।

আরো দ্ব'চার কথার পর ইতি দিয়ে লিখল—আপনারই স্নেহের রক্নডাই।
এ চিঠি ডাকে দিয়ে সে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। সব কথার উত্তর দিতে গেলে
মহাভারতের বিনিময়ে মহাভারত পাঠাতে হয়। রক্ষে কর। আকাশের দিকে
তাকাবে কখন! ভরা নদীর র্প নিরীক্ষণ করবে কখন! বাউল বোষ্টম ফাঁকর
দরবেশের সংগে মিশবে কখন! প্রেরানো বন্ধ্দের সংগে মিলবে কখন!

রত্ন ও প্রভাত পশ্চিমগামী হ্বার পর থেকে সাত ভাই চন্পার সন্মিলন ঘটে বছরে তিন বার কি চার বার। প্জার বা বড়দিনের বা গরমের বন্ধে। তেমনি একটা বৈঠক আসল্ল হয়েছিল কাননের বাড়ী, ঘোড়ামারায়। সেখানে এসে জন্টবে প্রসাদপন্র নওগাঁ থেকে গিরীন, ইংরেজ বাজার থেকে প্রভাত, লালগোলা থেকে ললিত, নাটোর থেকে হৈম, ঈশ্বরদি থেকে নবনী। আর কুণ্টিয়া থেকে রত্ন। মণ্ডলীর কার্যকলাপে পরিচালনার অভাব ছিল। এক এক জনের অভিরুচি এক এক দিকে। এমন কেউ ছিল না যে তাদের সংহত করে নির্দিণ্ট কর্মপন্থায় চালিত করবে। সর্বক্ষণ মেলামেশা করলে আপনা হতে একটা ঐক্য আসে। কোনো একজনের নায়কত্ব না হলেও চলে। কিন্তু বছরে কয়েকবার মাত্র মিলিত হলে শিথিলতা অনিবার্য।

কাননকে বিহ্বল করেছে পশ্বপক্ষীর ব্যথা। যেমন করেছিল বাল্মীকিকে। এই আহিংসার দেশে পশ্বহত্যার পশ্বতিটা অনাবশ্যক নিষ্ঠ্রর। চামড়াটা আদত পাবে ও বেশী দামে বেচবে বলে প্রাণ নেবার আগেই ছাল ছাড়িয়ে নেয়। মাংস বেশী পাবে বলে মাথার যত কাছাকাছি পারে তত কাছাকাছি কাটে, একট্ব একট্ব করে কাটে, এক কোপে কাটলে পাছে মাথার সংগ্র মাংস বেশী চলে যায়। পাখীদের যে ভাবে ধরে, যেমন করে একসংগ্র বেশ্বে বা খাঁচায় প্রের চালান দেয়, জলট্বু খেতে না দিয়ে শ্বিকয়ে মারে তা দেখলে বাল্মীকি হয়তো গোটা দেশটাকেই অভিশাপ দিয়ে আর একটা শেলাক রচনা করতেন।

ি গিরীনকে বিধনুর করেছে ধসন্তরোগী কলেরারোগীর পরিত্যক্ত অবস্থা ও নিঃসণ্য যাতনা। সে পড়াশনো করবে কখন! ধর্থনি সংবাদ পার ছুটে যার রোগীর পাশে, সেবার ভার নের, সন্য দের। আই-এসসি পাশ তার এখনো হলো না, পাশ করলে ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু দিন দিন তার দেরি হয়ে যাছে, তার সহপাঠীরা মেডিকাল কলেজের এম-বি হতে চলল। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে সে ভাবছে একটা ওম্বের দোকান খ্লবে, নইলে সংসার অচল হবে। সে বিরে করবে না। তা হলেও তার আগ্রিত অনেকগ্রলি।

হৈম উকীল হয়ে গরিবদের জিতিয়ে দেবে। যারা জিতবে তাদের কাছ থেকে ফী নেবে। যারা হারবে তারা ফ্রী। বিয়ে ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। সেটা গ্রুডনের ইচ্ছায়। কিম্পু সে বহু সম্তানের জনক হবে না। সেখানে তো গ্রুডনের ইচ্ছা খাটে না। সে তার সহধর্মিণীকে মিক্ষিতা করবে। দেশে মহিলা কমীর বড় অভাব।

লালিত তলে তলে সন্থাসবাদের দিকে ঝ্কছে বলে গ্রেব। তবে তালিরে যেতে নারাজ। সে খেলোয়াড় মান্য, খ্ব একটা উচ্চাঙ্গের খেলা খেলতে চার। যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। সম্বকারী মহলে পারিবারিক প্রতিপত্তি অব্যাহত থাকবে, আবার দেশান্রাগী মহলে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার হানি হবে না।

নবনীর নিজের ইচ্ছা কবি ও মনীষী হতে, মাসিকপত্র সম্পাদনা করতে। কিন্তু তার গ্রুজনের ইচ্ছা তা নয়। ইতিমধ্যেই এক বড়বাব্র মেয়ের সম্পো তার বিয়ে দেওয়া হয়েছে এই প্রত্যাশায় যে তার শ্বশ্র তাকে সওদাগরি আপিসে চ্রেকিয়ে দেবেন। সেও একদিন বড়বাব্র হবে। তা সভ্তেও সে সাম্যবাদের পক্ষপাতী হয়েছে। কাননের যেমন পশ্র ও পাখী নবনীর তেমনি চাষী ও মজ্বর। মেশে না যদিও তাদের সঞ্জে, তব্র লেখে তাদের দ্র্দশার কথা। যেভাষায় লেখে সে-ভাষাও তাদের মুখের ভাষা নয়।

বন্দ্রদের সণ্গে অনেক দিন পরে একজোট হওয়ার উত্তেজনা। তার উপর বাতায়াতের উত্তেজনা। রত্ন এই নিয়ে অন্যমনস্ক ছিল, এমন সময় এলো শ্রীমতীর চিঠি। তার চিঠিতে ফী বারেই একটা না একটা চমক থাকে। এবারকার

চমক "আপনি"র জারগার "তুমি।" সে বে কেবল "তুমি" বলেছে তাই নর, "তুমি" না বললে রাগ করবে বলে শাসিরেছে।

সত্যি, ভাই, তোমার উপর রাগ না করে পারিনে। বত বার ভোমার চিঠি পেরেছি তত বার রাগ করেছি। তোমার উত্তর বেমনটি হলে খ্রিশ হতুম তেমনটি হরনি। হরেছে তার উলটোটি। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অপ্রত্ব। আমার চেনাশোনার মধ্যে তুমিই একমান্ত জন বাকে চিঠি লিখলে চিঠির উত্তর খ্লতে হাত কাঁপে। আবার চিঠি না পেলে, পেতে দেরি হলে, প্রাণ কাঁপে।

রঙ্গ, তোমার চিঠি আমার চাইই চাই। আমি পড়ে আছি দক্ষিণ প্রশাশ্ত মহাসাগরের অখ্যাত এক স্বীপে। এখানে সভ্যতার আলো পেশছর না। তোমার চিঠি যখন পাই তখন মনে হয় সভ্যতার আলো পেশুম কত দিন বাদে। জ্যোতিদাও মাঝে মাঝে আসে। সেও বরে আনে আছো। নতুন বই দিয়ে বায় পড়তে। আর ষারা আসে তাদের মধ্যে আগ্রন আছে, আলো নেই। আমি আগ্রন পছন্দ করি, কিন্তু আলো না হলে বাঁচিনে। তোমার মধ্যে, জ্যোতিদার মধ্যে, আগ্রনও আছে, আলোও আছে। সেইজন্যে তোমাদের এত ঈর্ষা করি।

এবার তুমি যা লিখেছ তা আমাকে দোলা দিয়েছে। অত্যন্ত উন্মনা বোধ করছি। সংগ সংগ হতাশায় ভেঙে পড়ছি। কেন, সে কথা বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। বলব এক দিন। তার আগে শোনাতে চাই রুপালী বলে একটি মেয়ের গল্প। আমার বাল্ধবী। ও আমাকে বিশ্বাস করে বা বলেছে তা আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। দেখো, ভাই, কাউকে এসব বোলো না। ললিত জানে। সে জেনেছে আমার ননদের কাছ থেকে।

তোমাকে লিখছি এই ভরসায় যে তুমি যেমন সোনালীর জন্যে চেণ্টা করেছিলে তেমনি র্পালীর জন্যেও করবে। গান্ধীর উপর আমি বীতরাগ কেন, জান? তাঁকেও আমি জানিরেছিল্ম। তিনি কিছ্ করলেন না। এমন উপদেশ দিলেন যা কোনো কাজের নয়। নেতাদের কেউ কেউ জানেন।

রত্ন ও শ্রীমতী

তট্নদেরও সেই ধরণের উপদেশ। সমাজের শাশ্তি ও শৃশ্থলা তাঁদের কাছে এত বেশী মূল্যবান যে একটি বালিকার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে ও হচ্ছে তার কোনো স্কুথ শোভন প্রতিকার তাঁদের মাথায় আসে না। উটপাখীর মতো বালুতে মাথা গ্রন্ধলে কী হবে? বিরন্ধি লাগে।

র পালীর কথা লিখব যে, কেমন করে আরম্ভ করব ভেবে পাইনে। এলোমেলো হবে। অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে যাবে। সে-সব তুমি কলপনা দিয়ে ভরে নিয়ো। ইচ্ছা করে অনেক কথা বাদ দিচ্ছি। সে-সব পর্র্য-মান্ধের কাছে বলা যায় না।

র্পালী না বলে র্পসী বলতে পারতুম। ও মেয়ে দেখতে এত স্কর্মর বে মেয়েরা পর্যান্ত ওর প্রেমে পড়ে ষায়। প্র্রুষরা তো পততের মতো পড়ে। ও কিন্তু সহজে কারো প্রেমে পড়বে না। ও চায় বীরপ্র্রুষ। ও হবে বীরভোগ্যা। যার তার কপ্তে মালা দেবে না ও। দেবে স্বয়ংবর সভায় বীরম্বের পরিচয় দেখে। এমান একটা আদর্শ বা স্বান্দ নিয়ে ওর ছেলেবেলা কেটোছল। ওর বয়স যখন তেরো কি চোম্দ তখন ওর দাদার এক বাখ্য এসেছিলেন ওদের বাড়ী বেড়াতে। বীরের মতো চেহারা নয়, তবে স্মার্জিত মুখ্যান্ডলে ভাবময় চাউনি। স্বরোদ বাজান। সে কী স্বরোদ! যেন শ্যামের বাঁশি। কোনো প্রেম ঢোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। কোনো প্রেম কানের ভিতর দিয়ে। এই স্বরোদিয়া ওর হৃদয় হরে নিল কয়েকটি দিনে। প্রথম প্রেম এলো হৃদয়ে।

মেয়ের ভাবাল্তর মায়ের নজর এড়ায় না। তিনি জানতে চান, সে জানায়।
মা রাজী ছিলেন, বাপ নারাজ। ও জমিদারের ছেলে নয়, পড়াশ্নাও তেমন
করেনি যে বড় চাকরি পাবে বা বড় উকীল হবে। তা ছাড়া ভিঙ্ক জাত।
সেইটেই সব চেয়ে বড় বাধা। রুপালী কিল্টু মানা মানবার মেয়ে নয়।
চিঠির পর চিঠি লিখতে থাকল জিতেশকে। লিখতে থাকল, আমাকে নিয়ে
যাও, হরণ করে নিয়ে যাও অর্জন্নের মতো। একখানা চিঠি কেমন করে
দাদার হাতে পড়ে, দাদার হাত থেকে বাবার হাতে। তিনি তো অণ্নিশর্মা।
য়া, বেরিয়ে যা আমরা বাড়ী থেকে। এখনি যা। সে যে কী দ্বঃসহ অপমান

তা বোঝাবার নর। স্থানালী এক মাস উপবাস করে। তার সাধ্য থাকলে সে সত্যি বেরিয়ে যেত।

পাহারা বসল। সংশ্যে সংশ্যে বিয়ের সম্বন্ধ চলতে খাকল। ওর দার্ণ আপত্তি। কিন্তু কে শ্নুনছে ওর কথা! ওর চেরে বরসে দ্বুণাণ বড় এক দোজবরের সংশ্যে ওর ধরা বিয়ে। স্বয়ংবর নয়। বনেদী জমিদার বংশের বে'টে মোটা আহ্মাদী দ্লাল। বীরপ্রর্থ নয়। মাছ ধরা, শিকার, গান বাজনা, খেলাখ্লা সব একট্ একট্ জানে। লেখাপড়ায় দ্বটো পাশ। কিন্তু বিশ্বান বা গ্র্ণী নয়। দেখতেও যদি ফরসা হতো! চিরাচরিত প্রথা অন্সারে বিয়ের আগে দেখাসাক্ষাং বারণ। শ্বভাব্নিটর সময় বরকে চাক্ষ্য করে রুপালীর তো চক্ষ্বিশ্বর! এ কোন ছন্মবেশী ব্যাঙ্ রাজকুমার! র্পক্থায় যেমন খোলস ছেড়ে সহসা স্প্রের্থ হলো বাস্তবেও হবে না কি? হে মা কালী, তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

ফ্লশ্য্যার রাত্রে র্পালী আশা করেছিল এই র্পান্তর। কত কাব্য, কত রোমান্স, কত সৌন্দর্য দিয়ে স্চিত হবে তার নবজীবন! রজনীদীর্ঘ হবে তার পূর্বরাগ। মন পাবার তপস্যা চলবে দেহ পাবার পূর্বে। কিন্তু যা হলো তা অকথনীয়। সেও একপ্রকার নারীধর্ষণ। পশ্ব না হলে তেমন অভদ্র ইতর আচরণ কেউ করে না। বর্বর না হলে তেমন করে লজ্জা শরম বিসর্জন দেয় না। প্রথম আন্বাদন কোথায় স্থার মতো ন্বাদ্ব হবে, তা নয়, বিষের মতো বিন্বাদ। সেই কুংসিত বীভংস সংগ থেকে সে দ্রে সরে গিয়ে মনে মনে প্রতিক্তা করল, আর নয়, আর নয়।

ন্দিবতীয় বারের বার সে বাধা দিয়ে অনর্থ বাধায়, তার চিংকার শন্নে লোকজন ছন্টে আসে। অন্টমণ্গলার সময় যখন বাপের বাড়ী ফিরে যায় তখন তার মা বাবা ব্রুতে পারেন না কী হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছেন বিয়ে কোনো রকমে একবার হয়ে গেলে বাকীট্রু প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতি করে বাবেই, অন্যথা হবে না, এই হলো তাঁদের ধারণা। কিম্তু রুপালীর ধারণা তার বিয়ে একটা মায়া, ফ্রাশব্যা একটা দ্বেম্পন, সে বাপের বাড়ীতেই ছিল, রয়েছে ও থাকবে। তার মা কাকিমায়া তাকে যতই

বোঝান বে মেরেদের আসল বাড়ী হচ্ছে "বশ্রবাড়ী, স্বামী জিল ইহলোকে পরলোকে অন্য গতি নেই, মা না হলে জীবন বৃথা, মা হলেই সব ঠিক হরে যাবে, সে ভতই অব্বুখ হয়। সি'খিতে সি'দ্বের দের না, নোরা খুলে ফেলে, কুমারীজীবনে ফিরে যার। সে বিবাহিতা নর, সে কুমারী। কোমার্ব তার অক্ষত রয়েছে। যদিও ঠিক তা নর।

্বংসরান্তে তাকে জোর করে রানীনগরে দিয়ে আসা হয়। যারা দিয়ে আনে তারা এক গাছা দড়ি ও একটা কলসী দিয়ে আসতে ভূলে যার। সে ভুল শোধরানোর উপার ছিল না। দরকারও ছিল না। সে আবিস্কার করল যে বাংলার সিংহাসন শূন্য থাকেনি। রানীনগরের রানী হয়েছেন প্রথম পক্ষের স্থার বিধবা দিদি। সম্বন্ধটা স্থাবিয়োগের পূর্ব হতেই। স্থারীর মৃত্যুর কারণও নাকি তাই। একই কারণে ন্বিতীয় বিবাহে অপ্রবৃদ্ধি। তাতে কিছ, অসুবিধা হয়নি। এ বাড়ীর ঐটেই নিরম। প্রায় প্রত্যেকের একটি করে উপপত্নী আছে। সেটাও বনেদিয়ানার অঞ্চা। না থাকলে পৌরুষে বাধে। তবে বিয়েটাও করে রাখা দরকার। নইলে সম্পত্তির অধিকারী কে হবে? বৈধ পত্রে চাই। বৈধ পত্নার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। সেইজন্যে অবশেষে রুপালীর পাণিগ্রহণ। তার কর্তব্য হচ্ছে একটি পুরুসন্তান উপহার দেওয়া। আর অপরার কর্তব্য শয্যাসন্গিনী হওয়া। দু'জনের দুই স্বতন্ত্র মহল। দ্বলেট বাঁদি। ধর্মপত্নী বলে রূপালীরই সম্মান বেশী। কিন্তু নর্মপত্নী বলে শেফালীর আদর বেশী। মারখানে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল. পাছে রুপালী মূর্চ্ছণ যায়। পরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। রুপালী মূর্চ্ছণ যায় যাবে।

এর পরে বেচারির খুব শক্ত অসুখ করে। তার মামা এসে তাকে ভাগলপুরে নিয়ে যান। যেখানে তার জন্ম। সেখানে বছর খানেক থেকে তার শরীর সারল। কিন্তু যার চিকিৎসায় সারল সে পড়ল সেই ভাঙারের প্রেমে। এই প্রেমটাই সত্যিকার প্রথম প্রেম। পুর্বের সেটা ছেলেমান্ষী। এবার তার মধ্যে নারী জাগল। জাগল ঘুমভাঙা রাজকন্যার মতো। জেগেছে দেহে মনে আস্থায়। জেগেছে প্রতি রোমক্পে। প্রতি অশেগ। সে তার

প্রিম্নতমের কাছে প্রেম নিবেদন করল বিরূপে। তিনি তার উত্তরে বা করলেন তা বিস্ময়কর। হঠাৎ একটি স্পান্নী দেখে রাতারাতি বিরে করে ফেললেন। বেচারি র্শালী! তার সব আশা নির্মাল হলো। এবার সে হয়তো গণগার জলে ছবে মরত, যদি না আকাশগণগার মতো নেমে আসত মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। সেই আকাশগণগার স্রোতে অনেকে ভেসে বার। তার ন্বামীও। জেলা ম্যাজিন্টেট বন্দ্রক বাজোয়ান্তির হ্মকি দেখান। তখন শ্বশ্র মহালয় প্রেকে পাঠিরে দেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে। আর প্রেবধ্বকে নিয়ে বান রানীনগর।

সেও স্রোতের টান এড়াতে পারল না, অলম্কার খুলে দিল গাম্ধীকে যখন তিনি আবেদন করেন। ম্যাজিস্টেট রাগ করে শ্বশ্রের নাম কেটে দেন খাস মুলাকাতি লিস্ট থেকে। কত বড় অসম্মান! কিস্তু সেইটেই তাঁর জরের হেতু হয় লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে। যার জন্যে এ জয়তাকে তিনি বহু পরিমাণে স্বাধীনতা দেন কংগ্রেস কমীদের সম্পো মিশতে। রুপালী যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। এখন থেকে তার ধ্যান হলো ভারতের স্বরাজের মতো তার স্বকীয় স্বরাজ। পরাধীনতার উপর তার ঘেলা ধরে সেছে।

শ্বামী ফিরলেন আড়াই বছর বাদে, ব্যারিস্টার না হয়ে। শেখবার মধ্যে শিখেছেন বেহালা বাজাতে। কিনে এনেছেন একখানা বারো হাজার টাকা দামের বেহালা। ও দেশে খেকে এইট্কু উর্নাত হয়েছে বে স্মার উপর জ্যোরজন্ত্রম করেন না। আরাধনা করেন। রুপালীর এখন অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। ইচ্ছা করলে সে এই মৃহুতে শেফালীকে দ্র করে দিতে পারে। কিন্তু তা যদি সে করতে বায় তবে তাকেই নিতে হবে শেফালীর স্থান। যা সে হতে চায় না তাই হতে হবে। সম্তানবতী। তা হলে তার স্বাধীনতার কী হবে? ওদের দ্ভোনের যে সম্পর্ক তা দ্রে গেলেও ঘুচে যাবে না। একজন দ্রে গেলে আরেকজন যাবেন তার বিরহ জ্বড়াতে। মাঝখান খেকে রুপালীর নরকবাস আরো অসহা হবে। যেখানে প্রেম নেই ও হবার আশা নেই সেখানে অপ্রেমের সম্তান তার বাছিত নয়। একটি

দেবশিশক্ষে স্বর্গা থেকে নয়কে আনা কি তার কর্তব্য? ভূমিই বল, ভাই, এটা কি তার ধর্ম?

সংক্ষেপে এই হলো সোনালীর বোন রুপালীর কাহিনী! সোনালীর বোন শুনে মনে কোরো না সভিজেবরের বোন। না, পাভানো বোনও নর। কেউ নর। একটি অপমানিতা নারী, যার সংশ্য একটি ক্ষেপ্রে একটি গভীর মিল আছে। উভরেই ধর্ষিতা। তবে সোনালীর বেলা সেটা মন্দ্রপত্ত নর, ঢাক ঢোল বাজিরে লোকজন খাইরে আগ্রনে ঘি ঢেলে সংস্কৃত মন্দ্র পড়ে বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে শালগ্রাম সাক্ষী করে অন্যায় করা হরনি, করা হয়েছে একান্ড আদিম ভাবে। আর রুপালীর বেলা এটা মন্দ্রগান্ধ শালসম্মত ধর্মনির্দিন্ট অন্যায়। এর কাছে আত্মসমর্পাই প্রেণা, এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোই পাপ। যে যত বেশী আত্মসমর্পাণ করবে সে তত বড় সতী। আত্মসমর্পণের শ্বারা যে যত বার মা হবে সে তত বড় দেবী। নারীত্বের পরাকান্টা অন্যারের কাছে আত্মসমর্পণ ও অন্যায়কারীর সন্তানের মাতৃত্ব। বেহেতু মন্দ্র পড়া হয়েছে। নয়তো একই ব্যাপার অন্য নাম নিত। যেমন সোনালীর বেলা।

অন্যারের জয় হবে ভাবতেই পারে না রুপালী। সেই যে সে অলাকার ত্যাগ করেছে তার পরে আর ধারণ করেনি। কেবল দু'হাতে দু'গাছি শাঁখা, এক গাছা নোয়া। এই পর্যক্ত আপোস। লোকে ঠাওরায় এটা দেশের জন্যে কুছে সাধন। তা নয়। এটা ব্যক্তিগত জাঁবনে বিবাহের অম্বীকৃতি। সে কারো অধিকৃতা নয়। সে অনধিকৃতা। এই তো সেদিন মাছ ছেড়ে দিল। বিধবার মতন। এটাও তার বিবাহের অম্বীকৃতি। এবায় যা ঘটেছে তা বলপ্রয়োগ নয়, মানসিক নিন্ট্রকা। প্রতিবাদ তাকে করতেই হবে, বে-ভাবেই হোক। তা যদি না করে আপনার উপর শ্রম্থা হায়াবে। খাড়া থাকতে পারবে না, ভেঙে পড়বে। তার জাঁবনের গতি একটা চরম অবস্থার দিকে যাছে। রুপালী তাই ঘোরতর চিন্তিত। কা আছে তার বরাতে কে বলতে পারে! সে কি বাঁচবে! সে কি ময়বে! সে কি জাঁবন্মতের মডো বেণ্টে বর্তে থাকবে। দেখছে তো আরো নয়ণো নিয়ানন্বই

রত্ন ও শ্রীমতী

জন মেরেকে। কী তাদের বাঁচার ছিরি! প্রত্যেকেই মনে মনে জানে যে তার হাত পা বাঁধা। তার মৃত্তির উপায় নেই। থাকলে পালাত, ধরা দিত না, মা হতো না। তব্ প্রত্যেকেই বলে এটা তার ধর্ম, পতি ভিন্ন সতীর আর কে আছে, অবাঞ্ছিত হলেও তারই সম্তান ধারণ করতে হবে, মনোনরনের অবকাশ নেই। উনি যাই করে থাকুন না কেন, আরেকজনকে বিয়ে তো করেনি। যাই করতে থাকুন না কেন, আরেকটা বিয়ে তো করছেন না। কী রকম মহানুভব, দেখছ! প্রায় মহামানব বললেও চলে!

ভাই রক্ষ, এ গলপ শ্নেনে তোমার কেমন লাগল লিখো। ভরুসা করি তুমিও বিধান দেবে না যে যা হয়ে গেছে তাকে মেনে নেওয়াই শ্রেয়। আমি তো বলি, যা হয়ে গেছে তাকে না-হওয়ানোই শ্রেয়। অব্দ ভূল হয়ে থাকলে সেলেট মুছে ফেলতে হয়। তেমনি বিয়ে ভূল হয়ে থাকলে কী? সীমন্ত। রুপালীকে আমি দেখেছি। ও মেয়ে ঋষি বিব্দমচন্দের দেবী চৌধুরানী নয় যে বিদ্রোহ করার পর পায়ে লন্টিয়ে পড়বে সতীন থাকতে প্রসাদ পাবার জন্যে, মা হবার জন্যে। না, ভাই, ঋষি রবীন্দ্রনাথের বাক্যও তার শিরোধার্য নয়। কোথায় যেন তিনি লিখেছেন নারী তো তার স্বামীকে বেছে নেয় না, মেনে নেয়। তা হলে তার সন্তানকে বেছে নেবে কেন? মেনে নেবে। ময়ি, ময়ির! কিবা যালিছা! মেয়েয়া যেদিন হয়কে নয় কয়তে শিখবে সেদিন এই ঋষি মশাইদের চোখ ফাটবে। এ'য়া দেখবেন পায়র্ব যাই করে তাই চাড়ান্ত নয়, নারী ইচ্ছা কয়লে তাকে উলটে দিতে পারে। বিয়ে হয়েছে তো কী হয়েছে? যে জন্যে হয়েছে সেটি হচ্ছে না। দেশের সব মেয়ে যেদিন এই তান ধয়বে সেদিন দুর্শতনটে বিয়ে করেও কি ফল হবে কোনো!

ফল শব্দটার নিচে একটা রেখা টেনে দিয়েছিল শ্রীমতী। রত্ন তা দেখে সিশ্বর হয়ে উঠল। বাপ রে! কী ডার্নাপিটে মেয়ে! রত্নর ব্রুতে বাকী ছিল না বে রুপালী আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীমতী।

রত্ন স্থোদন তার ঘরে কাউকে আসতে দিল না। দরজা বন্ধ করে কোলের কাছে হাত জোড় করে শতব্ধ হয়ে বসে রইল। এ কী চমক! চমক বলে চমক! চমক যেন থামতে চায় না।

শ্রীমতীকে সে এত দিন ভূল ব্রেছে বলে লজ্জিত ও দুঃখিত। ও মেরে ওর নিজের ম্বিছর জন্যে জীবনমরণ রণ করে চলেছে। ও কেন পরের হাতের প্রেতুল হবে! ও বদি সন্মাসের পথ ধরে থাকে তবে ওর বিশ্বাস ওই পথেই ওর নিজের ম্বিছ। বলা যায় না, হয়তো ওই পথেই ওর ম্বিছ হবে। রক্ষ যদি ওর মতো অবস্থায় পড়ত রক্ষও কি সন্মাসবাদী হতো না? রক্ষ যে রক্ষা হরে জন্মায়নি তাইতেই সে বে'চে গেছে। নইলে তারও তো এত দিনে বিয়ে হয়ে থাকত, সেই রকম একটা ধরা বিয়ে। তার উপরেও জাের খাটাত এক ব্যক্তি, যার হ্দয়ে তার জন্যে প্রেম নেই, যার জন্যে তার হ্দয়ে নেই প্রেম। ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে আসে, মনে হয়্ন ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে।

এই উৎপাতের সপ্যে সংগ্রামই করতে হয়। এর সপ্যে সন্ধি করা চলে না ।
জগতে এ যদি থাকে তবে এ যত দিন থাকে তত দিন সৃষ্টির কাজ স্থাগিত।
রন্ধর জীবনদর্শনে যে স্থিতির ভাব এসেছিল সেটার গায়ে ধাক্কা লাগল। প্রচন্ত
ধাক্কা। এর্মান এক ধাক্কা লেগেছিল সোনালীর বৃত্তান্ত প্রথম যেদিন শোনে কাননের
মুখে। তিন বছর লাগল সামলে নিতে সে বার। এ বার কে জানে ক'বছর লাগবে!
তা হলে কি তাকে দিয়ে সৃষ্টিলীলা হবে না? সে কি এসেছে ডাইনামাইট হাতে
করে? তার রক্ত স্বভাবত গরম নয়। কিন্তু গরম হয়ে ওঠে দুর্বলের উপর
প্রবলের বলপ্রয়োগ ঘটলে বা ঘটবার উপক্রম হলে।

রত্ব তার সমস্ত সন্তা দিয়ে অন্তেব করল যে, শ্রীমতীর এই রণ তারও রণ। সে রণছোড় হতে পারে না। হলে শ্রীমতীর পরাজর হবে। সেটা তারও পরাজর। যে পরাজিত হয়েছে বা পরাজয় মেনে নিয়েছে তাকে দিয়ে কোন মহৎ কর্ম সম্পন্ন হতে পারে? সে হয়তো ধনী হবে গণে হবে গণ্যমান্য হবে সম্প্রাত্ত হবে, কিম্তু মানবাত্মার যা নিয়ে গোরব তা হলো দ্ব্রলকে অভয়

রত্ন ও শ্রীমতী

দেওরা, প্রবলকে অভরুক্তর করা। একজনকে বলা, "আমি থাকতে তোমার ভর নেই।" আরেকজনকে বলা, "আমি থাকতে ডোমার জোর নেই।"

কিন্তু এই মৃহ্তে জারই বা কোথার! শ্রীমতীর স্বামী তো আর জোর খাটাতে ব্যগ্র নন। তিনি তাঁর বল প্রত্যাহার করে ছল ব্যবহার করছেন। এর প্রক্রে কী করতে হর রম্ন বলতে পারে না। তার কোনো ধারণাই নেই। তার পরামর্শ চাইলে সে বলত, "ও-বাড়ী ছেড়ে বেখানে পার চলে যাও। বাপের বাড়ী, কাকার বাড়ী, মামার বাড়ী, মাসীর বাড়ী।" কিন্তু শ্রীমতী তার পরামর্শ চার্মন। যত দ্বে বোঝা যার সে শ্বশ্রবাড়ীর সংগ্য সম্বাধ কাটাতে চার না, অথচ স্বাধীন হতে চায়। এই স্ববিরোধ তার অন্তরে, কিন্তু সে ভাবছে তার বাইরে। রম্ন এর কী করতে পারে! শ্রীমতীর চেয়ে শতগণে বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরাও তো ভাবছেন ইংলণ্ডের সংগ্য সম্বন্ধ কাটাবেন না, অথচ স্বাধীন হবেন।

রঙ্গ যাই বলকে না কেন, তলে তলে পিউরিটান ছিল। নরনারীর দাস্পত্য জীবনের রহস্য যদিও অতি সামান্যই উন্মোচিত হয়েছিল তব্ সেট্কুও তার দ্ভিকট্। জানতে যে তার কোত্হল ছিল না তা নর, কিন্তু সংগ্য সংগ্য বিতৃষ্ণাও ছিল। আর ছিল শঙ্কা। "চুপ, চুপ" নীতিতে তারও আস্থা ছিল। ওসব কথা অত খোলাখ্লি ভাবে লেখা কি ভালো! গ্রীমতীটার কবে ব্লিখস্থি হবে! রঙ্গ হাজার হোক প্রবৃষ্ধ মানুষ। না গ্রীমতীর মতে সে মেরেলি?

যাক, রত্ন শ্রীমতীকে ব্রুবতে দিল না যে ও ব্রুবতে পেরেছে র্পালী কে। না বোঝার ভাগ করে গোল উত্তর দেবার সময়। দাম্পত্য ব্যাপারগ্রেলার বেলা নীরব রইল। এবার তাকে অনেক রেখে ঢেকে চিঠি লিখতে হলো। কে জানে যদি অন্য কারো হাতে পড়ে! একট্র গম্ভীর রাশভারি বিষ্কম-বিষ্কম ভাব আনতে চেণ্টা করল তার লেখায়। একট্র সংযত রবীন্দ্র-রবীন্দ্র ভাব। ভারতের অধ্যাত্ম সন্তা, রহ্মনিষ্ঠ গ্রুম্থ, দেব জীবন, মাতৃত্বের মহিমা ইত্যাদি সব ক'টা ব্রুকনি ছিল তাতে। তার বস্তব্যের সার কথা : বর্ণমালায় তিনটে স আছে। স'। স'। স'। অর্থাৎ সব কিছু সহ্য কর।

কিন্তু চিঠিখানা ডাকে দিতে গিয়ে তার মনে হলো ভারতের মাটিতে এই একটি মেয়ে জন্মেছে যে অন্য রকম। এর মনোবল ধ্বংস করে একেও স্টীম

রোলার দিরে সমভূম করে দেওরা আর যার শ্বারা হর ছোক, ভার শ্বারা হবে না। চিঠিখানা কার হাতে পড়বে সে কথা ভেবে চিঠি লেখা ভণ্ডামি। পড়ে পড়বে ভার স্বামী কিংবা শ্বশ্বের হাতে। শাশ্বড়ী কিংবা ননদের হাতে। তা বলে সমাজরক্ষী সেজে সাজানো কথা লিখবে না রক্ষ।

চিঠিখানা ছি'ড়ে ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখল :

শ্রীমতী, বোন আমার,

র্পালী কে আমি জানি। সে অনন্যা। ভারতবর্ষে তাকে দেখব আশা করিন। তার সংগ্রামের তুলনায় ভারতের সংগ্রাম কঠিন নয়। সে যদি জয়ী হয় ভারতও জয়ী হবে। শ্রীমতী, তুমিই আমার ভারত। যে ভারত স্বাধীন হবেই, শন্দোর কাছে বা শান্দোর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। যে ভারত বহু শতকের নির্মোক ত্যাগ করে নতুন হয়ে উঠেছে, মনে প্রাণে নতুন। যে ভারত প্রাণে ইতিহাসে ছিল না, এই প্রথম উদিত হলো। শ্রীমতী, তুমিই সেই ভারত। তোমাকে আমি বন্দনা করি। কিন্তু আমার বন্দনার ভাষা বন্দে মাতরম্নর।

যে প্রব্ধ নারীর মনোনয়ন পায়নি তার মতো হতভাগ্য কে আছে! পতি মনোনয়নের মধ্যেই সন্তান মনোনয়ন নিহিত। মনোনয়নের অধিকার মান্ধের জন্মগত অধিকার। জন্মন্বদ্ধ। নারী কেন এর থেকে বঞ্চিত হবে? যায়া তাকে বঞ্চিত করে তায়া মান্ধের অধিকার মানে না। মান্ধের চেয়ে বড় করে সমাজকে, শাদ্যকে। ফরমায়েসী সতীম্বকে, ফরমায়েসী মাতৃম্বক। এসব যেন অর্ডারি মাল। যেন অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। অর্ডার অন্সারে না মিললে জারজ্বল্ম খাটায়, শাদ্য থেকে পৌছয় শন্দে। প্রেমের পথ এ নয়। প্রেম কখনো দাবী করে না। তাই প্রেমের মধ্যে দ্বেপকের স্বাধীনতা নিহিত। স্বাধীনতার মধ্যে প্রেম।

আজ আমার মন ভরা আছে। বিষাদে অথচ গোরবে। আজ এই পর্যান্ড। কাল রাজশাহী যাচিছ। সাত ভাই চম্পার বৈঠকে। ইতি।

সানেক কথা বলার ছিল, বলতে পারত। কিন্তু সমস্যা তো কথা দিরে মিটবে না। চাই কাজ। যে মেরেটি একা সংগ্রাম করছে শনুস্রীতে মিন্তহীন হরে তার মনের জোর বাতে বজার থাকে সেইজন্যে কথা যেট্,কু বলতে হর সেইট,কু বলবে। কিন্তু তার জরের পক্ষে সেই বথেণ্ট নর। চাই কাজ। রক্ষ এর কী করতে পারে!

ভারতের জন্যেই বা কী করতে পারছে! বাইরে যাবার কথাই তো ভাবছে।
সে কি শুখু ভারতবর্ষেরই সন্তান? সারা প্থিবীর নর? জন্মকালে কি সে
গোটা প্থিবীতেই ভূমিণ্ঠ হর্মান? কেবল ভারতের কোলে হয়েছে? মৃত্যু
হলে কি সে সমন্ত প্থিবী থেকেই বিদার নেবে না? কেবলমার ভারত থেকে
নেবে? তা হলে কেন আয়ু থাকতে দেশবিদেশ ঘুরে দেখবে না? কে জানে
কাদিনের পরমায়ৢ! জীবনের বিশ বছর কাটল একটিমার ভূখণেড। আর কত
কাল কাটবে!

তার বাল্য সখা হীর্ তাকে বড় ভালোবাসে। এমন দিন বায় না বে দিন দ্'জনের দেখা না হয়। হীর্র সর্বক্ষণ ভয় যে রঙ্গর ছ্বিট ফ্রিররে আসছে, সে আবার অদর্শন হবে। তাকে চোখে চোখে রাখে, রাত দশটা না বাজা তক চোখের আড়াল করে না। সেই হীর্ যখন শোনে যে রঙ্গ সাত সম্ক্রের তেরো নদী পেরিয়ে দেশদেশাশ্তর ঘ্রের বেড়াবে তখন তার মনের অবস্থা শ্রাবশের মেঘের মতো বর্ষণ উন্মুখ হয়। সে কথা বলতে পারে না, তার হয়ে কথা বলে তার বিবর্ণ মুখমশ্ভল, তার কাতর চাউনি। যখন বাণী ফিরে পায় তখন প্রশ্ন করে, "হাঁরে, রতন, তোর মা নেই বলে কি কেউ নেই যে তুই উদাস হয়ে ঘ্রের বেড়াবি বাউল দরবেশের মতো?" পাতলা ছিপছিপে ফরসা। লাজ্বক চেহারা। একট্রতেই ভয় পায়।

রত্ন তার ভীর্ বন্ধ্টিকে ভয় দেখিয়ে বলে, "কেন? বাউল দরবেশ কি মন্দ? আমি এসেছি শ্নলে ওরা রোজ আমাদের বাড়ী আসে, গান গায়, আনন্দলহরী বাজায়, আনন্দল করে। আর আমিও তো বাই ওদের আভায়। দেখি ওদের জীবন। সম্বল বলতে কয়েক রকম কয়েকটা ঝোলা আর ভিক্ষাপাত্ত আর ওই আনন্দলহরী বা একতারা। যখন এক আখড়া বাসি হয়ে গেল তখন আরেক

রয় ও শ্রীমতী

আশ্বঢ়ার চলল। সংগ্য হরতো সন্ধিনী। নরতো সন্ধিনীকে মৃত্ত করে দিরে যার, বাতে সে অপর সংগী গ্রহণ করতে পারে। নিজেও মৃত্ত হয়।"

হীরুর চোখ কপালে ওঠে। সে বকুনি দেয়। বলে, "ভদ্রলোকের ছেলে না তুই! তোর এসব ভালো লাগে! একটা মেরে, তার দশ বার দশ জনের সংগ্যে মালাচন্দন হয়েছে, এও তো আমার জানা। তেমন একটি সগ্যিনী যদি তোর কাঁথে চাপে তা ছলে সে আর নামছে না, বাছাধন। তার হয়তো আগের পক্ষের সন্তানও আছে। পিতৃপরিতান্ত। সেটিও তোর পিঠের বোঝা হবে। তার পর তোরও কি নিজের একটি হবে না? সেটিকে কার গলায় ঝ্লিয়ে দিয়ে যাবি? তোর বাপ তো দশরথের মতো মারা যাবেন প্রবিরহে।"

রক্স শিউরে ওঠে। মারা যাবেন বাবা! প্রাবিরহে! সে কি তবে নিজের জীবনটা নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে না! এ কী অত্যাচার!

"হীর, তুই তো জানিস, আমি বাপের সম্পত্তি চাইনে। রামের মতো সিংহাসন ছেড়ে দিতে চাই ছোট ভাইকে।"

"সে তো আরো বড আঘাত। বাপের প্রাণ কি তা সইতে পারে!"

রত্ন বিমর্ষ হয়। বন্ধন যে কত প্রকার আছে তার ইয়ন্তা নেই। স্নেহও এক প্রকার বন্ধন। তার বাবা তাকে সেই অদৃশ্য রক্জ্ব দিয়ে বে'ধে রেখেছেন। তার ভাইবোনরাও। কোথায় মৃত্তি! বাউল দরবেশের মতো মনের জোর থাকলে তো!

শ্রীমতীর কথা মনে পড়ল। শ্বশন্ববাড়ীতে সে নিশ্চর কিছ্ন স্নেহ পেরেছে কারো না কারো কাছে। হরতো শ্বশন্বশাশন্ডী তাকে ভালোবাসেন। সে বদি চলে বার তাঁরা কি তার জন্যে কাঁদবেন না? মারা পড়ে গেছে যে! মারার হাত থেকে মন্তি কোথায়! শ্রীমতী কি সত্যি স্বাধীন হতে পারবে! খাঁচা খ্লে দিলেও কি পারবে উড়তে!

রাজশাহী যাত্রার দিন এলো। রক্ন খবর দিয়ে রেখেছিল, তার ট্রেন যখন ঈশ্বরদি হয়ে যায় তখন নবনী ওঠে। নাটোরে অপেক্ষা করছিল হৈম। কোলা-কুলির পর তিন জনে রাজশাহীর বাস ধরল। কত কাল পরে আবার এই পথ দিয়ে যাওয়া। সব নতুন লাগছিল। দ্'ধারে তাকাতে তাকাতে গলপগ্রেজব করতে করতে চলল।

হৈম ছেলেটি মাধার খাটো। মোমের পর্তুলের মতো ফরসা ও নরম। রোজ সাবান মাথে একটি ঘণ্টা থরে, যদিও এমনিতেই থবথবে। পোশাক পরিজ্ঞা ফিটফাট ছিমছাম। কথাবার্তা চোল্ড। সব সময় তার মুখে থৈ ফুটছে। কিন্তু কথনো কারো মনে ব্যথা দের না। সৌজন্য আর লেন্হ দিয়ে গড়া।

নবনীও গোরবর্ণ। দোহারা গড়ন। দীঘল। তার মুখ্যশুজ্প স্থা ও মাজিত। কিন্তু প্রসাধনের প্রসাদে নর। এমনি। তার আচরণে ধারতা ও স্বভাবে সংঘম। তার আয়ত নেত্রে বিষাদমলিন গভারতা। সোম্য শান্ত প্রাতিকর তার ব্যক্তিয়। কিন্তু সে কাজের লোক নর। একসংখ্য বেড়াতে বেরোলে সেই সকলের পিছনে পড়ে থাকে।

বাস স্ট্যান্ডে কানন উপস্থিত ছিল। তার গোল মুখ হাসিতে খ্রিশতে আরো গোলগাল দেখাছিল। এই এক বছরে সে তালগাছের মতো বেড়েছে, চওড়াও হয়েছে কতকটা। পশ্বদের দ্বংখে কাতর বলে তার চেহারার কিন্তু কর্ণ ক্লিড ভাব নেই। যেমন গিরীনের চেহারার। মঙ্গোলিয়ান ছাঁদের চোখ নাক। হরদম সিগারেট ফুকছে। প্রাণোছল।

ওরা কাননের সংশ্যে তার কাকার বাসায় গিয়ে দেখে গিরীন কখন থেকে বসে আছে। লম্বা রোগা রোদে ঝলসানো। মুখে বসন্তের দাগ। ভ্যাবভ্যাবে চোখ। গায়ে একটা খম্পরের আলখাল্লার মতো বেচপ পাঞ্জাবী। হাঁট্র পর্যান্ত ঝ্লা। পারে ক্যানভাসের জ্বতো, রং চটা, তালি দেওয়া। কতকটা সাধ্বসতের মতো দেখতে। প্রায় মৌনী।

কোলাকুলি ও কুশলবিনিময়ের পর ওরা চা খাচ্ছে এমন সমর প্রভাত ও ললিত এসে জ্বটল। ললিত নামেই ললিত। মালকোঁচা মারা জবর জোয়ান। সব রক্ষ খেলার ওস্তাদ। লোহার মতো শস্ত ওর মাংসপেশী। লোহার মতোই কালো। চোখে চশমা। সেটার ভন্ন দশা। বোধ হয় বল লেগে। বনেদী খরের ছেলে। ভদ্র। মজলিসী।

সাত ভাই চম্পার সকলে সমবেত। এমন অর্থে দিয় যোগ অনেক দিন ঘটেনি। সাত জনের বিছানা একসম্পে পাতা হলো। একখানা ফরাস, পাশাপাশি সাতটা বালিশ। খাওরাদাওরার পর হাত পা ছড়িয়ে শ্রের কথা বেন ফ্রোতে চার না।

দ্বাত এগারোটার পর নবনী, হৈম ও গিরীন ঘ্নিরে পড়ে। রাত বারোটার পর দানন ও প্রভাত। জেগে থাকে ললিত ও রত্ন। দেরালের দিকে, এক টেরে।

রত্ন মেন এই স্বোগটির প্রতীক্ষার ছিল। বলল, "ভাই ললিত, তুমি তো জান শ্রীমতী আমাকে চিঠি লেখে। কিন্তু এত বার চিঠি লেখালেখি হলো, এখনো পরিচয় হলো না। সে কে? কার কী হয়? বেগমপুর কোথায়?"

"৫ঃ।" ললিত বিক্ষিত হলো। "তোমাকে এসব কথা জানায়নি এখনো? কীতা হলে এত লেখে?"

"সোনালী বলে সেই ধর্ষিতা মেরেটির কাহিনী। ক্লাইভ থেকে লর্ড লিটন প্রমুখ ইংরেজের দৃষ্কৃতি। বিশ্লবের আবশ্যকতা। গান্ধীজীর ব্যর্থতা। ভালো কথা, লালত, তুমি কি ওর বিশ্লববাদী মণ্ডলীর সদস্য হয়েছ?"

লালিত যেন আকাশ থেকে পড়ল। "বিশ্ববাদী! মশ্ডলী! কারা এসব রটার! ওর মশ্ডলী বলতে কী বোঝার, জান? জনকয়েক দরদী বশ্ব; ও আত্মীর। দেশের ম্বীন্তর নাম করলে ওর সংগ্যে মেলামেশা সহজ হয়। নইলে যা কড়া পর্দা! ওরা নবাবী আমলের রইস। ইংরেজ শাসনের উপর বরাবর অপ্রসমা। ইংরেজী শিক্ষার উপর ম্বলমানদের মতোই বির্প ছিল। এখনো দ্বটো একটা পাশ করলেই ঢের হয়েছে মনে করে। চাকরি তো করতে হবে না।"

রত্ন থামিয়ে দিয়ে সাধাল, 'গ্রীমতীর মাজি কার হাত থেকে? কেন?"

"ওঃ! শ্রীমতীর মৃত্তি! সেইটেই আসল। যাকে পার তাকে ধরে, মৃত্তির উপায় বল। আরে, নারীর মৃত্তি কি দেশের মৃত্তির মতো অত সহজ? এক বছরে দ্বরাজ হতে পারে, কিন্তু এক বছরে নারীর মৃত্তি হয় কখনো? দশ বছরেও কি হবার? আন্তে আন্তে পর্দা প্রথা উঠে যাবে, মেয়েরা একট্ আখট্ রাজনীতি করতে বেরোবে, ধরি মাছ না ছই পানির মতো প্রেমেও পড়বে অলপস্বলপ। তবে, হাঁ, খরগেরস্তালি স্বামীসেবা কাচ্চাবাচ্চা বাঁচিয়ে। শ্রীমতীর কিন্তু তর সয় না। সে দেশের মৃত্তি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবে। যার আশায় ঝাঁপ দেবে তেমন প্রের্ষোক্তমই বা কোখার!"

"কিম্তু কেন মুক্তি চায় তা তো বললে না?" "তা হলে গোড়া থেকে বলতে হয়। রাত হয়েছে। শোবে না?"

"রাত হয়েছে বলেই তো স্বিধা। কেউ শ্বনতে পাবে না। বল।" তখন ললিত বলে গেল শ্রীমতীর ইতিবৃত্ত।

ওদের বাড়ী গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর। আগে পলাশীর কাছে ছিল। ওর বাবা জমিদারি থেকে যা পান তাতে কুলোর না। জজ কোটে ওকালতী করেন। মেরেকে ইম্কুলে দিয়েছিলেন, তার পর বাড়ীতে মাস্টার রেখে পড়াতেন। কলকাতায় পড়ত বড় ছেলে শ্রীশেষপ্রতাপ। সে এক দিন তার বম্প্র অনুপকে নিয়ে এলো অতিথি রুপে। অনুপ এখন একজন বিখ্যাত স্বরোদী। তথনি তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিম্কু টাকার জন্যে তো বাজাত না। ঘরে টাকাও ছিল না। তা ছাড়া ওরা দত্ত। এরা সিংহ রায়। তাই শ্রীমতী যখন ওকে বিয়ে করবে বলে চিঠি লিখল তখন ওর বাবা অশেষপ্রতাপ ক্ষেপে গিয়ে ওর অন্যর বিয়ে দিলেন। যাঁর সংশ্য বিয়ে তিনি বেগমপ্রের রাধামাধ্য ফৌজদারের প্রে যশোমাধ্য। যাঁর ছোট এক বোন সুশীলা ললিতের বৌদি। বেগমপ্রের কোথায়? লালবাগের কাছে।

বিয়ের কিছ্র দিন পরে কী যে ঘটল স্বামীস্থাতে, শ্রীমতী বাপের বাড়ী থেকে ফিরতে চাইল না, সোজা বলে বসল স্বামীর ঘর করবে না, ও নাকি স্বামীই নর । বাপমা কেন শ্রনবে? বিয়ের পর বাপমা'র কী অধিকার? স্বামীই সর্বাধিকারী । যার সম্পত্তি তাকে ফেরৎ পাঠাল । শ্রীমতী এসে দেখে যশোবাবর তাঁর প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীর বিধবা দিদি স্বধাকে আনিয়েছেন তাঁর রুগ্ণা জননীর সেবিকার্পে । শ্রীমতীর জন্যে অন্য মহল বরাদ্দ হয়েছে । তখন ও মেয়ের যা রাগ! থাকতেও পারছে না, ফিরতেও পারছে না । আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, গণগাস্নান বারণ হলো । এর পরে ওর খুব অস্থে করে । সারে না । তখন ওরই ইচ্ছায় ওকে পাঠাতে হলো ওর মামার বাড়ী ভাগলপ্রে । মামার নাম ময়্রবাহন সিং । রইস ও অনরারি ম্যাজিস্টেট । শ্রীমতীর জন্ম তাঁর বাড়ীতেই । ছেলেবেলাটা ভাগলপ্রেই কেটেছে । ওখানে গিয়ে অস্থ সারতে দেরি হলো না, জন্মস্থানের জলহাওয়া মান্বকে খুব সাহায্য করে । শ্রীমতী ওখানে রয়েই গেল শরীর ফেরাবার নাম করে । এক বছর যায়, এমন সময় সে ওখানেও বাধিয়ে বসে এক কাণ্ড ।

বহু ও শীমতী

বাড়ীর ভান্তারের সংশ্যে প্রেম। জানাজানি হতে বাচ্ছে, হলে প্র্যাকটিসটি মাটি। তাই ডাক্তার চোখ বুজে বিয়ে করে ফেললেন আরেক জনকে।

তখন শ্রীমতীর দশা রাই উন্মাদিনীর মতো। তার মামা তাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়তেন, বদি না রাধামাধববাব, অগ্রসর হয়ে তাকে বেগমপ্র নিয়ে যেতেন। যশোবাব, হঠাৎ বিলেত চলে যান প্রলিশের নজর এড়াতে। ভদুলোক অসহযোগ আন্দোলনে বিলিতী কাপড় প্রড়িয়েছিলেন, বিলিতী মদের বোতল ভেঙেছিলেন। যদিও কাপড়গুলো তাঁরই, বোতলগুলোও তাঁর নিজেরই। স্থা শ্রীমতীর পা ধরে মাফ চায়, শ্রীমতীর মহল শ্রীমতীকে ছেড়ে দেয়, নিজে ঠাকুরঘরে আশ্রয় নিয়ে রাতদিন প্রার্থনা করে যশোবাব,র মঞ্গলের জন্যে। এ হলো সত্যিকারের প্রেম। যে যাই বল্ক এ প্রেম নিছক কায়িক স্থ নয়। শ্রীমতী তার স্বামীকে কায়িক স্থ দিলে স্থাকেও স্থ দিতে হতো না। স্থাও রকম মেয়েই নয়। দ্বজনের ভিতরে একটা প্রীতির সম্বন্ধ বরাবরই ছিল, সেইজন্যে যশোবাব, শ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাননি। সেটাকে রতির সম্বন্ধ হতে দিল কে? শ্রীমতী স্বয়ং।

যাক, যা হবার তা তো হরে গেছে। ভূলে গেলেই হর। শ্রীমতী কিন্তু কিছুতেই ভূলবে না। আড়াই বছর যশোবাব্ বিলেতে ছিলেন, সেই স্বযোগে শ্রীমতী রাজনীতিক্ষেরে স্থান করে নেয়। অলম্কার খুলে দেয় গাম্পী মহারাজকে। তার পর শ্বশারকে জিতিয়ে দেয় লোকাল বোর্ডের নির্বাচনে। এক চালে বাজী মাং। শ্বশার তার কাছে কৃতস্তা। বাড়ীর পর্দা বজায় রেখে তিনি তাকে মেলামেশার স্বাধীনতা দিলেন কয়েকটি বাছাবাছা কমীর সঙ্গে। এরা আসে প্রকাশ্যে ভারত উম্পারের জন্যে। গোপনে শ্রীমতী উম্পারের জন্যে। কিছুতেই ও মেরে স্বামীর ঘর করবে না। ললিতও এ দলে ভিড়েছিল। শ্রীমতীর প্রতি তার সহান্তুতির কারণ ছিল এই যে, বিলেত থেকে ফিরে ওর স্বামী স্থাকে নিয়ে থাকেন, স্থাকে দিয়ে যদি কিছু উম্বৃত্ত থাকে তবে শ্রীমতীর জন্যে সেইট্কুই মজত্ব। উচ্ছিন্ট ভোগ করতে কোন স্থী রাজী হয়! বিশেষত শ্রীমতীর মতো তেজী মেয়ে!

এক দিন ললিত ওকে সোনালীর জন্যে কিছু করতে বলেছিল। সেইস্তে

সোনালীর কাহিনী শোনাতে হর। তার থেকে এলো সাত ভাই চন্পার কথা।
রত্নর নাম। প্রভাতের নাম। প্রীমতীর 'মন্ডলী'তে বারা ছিল তারা রাজনীতির
দীক্ষা নিয়েছে। সমাজ অপেক্ষা করতে পারে, রাজনীতি করবে না। তা হলে
সোনালীর জন্যে কিছু করতে হলে সাত ভাই চন্পাকেই বলতে হয়। নবনী-হৈমর
বিয়ে হয়ে গেছে, গিরীন তো কলির ভীত্মদেব। লালত রাজনীতির দিকে
ঝ্রেছে। কানন এখন পশ্দরদী, নারীর জন্যে তার দরদ নেই। অন্তত তাই
তো সে বলে। বাকী রইল প্রভাত ও রত্ন। এদের দ্বেজনের মধ্যে রত্নই বেশী
নরম। এ কথা শ্রনে রত্নকে চিঠি লেখে প্রীমতী।

ঘ্রমে চোথের পাতা জরুড়ে আসছিল, কিন্তু ঘ্রমের ঘোরকে অতিক্রম করেছিল গল্পের নেশা। আবার কবে কোথায় দেখা হবে, এমন সুযোগ মিলবে!

রত্ন জিজ্ঞাসা করল, "শ্রীমতী কেন বাপের বাড়ী ফিরে গিয়ে লেখাপড়া শেষ করে না? তার পরে কোনো রকমে স্বাবলম্বী হয় না?"

"ওঁরা সাফ বলে দিয়েছেন যে সন্তানসম্ভাবনা ভিন্ন অন্য কোনো উপলক্ষে ওঁদের ওখানে যাওয়া চলবে না। গেলে মুখদর্শন করবেন না। ফেরৎ পাঠাবেন তৎক্ষণাধ।"

"তা হলে মামার বাড়ী? ভাগলপুর?"

"সেখানে গেলে ডাক্তারটির মুখদর্শন করতে হবে। শ্রীমতীর সেটা অসহ্য।" "তা হলে আর কোনো আত্মীরস্বজনের বাড়ী? মাসী পিসী খুড়ীর?"

"কেউ সাহস পায় না ওকে ডাকতে বা রাখতে। ও ষেখানে বাবে রোমান্স ওর সন্গে সন্গে যাবে। ওর দোষ কী! ওর সৌন্দর্যের দোষ। যেই দেখে সেই মুশ্ধ হয়।"

রত্ন ক্লাম্ত হরে বলল, "তা হলে উপার? তোমরা ওর মন্ডলীর সভ্যরা কীবল?"

"ও যদি মনঃস্থির করতে পারত আমরা যা হয় একটা উপায় খংঁজে বার করতুম। কিন্তু ওর নিজের মতি স্থির নেই। মৃত্ত হতে ও বম্পর্ণারকর, কিন্তু মৃত্তির জন্যে কী মৃত্যা দেবে, না আদৌ দেবে না, এই নিয়ে ওর অন্তহীন ভাবনা

ও আমাদের অশ্তহীন মাথাব্যথা। ওর আবার স্বাইকে সন্দেহ। আমাকেও ই যেন অমি ওর গারে হাত দিতে উদ্যত।"

সাত

ভোর বেলা যাদের ঘুম ভাঙল তাদের হৈ চৈ শানে আর সকলের ঘুম ছাটে গোল। রত্ন আর একটা স্বশ্ন দেখত, কিন্তু নবনী সার করে আব্তি শারে করে দিল—

"হে পদ্মা আমার,

তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।"

চলল সাত জনে চা খেয়ে পদ্মা দর্শনে। শরতের নদীতে বন্যাবেগ নেই। তব্ব তার প্রসার বহু দ্ব। চেনা চর অদৃশ্য। অচেনা চর মাথা তুলছে। নোকো চলেছে কত রঙের পাল উড়িয়ে। স্টীমারের ধোঁয়া দিগন্তে।

বাঁধের এক জায়গায় ওরা আসন নিল। অতীতে সেইখানে ছিল ওদের সান্ধ্য পরিক্রমণের সময় বিশ্রামঘাট। সেইখানে বসে সাত ভাই চম্পার তর্ক বিতর্ক জলপনা কল্পনা গল্প সল্প চলত। এখন আর কেউ সেখানে বায় না।

রত্নর মনে পড়ছিল তখনকার দিনের পার্ল বোনটিকে। সকলের সব কথা-বার্তার আড়ালে সোনালী প্রচ্ছর ছিল। কেউ মুখে আনত না তার নাম। কিন্তু মনে মনে সকলেই জানত যে সোনালী যত দিন বিন্দনী তত দিন তারা স্বাধীন নর, তাদের উপর উন্থারের দার। পার্ল না থাকলে সাত ভাই চম্পা থাকে না। সে-ই ষেন সাত জনকে এক ডোরে বে'ধেছে। বাঁধন ছি'ড়লে তারা সাতটি একক, কিন্তু সাত জন মিলে সপ্তক নয়।

সোনালী এই শহরেই আছে। তার রাত কাটছে কী বীভংস শয্যায়! দিন কাটছে কী গভীর লম্জায়! কোনো দিন কি তার ভাগ্যপরিবর্তন হবে! পার্লের বখন এই দশা তখন সাত ভাই চম্পার ভবিষ্যৎ ভেবে কী ফল? নির্নাতই যদি সব তবে পরিকল্পনার ভাণ কেন? কী করে জানলে যে তোমাকেও ঘটনাচক্রে সোনালীর মতো অবস্থায় পড়তে হবে না? একই অবস্থায় নয় অবশ্য। কিন্তু

প্র্যুবও তো সমাজে পতিত হয়। রাজন্বারে দাগী হয়। কত রক্ষ অত্যাচারে তার আদ্যা তেওে বায়।

সোনালীর প্রসশ্গ উঠতেই হৈম উচ্ছবিসত হরে বলল, "কবে সোনালীর জন্যে কীই বা করেছিলুম, এখনো ম্যাজিস্মেট সাহেবের ব্যুড়ো জমাদার পথেঘাটে সেলাম করে। ওরা জানে কাজটা আমরা নিঃস্বার্থভাবে করেছিলুম। হেরে গিরেও আমরা জিতে গৈছি।"

কিন্তু আর কারো উৎসাহ লক্ষিত হলো না। কথাটা ঐথানেই সাপ্য হলো। বাসায় ফিরে গিয়ে তারা বৈঠক করল। বৈঠকের বিষয়: কে কোনখানে ছিল, কোনখানে এসে পেণছৈছে, মানসিক পরিস্থিতিটা কী। রত্ন বা বলল তার সার মর্ম—

সে ছিল্প বিদ্রোহী, এখনো তাই আছে, অধিকন্তু হয়েছে মরমী। বিদ্রোহী চায় ওমর থৈয়ামের মতো এই বিশ্রী খাপছাড়া বাস্তবটাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ন্তের মধ্যে এনে নির্মামভাবে ভেঙে ট্রুকরো ট্রুকরো করতে। অথচ মরমীর চোখে মায়া অঞ্জন আঁকা। ওই চোখ দিয়ে সে যাই দেখে তাই স্কুদর। কেন তা হলে ভাঙবে! কাকেই বা ভাঙবে!

এই সব নয়। এক হিসাবে যেমন সে বিদ্রোহী তথা মিশ্টিক আরেক হিসাবে তেমনি লীলাবাদী তথা নাইট। তার জীবনটা হবে তার লীলা। বাঁচবে সেলীলাকুশলের মতো। মরবে যখন তখন যেন প্রতায় হয় যে লীলা করে গেল। যা কিছু করবে তা যেন সলীল হয়, স্বতঃস্ফৃত হয়। কিশ্চু কঠিন কিছু করতে না পারলে সে বাঁচতে চায় না। বীরত্ব বিনা জীবন অসার। সকলের কাছে সেবীরত্ব প্রত্যাশা করে, নিজের কাছে সব চাইতে বেশী।

এও সব নয়। সে ইতিহাসের একজন তথা চিরকালের একজন। বিবর্তনের শোভাষান্রায় আর সকলের সংখা সেও আছে, সেও পৃথিবীকে প্রত্যহ বদলে দিচ্ছে। অথচ সে স্বকালের উধের্ব। য্গায্গাস্তর তার কাছে কিছ্ব নর, লক্ষ লক্ষ বর্ষ ষেন কয়েকটি নিমেষ। কেন তা হলে এত ত্বরা সামাজিক বা রাজ্ঞিক পরিবর্তনের জনো? এক দিন যা হলো না অন্য দিন তা হবে।

এই কি সব? না, আরো আছে। সে কেন্দ্রাভিম্খ তথা কেন্দ্রাতিগ। সে

সব বেশ দেখবে, সব মানুবের পরিচর নেবে, সব বিদ্যা অধিগত করবে। দেশে গৈরে ঘরে আছে, ঘরে ঘরে তার ঠাই আছে, কোথাও সে পর নর, পরদেশী নয়। তা হলেও সে কোথাও একঠাই ঘর বাঁধবে, বনস্পতির মতো শিকড় গাড়বে। অরশ্যে অথবা গ্রামে, যেখানে সভ্যতার কলরোল পেশিছর না। কোনো এক নারীয়ালগে, যে আলো হাওয়া আগ্রনের মতো এলিমেন্টাল। প্রকৃতির কন্যা। প্রকৃতির হাতে গড়া। অকৃতিম।

শরিশেবে রত্ন হচ্ছে স্বাধীন মানব তথা প্রেমিক প্রের্ব। স্বাধীন বে সে তার স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কিছ্ কামনা করে না। স্বাধীনতার জন্যে আর সব বিসর্জন দেয়। প্রেমিক যে সে প্রেমিকার জন্যে আপনাকে উৎসর্গ করতে পারত্বে বাঁচে। বিনিময়ে তার কোনো দাবী নেই। যদি কিছ্ পায় কৃতার্থ হয়। না পেলে নীরব থাকে।

এই যে অন্তর্ম্পন্ধ এর থেকে তার পরিবাণ নেই। পরিবাণের পন্থা খাজছে। সে তো রণছোড় হতেই চার, কিন্তু রণ যে তাকে ছাড়তে চার না। কমলী নেহি ছোডভী।

বৈঠকের পর এক সময় প্রভাত বলল, "আমি তোমার এত কাছে থাকি। কই, এসব তো এত দিন শ্নিনিন? হাঁ, মিস্টিকের মতো কথা শ্নেছে মনে পড়ছে।"

তখন রম্বর মনে পড়ল রান্কে। একান্তে স্থাল, "প্রভাত, রান্ফেমন আছে?"

"ভালো। রান্ কি আর সে রান্ আছে! মা হতে চলল।" স্নি•ধ হাসল প্রভাত।

শানে সাখী হওয়া দারে থাক, হকচকিয়ে গোল রক্ন। তার বাকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। বলল, "দেখা হয়েছে?"

"হাঁ, এই তো সেদিন। খালাস হবার জন্যে বাপের বাড়ী এসেছে। মুখে স্বগীর আভা। চিরন্তন মাতৃত্বের আলেখ্য। চোখ জ্বড়িরে বার দেখে। এই তো আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের কল্যাণী নারী।" প্রভাত যখন ভাবপ্রবণ হয় তখন হাস্যকর হয়।

রত্ন ও শ্রীমতী

রশ্বর ভিতরকার মিশ্টিক কোথার তালরে গেল, বিদ্রোহী কণা তুলল। উক্ হয়ে বলল, "যে কোনো বাঁড়ের সংগ যে কোনো বকনাকে জ্বটিয়ে দাও। দেশবে সনাতন মাতৃষের চিত্র। আমাদের পরম প্জনীয়া গোমাতা। কিন্তু নারীকে এর মধ্যে পাবে না। প্রভূকে 'না' বলতে পারে না যে সে নারী নয়। রান্ত্র নারীম্ব বলতে কডটুকু অবশিষ্ট রইল তাই বল।"

প্রভাতও ব্যথা বোধ করছিল। কিন্তু সেই সঞ্চো ফর্তি। রান্র জন্যে তার কেরিয়ার মাটি হতে যাচ্ছিল। কেরিয়ার গেলে প্র্যুখমান্ধের আর কী থাকে! কেরিয়ার হচ্ছে প্র্যুখার্থ। পোর্য। প্রভাত খ্ব বে'চে গেছে। আর রান্ত তো একটা অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেলো। মৃত্যু ঘটত। তার বদলে মাতৃত্ব ঘটছে।

প্রভাত গদগদ স্বরে বলল, "ভগবান যা করেন তা মণ্গলের জন্যে। কে জানে রান্বর গভে কোন মহাপ্রেষ জন্মগ্রহণ করবেন! যাঁর জন্যে তারকবাব্রে পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল।"

রত্ন প্রায় ক্ষেপে গেল। শেলষের সংগ্যে বলল, 'বাঁর জন্যে প্রভাতবাব্র পিতৃত্বের প্রয়োজন ছিল না। তুমি দেখছি দৈবজ্ঞ। কার অংশে কে জন্মাবে তাও তোমার নখদপণি।"

প্রভাত তাকে শাশ্ত করতে চেণ্টা করল। "ভাই রতন, তুমি বাই বল না কেন, মেরেরা আদিকাল থেকে এই ভাবেই মা হরে এসেছে, এই ভাবেই হতে থাকবে। পশ্ক থেকেই পশ্কজ হয়। পশ্বতিটাই পশ্কিল। আমার সংগ্য বিয়ে হয়ে থাকলে মিলন হয়তো স্থের হতো। কিন্তু স্কার হতো কী করে বলব? মাতৃত্বট্রকুনই স্কার। তার আগে বেটা বায় সেটা বিশ্রী। প্রেম দিয়ে তার শোধন হয় না।"

রত্ন কখনো একসংশ্য এতগুলো অসার উত্তি শোনেনি। তাও প্রভাতের মতো মান্বের মুখে। ক্ষণকাল হতবাক হয়ে রইল। তার পর ধারে ধারে বলল, "তোমার কথা যদি যথার্থ হয় তা হলে সোনালার জন্যে আমরা বৃথা মন খারাপ করেছি। তার বিয়ে দিলেও তার স্বামীর সংশ্য সে পাঁক ঘাঁটত। যে তাকে ভালোবাসে এমন কারো সংশ্য বিয়ে হলেও তার বরাতে ছিল পিৎকলতা। পার্থকা শুধু এই যে সে একদিন মা হতে পারত। একবার মা হতে পারলে তার পর

সব কুট্টীতার অবসান। কিন্তু প্রভাত, তোমার কথা যদি মেনে নিই তা হলে ' স্বীকার করতে হয় হৈ, End justifies Means."

এই নিয়ে দর্ট বন্ধন্তে কথা কাটাকাটি হলো। রক্সর কথা হচ্ছে, পন্ধতিটা প্রেমিকের হাতে লীলা। তার আদি অন্ত স্কুন্দর। ফল যেমন স্কুন্দর ফ্লেন্ড তেমনি। বরং ফ্লেন্র সপো সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ফলের চেয়েও বেশী। ফলের মধ্যে একটা ইউটিলিটির ভাব আছে, একটা প্রয়োজনীয়তার। ফ্লেন্র মধ্যে বিশক্ষ বিউটি, অহেতুক সৌন্দর্য। নরনারীর মিলন নিয়ে কত কাব্য কত রোমান্স হয়েছে। মিলনের ফল নিয়ে তার শতাংশও নয়।

আর প্রভাতের কথা হচ্ছে, সোনার সংশ্য বেমন খাদ মেশানো থাকে তেমনি প্রেমের সংশ্য কাম। এই মিশালট্নুকু আবশ্যক। এ না হলে স্থিতপ্রবাহ স্তশ্ধ হয়ে যায়, প্রাণ নির্বংশ হয়। একে যায়া অনাবশ্যক বলে তায়া সমষ্টিগত নির্বাগবাদী। অপর পক্ষে একে আবশ্যক বলে মাথা পেতে নিলেও মাথা হেণ্ট হয়ে যায় এর কুর্প দেখে। কুর্পকে স্র্র্প বলা মনকে চোখ ঠায়া। এর থেকে সোন্দর্য আসে তর্খনি যখন স্থিতপ্রবাহ মন্ত হয়, প্রাণ অনির্বাণ হয়। আঁধার থেকে আলো আসে বলে আঁধার স্নুন্দর নয়। আলোই স্নুন্দর। পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব থেকে বিষ্কৃত্ব হলে এর মধ্যে কেবল শ্লানি, কেবল ক্রেদ। তা সে বিবাহিত জীবনেই হোক আর বিবাহের বাইরেই হোক। প্রেম এর জন্যে লচ্ছিত। অপ্রেম তো নির্লেজ্ঞ দ্বকানকাটা। প্রেম যদি শ্রুম্ম হতে পারত তা হলে কত ভালো হতা! কিল্তু দেহধারণ করে দেহী হয়ে শ্রুম্ম প্রেম কন্পনা করা যায় না। কল্পনার মধ্যেও মিশাল থাকে। বরং মা হয়ে বাপ হয়ে এর ভিতরকার অশ্রুম্ম ক্ষর করে ফেলাই ভালো। রান্বর জীবনে সেটা সম্ভব হলো। প্রভাতের জীবনেও কি হবে না? পরস্পরের সাহায়ে নয়। এই যা দ্বঃখ।

রত্ন বলে, "আমার যদি সন্তান হয় সে হবে প্রেমের সন্তান। তার জন্মরহস্য পান্দকল নয়, পরতে পরতে স্কুন্দর। এখানে উন্দেশ্য ও উপায় এক ও অভিন্ন। এমনভাবে অবিচ্ছিন্ন যে কেউ বলতে পারে না কোনটা উন্দেশ্য ও কোনটা উপায়। সেইজন্যে বলতে হয় প্রেমই প্রেমের উন্দেশ্য। একটা সন্পূর্ণ পদক্ষেপ। তার মধ্যে অপত্যকামনা নেই, যদি থাকে তো এমন গভীর ভাবে নিহিত যে মনেরও

রঙ্গ ও শ্রীমতী

অগোচর। সকলের কি সন্তান হয়? যাদের হয় না তারা কি তা বলে অন্ধকার থেকে আলোকে আসে না? অন্ধান্ধ কয় করে নাশিং লাভ করে না? অন্ধকার যাকে ভাবছ তাও উল্জ্বল। অন্ধান্ধ যাকে বলছ তাও শ্রেখ। এর মধ্যে লক্জার বিদ কিছ্ব থাকে সেটা হচ্ছে জোর খাটানো। আমি তো কোনো মেরের উপর জোর খাটাতে যাব না। বিরের মন্ত্র পড়লেও না। কেন তবে আমি লভ্জিত হব?"

প্রভাত দৃষ্টৃ হাসে। কেন হাসছে বলে না। পীড়াপীড়ি করলে বলে, "তুমি তো কোনো মেরের উপর জোর খাটাতে বাবে না। কেননা জোরে তার সংগ্যে পারবে না। কিন্তু সে যদি তোমার উপর জোর খাটাতে বার? তখন?"

রত্ন ষেন আকাশ থেকে পড়ে। এও কি কখনো সম্ভব!

"তোমার চেয়ে আমি বরসে দ্বছরের বড়। সে দ্বছর আমি নন্ট করিনি। সংস্কৃত পড়ে ব্যাকরণতীর্থ হয়েছি। কাব্যতীর্থ হবার যোগ্যতা রাখি। ওদের চিনতেন আমাদের আর্য খবিরা। তাঁরা ছিলেন বহুদশী প্রের্ব। বহুবিবাহ থেকে বহুদশিতা জন্মায়, তা তুমি মানবে না যদিও। বহুদশীরা কী লিখে গেছেন, জান?"

রত্ন অস্ফাট স্বরে বলে, "কী?"

প্রভাত তেমনি অস্ফাট স্বরে বলে, "অন্টগাণ।"

কিসের অন্টগ**্**ণ, কার অন্টগ**্**ণ সে ভেঙে বলে না। হাসে। সে যত হাসে রম্ব তত রাগে ও রেঙে ওঠে।

"সংস্কৃত ভাষার," প্রভাত হেসে বলে, "অবলা বলে কোনো শব্দ নেই। ওটা দেশজ। অবোলা থেকে অবলা। ওরা কথা বলে না, সেটা ঠিক। কিন্তু ওদের বল নেই, এটা ভূল। মহাশক্তিস্বর্ণিণী ওরা। মহাভারতে একটিও দর্বল স্মীচরিত্র নেই।"

রাদ্রে শারিত অবস্থার আবার যখন বৈঠক বসল প্রভাত একটা প্রোগ্রাম দিল। ধর্মের মনুখোশ এটে বহনু লোক স্বার্থ সিম্পি করছে। এদের মনুখোশ খনুলে ফেলতে হবে। সনুস্থ মানন্থ কি 'স্বাস্থা' 'স্বাস্থা' করে চে'চার? তা হলে এরা অত 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে ছাদ ফাটার কেন? তার পর শাস্ত্র বলতে কেবল ধর্মশাস্ত্র বোঝাত না। অর্থ শাস্ত্রও বোঝাত, কামশাস্ত্রও বোঝাত। এরা সে তথ্য

বেমালন্নে চেপে যার। কথার কথার শালের দোহাই দিতে বদি হর তবে শ্বের্ধ্বর্ধানিকার দোহাই কেন? অর্থানিকার কেন নর? কামালালের নর কেন? অর্থানিকি চারে দোহাই দেওরা বা দোহাই মানাও ঠিক নর। বিচারের অধিকার সব মান্বের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার দাবী করতে হবে, প্ররোগ করতে হবে। জনগণকে অধিকার-সচেতন করতে হবে। দীর্দ্ধালা ভাদের অচেতন করে রাখা হয়েছে। সেইজন্যে তারা অত স্হজে পরাধীন হতে পেরেছে। পরাধীনতার প্রতিকার সচেতনতা। চরকারাং নৈব নৈব চ। চরকা কেটে দেশ স্বাধীন হবে না।

এমনি করে রাজনীতি এসে পড়ল। কেউ প্রতিবাদ জানাল, কেউ সাধ্বাদ। লিলত নিয়ে এলো বিম্লববাদ। আর কাননের যা স্বভাব। সে রিভলভার পর্যস্ত এগোল। তখন ফরফর করে বলে গেল হৈম, "চার দিকে ধরপাকড় চলছে। স্ভাষ বোস গ্রেম্তার। একট্ ব্যুঝে স্থাব কথা বলতে হয়।"

নবনী ফিসফিস করে বলল, "কি হে, কানন, তুমি কি আমাদের ধরিয়ে দেবে বলে এখানে ডেকে এনেছ?"

সবাই একদম চুপ। ছইচ পড়লেও শোনা বেত। দেয়ালেরও কান আছে। তার পর কখন এক সময় কথাবার্তা শ্রুর হরে গেল হালকা বিষয়ে। বন্ধাদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়নি তাদের নাম কাগজে লিখে ভাঁজ করে লটারি করা হলো। যার নাম আগে উঠবে সেই বিয়ে করবে আগে। নাম উঠল ললিতের।

ললিত কব্ল করল যে তার বিরের সম্বন্ধ হচ্ছে। কোনখানে? না বেগমপন্রে। কার সংগে? না যশোবাব্র সব চেয়ে ছোট বোনের সংগে। মেরেটি দেখতে শানতে বেশ। কিন্তু বন্দু কচি। ললিতের নিজের মত নেই।

এর থেকে এলো বেগমপ্ররের গলপ। কিন্তু সে কেবল রম্বর সংগ্য লালিতের।
আর যারা ছিল তাদের আগ্রহ ছিল না, তাদের কেউ ঘ্রিমরে পড়ল, কেউ অন্য
বিষয়ে আর কারো সংগ্য কথা বলল। প্রভাত ছিল রম্বর অপর পাশে।
শেষপর্যন্ত দেখা গেল তারাই দ্ই বন্ধ্ব জেগে। আর সকলে ব্রিমরে। রম্ব
জানত না যে আগের রাত্রেও প্রভাত জেগে ররেছিল ও সমস্ত শ্বেনছিল।
রম্বর কানে কানে প্রভাত বলল, "রতন।"

অন্যমনস্ক ভাবে রত্ন বলল, "কী?"

'জান তো, ও মেরে অণ্নিসম্ভবা। আগনে নিরে খেলতে বোরো না। হাত পঞ্জবে। মুখ পঞ্জবে। আমার ভর হয় ললিতের গায়ে ওর আঁচ লেগেছে।"

"ও আমার আত্মার বোন। ওর সম্গে আমার অন্য সম্পর্ক। সোনালী ছিল আমাদের সাতজনের বোন। শ্রীমতী শুর্ধ্ব আমার একার। ওকে বাঁচাতে হবে।"

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "একবার পরাজিত হরে তোমার শিক্ষা হলো না, রতন! আবার পরাজয় বরণ! সোনালীর বেলা তব্ আশার আলো ছিল। সে কারো সম্পত্তি নয়। সে কুমারী। প্রীমতীর বেলা নিরাশার আঁধার। সে তার স্বামীর সম্পত্তি। গোটা সমাজটাই তার স্বামীর পক্ষে। যে বার সম্পত্তির কথা ভেবে স্বামীকেই সমর্থন করে, তাকে নয়। যে দ্বারার জন দরদ দেখায় তারা কপট মিত্র। তাদের রাজনৈতিক দাবাখেলায় সেও একটি ঘ্রটি। আর সেও এমন মেয়ে যে চার দিকে এক পাল বেটাছেলে না ঘ্রলে জীবনে স্বাদ পায় না। তুমি কি তার সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ হবে?"

ভাববার কথা। রত্ন বলল, "আমি আমার আপনার কক্ষচ্যুত হয়ে আর কারো কক্ষসাৎ হব না। নিজের কক্ষে স্থির থেকে যেট্রকু উপকার করতে পারি, করব। তুমি তো জান, আমি তাকে চিনতুম না। তুমিই চিনিয়ে দিলে। আর সেও আমাকে চিনত না। লালিত চিনিয়ে দিল। তোমরা দ্ব'জনে চিনিয়ে না দিলে আমাদের দ্ব'জনের চেনাশোনাই হতো না।"

প্রভাত বলল, "তা বলে তুমি মালাদিকে ভূলে যাওনি তো?"

তখন রক্ষর খেয়াল হলো যে সে পূর্ব রাত্রে মালাদির ধ্যান করেনি, যেমন করে থাকে প্রতি রাত্রে। প্রভাত স্মরণ করিয়ে না দিলে ধ্যান করত না সে-রাত্রেও। তার ধ্যান জুড়েছিল শ্রীমতী। তার আত্মার বোন। তার একার বোন।

"না। ভূলে যাব কেন? মালা আমার জপমালা।" এই বলে রন্থ মালা জপ করতে লাগল।

ঘ্ম আসছিল না দ্'জনের একজনেরও। রত্ন বলল, "তুমি তা হলে স্থী হয়েছ রান্ব মাতৃপ্রতিমা দেখে? হবে না কেন? তুমি বে তলে তলে প্রতিমাপক্তেক।"

প্রভাত বাণবিশ্বের মতো আর্ত কণ্ঠে বলল, "স্থী হব! আমি কি প্রের নই! প্রের্থ মান্ধের পক্ষে এত বড় অপমান আর আছে!"

রার এর অর্থ অনুধাবন করতে পারল না। নীরব রইল। প্রভাত তথন ঝড়ের মতো শ্বসিত হয়ে হু হু করে বলে গেল, "নারী যদি পুরুষের জন্যে মরতে না পারল তবে তার প্রেমের মূল্য কী! প্রেম কি শুধু প্যাশন! আমার প্রেমে রানু যদি একদিন মরে যেত আমি তাকে সারা জীবন সতীর মতো কাঁধে করে বেড়াতুম। মা হতে যাচ্ছে, বেশ। সেও বাঁচুক, আমিও বাঁচি। এবার আমিও প্রেমে পড়ি, বিয়ে করি। আমারও ছেলেমেয়ে হোক।"

রান্র পক্ষ নিয়ে রত্ন দ্'এক কথা বলতে প্রভাত ফোঁস করে উঠল। "যারা হাসতে হাসতে জহরত্রত করত ও তাদেরি দেশের মেয়ে। ওর কাছে আমার প্রত্যাশা তেমনি কঠোর। আমি যদি ওর স্বয়ংবৃত পতি হয়ে থাকি তবে আমার জন্যে জহরত্রতই ওর ধর্ম। এত দিন আমি চোখ বুজে থেকেছি, এখন তো কোনো উপায় রইল না আত্মপ্রতারণার। তুমি তো জান আমি চন্দিশ ঘণ্টা কেমন ব্যাপত রাখি আপনাকে। বয়স্যদের সঙ্গের রুষের কথা বলি মনের ভার হালকা করতে। তা ছাড়া আমার ব্যসন বলতে কিছ্বু নেই। কাজ। কাজ। কাজ। আমার এই রুদ্র তপস্যার শেষ ফল কী দাঁড়াল! দুর্বলা নারী যথারীতি পতিরতা হলো। আমার মতে পত্যন্তরগ্রহণ করল। My friend, I have been rejected."

বলিষ্ঠ প্রেষ্ ভিতরে ভিতরে ভাঙছিল। রত্নর হ্দর মথিত হতে থাকল।

পরের দিন সত্যি সত্যি বাদ এসে পড়ল। খোঁজ করল সাত সাতটি তর্ণ কী করতে জমায়েং হয়েছে কলেজের ছ্র্টির সময়। প্রিলশের লোক পিঠ ফেরাতে না ফেরাতে ললিত হাওয়া হয়ে গেল।

প্রভাত মন্তব্য করল, "ললিতটা উপরচালাক। যে কোনো দিন ধরা পড়বে।"

রত্ন বিমর্যভাবে বলল, "ওর মোচাকের মক্ষিরানী কি বাদ যাবেন?"

কানন প্রশ্ন করল, মক্ষিরানীটি কে? খুলে বলতে হলো তাঁর নাম। দেখা গেল সবাই তাঁর নাম জানে। বদিও জানে না কবে তিনি বিস্লববাদিনী হলেন।

বৈঠক এর পর জমল না। গিরীন বেরিয়ে গেল রোগী দেখতে। প্রভাতের প্রেণিয়ায় কাজ ছিল। নবনী ও হৈম উতলা বোধ করছিল তাদের বাড়ীর লোক তাদের ধরপাকড়ের ভয়ে উৎকিণ্ঠত ভেবে। রত্নর মাধায় ঘ্রছিল তার অনুপশ্বিতিতে শ্রীমতীর চিঠি কার হাতে পড়বে। কানন আর কী করে! আবার বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এলো। র্মাল ওড়াল। কথা রইল আবার বড় দিনের সময় মেলা যাবে। এবার শান্তিনিকেতনে।

সেই দিনই রত্ন বাড়ী পৌ'ছে দেখল চিঠি এসেছে ঠিক, কিন্তু শ্রীমতীর চিঠি নয়। দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছে বিদ্যাপতি। তার সংগ্য গোঁজা কয়েকখানি ফোটো। অঞ্জনের তোলা। সিঞ্চলে স্থোদয়। টাইগার হিল থেকে মাউণ্ট এভারেস্ট। কাগুনজংঘা।

জগতে এমন অপ্র সোন্দর্য রয়েছে, কিন্তু ক'জনের ভাগ্যে ঘটবে এর সংশা শ্রুদ্বিট? জানতে চেয়েছে বিদ্যাপতি। তা হলে অধিকাংশ মান্বের জন্যে সৌন্দর্য পরিবেশনের কী ব্যবস্থা? তারা কি অলেপ সন্তৃষ্ট হবে? তারা কি নিন্দ্র অধিকারী? মনটা বিরস হয়ে বায় যখন ভাবে হিমালয়ও থাকবে, হিমালয়ে স্বেশিদয়ও থাকবে, কিন্তু দেখতে আসবে আঁত নগণ্যসংখ্যক লোক। যাদের সামর্থ্য আছে তাদের বাসনা নেই, যাদের বাসনা আছে তাদের সামর্থ্য নেই। অধিকাংশ মান্বের কোনোটাই নেই, তারা জানেই না তারা কী হারাছেছ। সৌন্দর্য অপচিত হছে এক দিকে। অন্য দিকে অপচিত হছে জীবন। এই ন্বিবিধ অপচয়ের কী প্রতিকার? রম্ব কী বলে? তার কী পরিকল্পনা জনগণের জন্যে?

রত্ন কী বলবে? তার মন চলে যায় স্দ্রে হিমালয় অণ্ডলে। যেখানে চিরল্তন তুযার চিরনীল আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি শিবির রচনা করেছে। নীলিমার বিরুদ্ধে শ্নাতা। কেউ কাউকে হটাতে পারছে না। শ্বন্থের ম্বারা ছন্দোবন্ধ হয়েছে। এরই মাঝখানে হঠাৎ কোনখান থেকে এসে উদয় হয় স্ম্রা। বর্গ-ঝর্ণার দিগন্তব্যাপী শ্লাবন বয়ে যায়। যেমন তার

সহস্র সহস্র বোজন-জোড়া বিশ্তার তেমনি তার চিশ হাজার ফুট উক্তা। এ মহিমা অভুল, অসীম। রত্ন লেখে, অধিকাংশ মান্বের অধিকাংশ জীবন কাটবে এসব দ্রাভ সৌন্দর্বের থেকে দ্রে কোনো নিজ্ত পল্লীতে বেখানে ছুটি পাওরা দ্রুহ, ছুটি পেলেও পাথের জোটানো শন্ত। তব্ বেখানেই তারা থাকুক সৌন্দর্বের কোলেই তাদের অভিতয়। চোখ মেলে বেদিকেই তারা তাকাবে সৌন্দর্বের কোলেই তাদের অভিতয়। চোখ মেলে বেদিকেই তারা তাকাবে সৌন্দর্বের সঙ্গো সাক্ষাং হবে। সে সৌন্দর্ব স্কুলভ বলে কম দ্র্লভ নর। এ জগতের প্রত্যেকটি ধ্লিকণা, প্রত্যেকটি ম্হুত্, প্রত্যেকটি পাওরা দ্রেভ। যা পাইনি তার জন্যে উন্থাহ, হয়ে যা পাছি তার বেন অনাদর না করি। অতি পরিচিত্র অপরিচিত। কত বে সৌন্দর্ব রয়েছে তার মধ্যে এখনো তা অজানা। ইছা করলে ছোট একটা গ্রামে সারা জীবন কাটিরে দিরেও মান্ব নিত্য নতুন সৌন্দর্বের ন্বারা আয়ুক্লল ভরিরে নিতে পারে।

বিদ্যাপতিকে চিঠি লিখতে লিখতে রত্ন ভুলে গেল যে ছোট একটা গ্রামে জীবন কাটছে না বলেই শ্রীমতী গ্রাহি গ্রাহি করছে। তখনকার মতো সে সৌন্দর্যবাদী সম্প্রদারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। যেখানে যেট্রকু সৌন্দর্য পাবে সেট্রকু আহরণ করবে। হংস যেমন নীর থেকে ক্ষীরট্রকু নের। সাত ভাই চম্পার বৈঠকের ক্ষ্যিত ক্ষীণ হরে এলো গত রাগ্রের স্বশ্নের মতো। ওটা যেন আর একটা জগং।

আট

অবশেষে এলো তার চিঠি। নাড়াচাড়া করে রক্ন ব্রুবতে পারল পর্নিশের নেকনজর পড়েছে। রক্ন সন্দেহভাজন বলে নর, শ্রীমতী পলিটিকাল সাসপেষ্ট বলে। সেটা অযথা নর। প্রায় প্রতি চিঠিতেই দর্'চার লাইন রাজনীতি থাকবেই। এবারেও ছিল। এই যে চার দিকে ধরপাকড় চলেছে সে এর তীর প্রতিবাদ করেছিল। তার পর লিখেছিল—

কাল রাত্রে যখন বিছানার যাই তখন আমার বরস ছিল উনিশ। আজ সকালে জেগে দেখি বরস এক বছর বেড়ে গেছে। মনটা এমন খারাপ

হয়ে গেল। লাকে বলে কুড়িতে বৃড়ী। আমি এখন তাই। ক্ষমাদিন বলে আনন্দ করব কী! করবার কী আছে! তাও বদি সার্থক জীবন হতো। সব সম্ভাবনা হাতছানি দিয়ে সরে গেছে। পড়ে আছে শৃব্ব শ্না জীবন। ফ্লে ফ্টছে না, কুড়িতে শ্নিকরে বেতে বসেছে। জানি আমার বিলেতফের্তা প্রোপ্রাইটর—মালিকের ইংরেজী—এক রাশ উপহার দেবেন। সেটা তাঁর পাঁচ বছরের স্বত্ব স্বামিত্ব মৌরসী মোকররি করতে। উপহার দেবেন তাঁর পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, ভগিনীগণ, আত্মীরস্বজন। ভেট আসবে প্রজাদের ঘর থেকে। ফ্লেলের তোড়া দিয়ে যাবে দেশকমীরা। জ্যোতিদা পাঠাবে সদ্যপ্রকাশিত কোনো বই। আমি জানি ওরা স্বাই আমার দীর্ঘজীবন চার। তব্ব ওই দীর্ঘজীবন নিয়ে স্ব্থী হবার কী আছে!

দৃশ্বের এলো একজনের চিঠি। আমার জন্মদিনের সেরা উপহার। ও বদি আর কিছন না লিখে শৃত্ব আমার নাম ধরে ডাকত, বদি শৃত্ব বলতে "তোমার বন্ধ্ররত্ন" তা হলেও আমার জন্মদিন সার্থক হতো। কিন্তু ও বলতে আমি অনন্যা। ও বলতে ও আমাকে ভারতবর্ষে দেখবে আশা করেনি। আমিই ওর ভারত, এমন কথাও লিখেছে। এ কথা শৃত্বলে কার না সাধ যায় বাঁচতে। বাঁচতে বাঁচতে আদ্যিকালের বন্দি বৃড়ী হতে। এক বছর পরে এর্মান একখানি চিঠি লিখে, রন্ধ। তা হলে আমার বিশ্বাস হবে যে আমার জীবন ব্যর্থ নয়, আমি মনের সৃত্থে দীর্ঘজীবী হতে পারি। সেইসঞ্গে তোমারও বে'ডে থাকা চাই। আমি যখন একশো বছরের থ্ডুথ্ডে বৃড়ী হব তখন আমার বয়সের গাছপাথরও থাকবে না, থাকবে একমান একজন। সে কে? যার চোখে আমি অনন্যা।

রত্ন, তুমি আমাকে যা দিলে তার বদলে আমি তোমাকে কীই বা দিতে পারি, ভাই! যা কিছু দেখছি সব পরের, মার আমিও। নিজেই তো আমি পরকীয়। হঠাৎ মনে হলো তোমার হাতে আমি রাখী বাঁধলে কেমন হয়। স্বদেশী যুগের রাখীবন্ধন দিবস গেল, রাখী বাঁধল্ম ভাইদের হাতে, একাই তুলে রেখেছিল্ম। যেটি আমার সব চেরে প্রিয়

রছ ও শ্রীমতী

সৈইটি। তখন পাঠাতে সাহস হর্নন। তুমি রাজনীতি ভালোবাস নাঃ
আজ তো রাজনৈতিক দিবস নয়, আজ আমার জন্মদিন। মনে মনে
পরিয়ে দিল্মে তোমার হাতে। জান তো হ্মায়্ন বাদশাকে এক রাজপ্ত
য়ানী এমনি এক রাখী পাঠিয়েছিলেন। সেই স্ত্রে হ্মায়্ন হলেন তাঁর
রাখীবন্ধ ভাই। যদিও কেউ কাউকে কোনো দিন চোখে দেখেনিন,
দেখলেন না জীবনে। রয়, তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই, আমি তোমার
রাখীবন্ধ বহিন। কোনো দিন আমাদের চার চোখ এক হর্মান, হবেও না
বোধ হয়। তুমি অদর্শন, আমি অদর্শনা, তব্ তোমার আমার এ বন্ধন
চিরকালের। আর কারো সঙ্গে এ সম্পর্ক পাতাইনি। এ শ্বেম্ তোমাতে
আমাতে।

কিন্তু এর একটি তাৎপর্য আছে। বোন যদি কখনো বিপদে পড়ে ভাই তাকে সর্বন্ধ পণ করে উন্ধার করবে। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে তুমি আমার রাখী নিয়ো না, আমাকে ফেরৎ দিয়ো। আমি কিছ্ম মনে করব না। কেনই বা তুমি আমার বিপদের দিনে নিজেকে বিপার করবে! না, ভাই। তেমন কোনো অন্বরোধ করব না। আমি তো কই তোমার বিপদের ক্ষণে আপনাকে বিপার করার অণগীকার দিছিনে। রাখীবন্ধ বোনেরা দিত না। সেই রাজপ্ত রানীও দেননি। তবে আমি তোমার চির শাভাকান্কিণী হব। তার বেশী আর কী করতে পারি! মেয়েরা তার বেশী পারে না। তাদের হাত পা বাধা। কিন্তু মারি বিপদের মৃহ্ত্তে আমিও বিপদ বরণ করব। এ হলো আশা। অণগীকার নার। দিন দিন আমার আত্মবিশ্বাস কমে আসছে। বিশ্বাস কমে আসছে আমার মারি সম্বন্ধে। সাত পাকের পাকে চক্রে জড়িয়ে পড়েছি। এ ষে কী বন্ধণা তুমি কী বা্মবে! তুমি তো সহজেই মান্ত।

তার পর, রত্ন, এ কী করেছ, বল দেখি! রুপালীকে ভেবেছ আমি! লভ্জায় মরি! রুপালী তোমার কাছে সমাধান প্রত্যাশা করছে। তাকে এখন কী বোঝাই? তোমার মতে তার কী করা উচিত? তুমি তাকে

কী করতে পরামর্শ দাও? বা শন্নেছ তার চেরে বেশী শনেতে চাও তো তাও শোনাব। কিম্পু সমাধানের ইণ্গিত দিয়ো।

তোমার সপো কথা কি ফ্রেরোবার! তার আগে হয়তো রাড ফ্রেরারে।
আজ এই পর্যান্ত। তোমার উত্তরের প্রতীক্ষার রইল্মে। চোখে দেখতে
পার না বলেই অব্ধ কানে শ্নতে চার অত বেশী। তোমার চিঠি পাওরা
যেন তোমার কথা কানে শোনা। চিঠি নর তো, বাঁগি। কথা নর তো,
স্বর। মত মেলে না, রাগ করি, তব্ ব্বতে পারি যে তুমি আমাকে কখনো
ঠকাবে না, কখনো বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। কী যে নিরাপদ বোধ করি
তোমার কাছে! জ্যোতিদার কাছেও। আর যারা আসে তারা রক্ষকবেশী
ভক্ষক। ইতি। তোমার স্নেহাধীনা

গোরী

পদ্মার ব্বকের উপর দিয়ে যেন একখানা স্টীমার চলে গেল। ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে ফ্রলতে ফ্রলতে ফেটে পড়ছে। আছড়ে পড়ছে তটের গায়ে। ল্বটিয়ে যাছে। মিলিয়ে যাছে। ভেঙে দিয়ে যাছে নদীর পাড়। তেমনি এই চিঠি। রক্ব তার বিছানায় উপ্যুড় হয়ে শ্বয়ে পড়ল বালিশে ব্বক চেপে। দ্বহাত জোড় করে মাথাটাকে বেড়ীর মতো বেষ্টন করল। কত রকম ভাব উঠছে, ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ভাঙন লাগছে, মাতন তব্ব থামছে না।

অনেকক্ষণ পরে রক্ন মুখ তুলে চেয়ে দেখল—রাখী। চিঠির সংগ্রেই ছিল, নজরেও পড়েছিল, কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। স্কুলর রাঙা রাখী। লাল স্কুতোর সংগ্র হল্ম স্কুতো। রুপালী জরির কাজ। রেশমের ফ্ল। কেউ কখনো তাকে এমন শোখীন রাখী পরায়নি। মেয়েদের হাত থেকে রাখীনেওয়া এই প্রথম।

রত্ন কি এ রাখী নেবে, না ফেরৎ দেবে?

রাজপতে রানীরা যখন রাখী পাঠায় তখন সে রাখী প্রত্যাখ্যান করলেও সঙ্কট, না করলেও সঙ্কট। প্রত্যাখ্যান করতে শিভালরি-তে বাধে। বীরধর্মে কলঙ্ক লাগে। রানীর অমর্যাদা। নারীর অসন্মান। আবার গ্রহণ করাও তো

. 4

কম দ্বেসাহস নর। কবে কেমন করে তার বিপদ ঘটবে, যার হাত থেকে বিপদ সে কত বড় প্রবল শান্ত কে জানে! অনির্দেশ্য অপরিষের বিপদের জন্যে আগে থাকতে আত্মনিবেদন করা কি মুখের কথা! নিজের স্বার্থ অবহেলা করে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে পরের স্বার্থ পাহারা দেওয়া, পরের প্রাণ ও মান রক্ষা করা কি সহজ কাজ! বিশেষত বখন কেউ কাউকে চোখেও দেখেনি, দেখবেও না।

আর মনে পড়ল যে গোড়দেশের শাসকের বিদ্রোহ দমন করতে এসে হ্মায়্নন বাদশা পেরেছিলেন এমনি একটি রাখী রাজপ্রতানার কোনো এক রানীর কাছ থেকে। অচেনা অদেখা বোন তাঁকে রাখীবন্ধ ভাই বলে ডেকেছেন। সাড়া না দিরে বারা পারে তারা পারে, কিন্তু হ্মায়্নন বাদশা অন্য ধাতুতে গড়া। রাখীতো তিনি রাখলেনই, কিছ্ব দিন পরে নিজের স্বার্থ উপেক্ষা করে রানীর রাজ্য রক্ষার জন্যে লড়তে গেলেন। যার সংগে লড়লেন সে তাঁর শহ্ব নয়। তার সংগে লড়াই রাজনীতি নয়। তব্ব তাঁকে করতে হলো রণ। কারণ তিনি যে রাখীবন্ধ ভাই। পরেও কি রানীর সংগে দেখা হলো! না, জীবনে কোনো দিন নয়।

রত্মর অভ্যত্তরে একজন মধ্যযুগের নাইট ছিল, একজন হুমার্ন বাদশা, নির্বোধের একশেষ, যে নিজের সাম্লাজ্য রাথতে পারল না, দেশ থেকে বিতাড়িত হলো। ওই রাখী রাথতে গিয়ে হয়তো তার সর্বস্ব যাবে, অথচ ও রাখী ফেরং দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রাখী যদি আদৌ তার কাছে না আসত তা হলেই সে নিম্কৃতি পেতো। কিন্তু একবার যখন এসেছে তার কাছে তখন কি তার নিস্তার আছে? তাকে ও রাখী রাখতেই হবে, আর পরে যদি কোনো বিপদের সম্কেত আসে হুমায়ুনের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে হবে।

রাখীটিকে রক্ন যক্ন করে ডান হাতে বাঁধল। মনে করল যেন সে নর, শ্রীমতী বাঁধছে। শ্রীমতী? না, শ্রীমতী নয়, গোরী। কী মিন্দি নাম! গোরী! রক্ন মনে ডাকল, গোরী! গোরী! গোরী! বার বার ডেকেও সাধ মিটল না। "না জানি কতেক মধ্যু শ্যাম নামে আছে গো, অধর ছাড়িতে নাহি পারে।" তেমনি গোরী নামে।

্বস্থ প্রীমতী

ঘরের দরজা খোলা ছিল। হীর, ঢুকে বলল, "কি রে, কী হছে? তোর হাতে ওটা কী? রাখীর মতো মনে হছে না? এই কার্ত্তিক মাসে রাখী কে পাঠাল? আরে, এ যে চমংকার কাজ করা!"

রত্নর মূখ শ্বকিরে গেল লজ্জার। হঠাৎ কোনো জবাব খাজে পেলো না। শ্রীমতীর কথা বাল্য বন্ধ্বকে বলেনি। বললে সে যদি বকে। যদি বলে পরের ঘরের বৌঝির সংগ্যে অত ফণ্টিনিফি কেন?

কথাবার্তার মোড় ঘ্রাররে দিয়ে অনেকক্ষণ আলাপের পর এক সময় রক্ষ বলে ফেলল, "আর হয়েছে আমার বিদেশে যাওয়া! ইটালী স্ইটজারলণড ষেখানেই থাকি না কেন, কখন কার কী বিপদ ঘটবে, অমনি ছ্টে আসতে হবে কাজ ফেলে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো। তোর তো মনোবাঞ্ছা এই বে আমি দেশ ছেডে কোথাও না যাই।"

দেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়া দ্রের কথা, হীর্ তো কুন্টিয়া ছেড়ে কলকাতা পর্যশত যায়ন। যেতে চায় না। কলকাতা গেলে যদি গ্লেডার হাতে পড়ে। গ্লেডা নাকি ওথানকার অলিতে গলিতে। লভন, প্যারিস, নিউইয়র্ক। বাপ রে বাপ রে বাপ! ওসব জায়গায় গেলে কি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে! কলেজে পড়তে হলে রাজশাহী বা কৃষ্ণনগর যেতে হয়। সেও কি কম দ্র! বাড়ীর মতো আরাম আর কোথাও নেই। সেইজন্যে পড়াশ্লাই দিল ছেড়ে। চাকরি করছে। সামান্য রোজগার। উল্লাতির আশা নেই। অলেপ স্থা। শথ বলতে একট্ গানবাজনা শেখা, সাধ বলতে নিজস্ব একখানা সেতার কি এসরাজ কেনা। আর স্বান্দ বলতে একটি বিয়ে। তাও ডানাকাটা পরী বা রাজকন্যা নয়। কল্যাণী বধ্। যে গ্রেজনের সেবা করবে, তুলসীতলায় সাজ জ্বালবে, লক্ষ্মীবারে আলপনা দেবে।

হীর বিমৃত্ হলো। হঠাৎ এ কথা কেন? কার বিপদ? কী বিপদ? তখন রত্ন একটা একটা করে ভেঙে বলল, "এই যে রাখী দেখছিস এ রাখী যে আমাকে পরিয়েছে তার যদি কোনো দিন কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে তা হলে আমাকে আমার সব কাজ ফেলে ছুটে আসতে হবে তাকে রক্ষা করতে। প্রিথীর ষেখানেই থাকি না কেন। রাখীটা না রাখলেই হতো। রেখে হয়তো

ভূল করল্ম। কিন্তু রেখেছি বে তুই তার সাক্ষী। তুই না এলে হরতো কোনেদ এক দ্বর্ণল মন্হুতে রাখীটা খুলে ফেলে বলতুম, আমি তো পরিনি এ রাখী। পিছনু হটতুম। তুই এসে আমাকে বাঁচালি। এবার আর আমি পেছোতে পারিনে। পরেছি। সত্য করেছি।"

হীর, চকিতের মতো বলল, "সত্য করেছিস?" "তুই তার সাক্ষী।"

"আমি—আমি তার সাক্ষী?" সে তখনো সম্মোহিত।

"किन्जू र्वानमत्न काউकः। मनतथ ग्नत्न ग्रह्मा त्यरण भारतन।"

হীর কথা দিল। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা তার কাছে অভিনরের মতো অলীক লাগছিল। জানতে চাইল মান্যটি কে। ছেলে না মেরে। কী হরেছে ওর। রত্ন বলল, ''সেসব বলা বারণ। তাতে ওর বিপদ বাড়বে। ফলে আমারও

তো বিপদ।" কোনো মতে তার বাল্যবন্ধ্বকে নিরুস্ত করল।

রাদ্রে শন্তে যাবার সময় রাখীটি আবার হাতে বাঁধল রত্ন। এবার কী জানি কেন তার মনে হতে থাকল রাখী তো সে নিজে বাঁধেনি, বে'ধেছে গোরী, বে'ধেছে অদৃশ্য হাত দিয়ে। পরবে কি পরবে না, এ প্রশ্ন ওঠে না। খনলবে কি খনলবে না, এইটেই প্রশ্ন। ইচ্ছা করলে রত্ন খনলে রাখতে পারত, কিল্ডুবলতে পারত না যে গোরী তাকে রাখী পরিয়ে দের্মন।

মাঝ রাতে বার বার ঘ্ম ভেঙে গেল। তাই তো। রাখী এলো কার হাত থেকে তার হাতে? কে পরালো? আজ তো রাখীপ্রিমা নর। প্রিমাই নর। তা হলেও প্রেতার ভাব মনে আসে। যে প্রেতা সব অপ্রেতার অন্তরে রয়েছে। বাইরে রয়েছে। ছাড়িয়ে রয়েছে। ছাপিয়ে রয়েছে। রত্ন ঘ্নিয়ে পড়ে সেই প্রেতার কোলে। শিশ্র মতো পরম আন্বাসভরে।

রাত থাকতে উঠে চিঠি লিখতে বসল শ্রীমতীকে। লিখল— গোরী,

তোমাকে এই নতুন নামে ডাকতে কী যে ভালো লাগছে। গোরী! রাখীবন্ধ বহিন! তোমার জন্মদিন গেল। জানলে কিছু একটা পাঠাতুম।

রছ ও শ্রীমতী

অশ্তত আমার শহুত কামনা। আজ শহুর সেইটহুকু পাঠাচ্ছি। এ কামনা বিলম্বিত হলেও আশ্তরিক। গোরী! রাখীবন্ধ বহিন! তোমার জন্মদিন অনেক বার ঘুরে ঘুরে আসহুক।

দীর্ঘ জীবনকে তোমার এত ভর কিসের? আমার কথা যদি বল, আমার ভরও নেই লোভও নেই। আমি বিশ্বাস করিনে যে এই একমার জীবন বা এর পরে শ্না। আমি প্রতাবাদী। প্র্ণ থেকে এসেছি, প্রতি আছি, যাব যখন প্রতি যাব। জীবনের অন্তে জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। স্তরাং এ জীবন দীর্ঘ হলেও ভালো, ফুস্ব হলেও ভালো। আজকেই বিদি শেষ হয় তা হলেও আমার খেদ নেই, কারণ আজকেই আবার আরম্ভ।

দশ বছর যখন আমার বরস তখনো আমার মনে হয়েছে, বা পেরেছি অনেক পেরেছি, আমি ধন্য, আমি প্র্ণ। এত ভালোবাসা আমার ভাগ্যে মিলেছে, এত আনন্দ, এত সৌন্দর্য যে মরে গেলেও আমার কোনো আফসোস থাকবে না। পনেরো বছর বয়সেও আমার এই একই অন্ত্তিছিল। বিশ বছরেও এই একই। গোরী, তোমার এই জন্মদিনটি আমার জীবনে এসেছে মাস ছয়েক আগে। সেদিন আমি এই কথাই ভেবেছি যে আমার ভাগ্যে যা মিলেছে তা প্রভূত। যা মেলেনি তার জন্যে আফসোস করব না। ইতিমধ্যে তমি এলে। যা মেলালে তা অপ্রেণ।

তার পর, গোরী, এ কী করলে! বিধাতার কাছে আমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিন। আমার প্রার্থনা ছিল, আমাকে কোরো স্বাধীন প্রের্বদের মধ্যে স্বাধীনতম। তার উত্তর কি এই রাখী! এই বন্ধন কি আমাকে দেশদেশান্তর থেকে টেনে আনবে না, যদি কখনো তোমার কোনো বিপদ ঘটে? ভগবান না কর্ন। আজ থেকে আমার অন্যতম প্রার্থনা গোরী বেন কোনো দিন বিপদে না পড়ে। একমাত্র এই ভাবেই আমি স্বাধীন থাকতে পারি। অবশ্য ইচ্ছা করলে রাখীটি আমি খুলে ফেলতে পারতুম, কিন্তু তা যদি করি তা হলে আমি হ্মায়্ন বাদশার চেয়ে, মধ্যমুগের নাইটদের চেয়ে, খাটো হয়ে যাই। জানি আমার সৈন্য নেই, সামন্ত নেই,

ধনবল নেই, বাহাবল নেই। আমার পক্ষে ওঁদের সমান হতে বাওরা মৃঢ়তা। তব্ একালের এক রাজপত্ত রানী বে আমাকে হ্মারানের মতো ভাবতে প্রেছেন এ আমার পরম সোভাগ্য। "তুমি মোরে করেছ সমাট।"

গোরী, কী দেখে তুমি আমাকে এ গ্রের্ দারিছে বরণ করলে? আমি বৈ খ্রেল পাইনে আমার মধ্যে এমন কোনো মহত্ব। একদিন তুমি আবিহ্নার করবে বে ওটা তোমার দ্ভিশ্রম। বেদিন আমাকে চাক্ষ্র করবে সেদিন তোমার প্রম ঘ্রুচবে। গারে জাের নেই। অস্ত ধরতে জানিনে। অত্যতত সাধারণ চেহারা। বীর প্রের্ব বলতে বা বােঝার আমি কি তাই? তোমাকে প্রতারণা করে তোমার রাখী ধারণ করা কি উচিত? সম্ভানে তোমাকে আমি প্রতারণা করিনি। অজ্ঞানে করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। ধর্খনি তোমার মনে হবে রাখািটি অপাত্রে দেওয়া হয়েছে তথান আমাকে লিখাে, আমি ফিরিয়ে দেব। যা আমার নয় তা নিতে আমার স্বভাবের বাধা। এ কি সতি্য আমার? জানিনে। শ্রুষ্ জানি এ অম্লাঃ। এ আমার রক্ষাকবচ।

রুপালীর সমস্যার সমাধান? আমি কি সবজাশতা? আমি যা বলব তা কি অস্ত্রান্ত? তা কি তোমার পছন্দ হবে? তবে শোন। রুপালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে। উম্পার করতে হবে তার হতে স্বাধীনতা, তার মার্নাবিক জন্মস্বত্ব। এক দিক থেকে দেখলে দুর্ভাগ্যা সোনালীর বেশী, রুপালীর কম। অপর দিক থেকে দেখলে রুপালীর বেশী, সোনালীর কম। সোনালী স্বাধীন, সে স্বাধীন ভাবে সিম্খান্ত নিতে পারে, বিয়ে করতেও পারে, না করতেও পারে, বেশ্যাব্তি ছেড়ে দিতেও পারে, না দিতেও পারে। রুপালী স্বাধীন নয়, সে ইচ্ছামতো সিম্খান্ত নিতে পারে না, তার হরে সিম্খান্ত নেওয়া হয়ে গেছে জীবনান্তকাল অবধি।

এই যে একজনের হয়ে আরেক জনের সিম্পান্ত নেওয়া, নিয়ে সেটাকে একজনের উপর জাের করে চাপিয়ে দেওয়া এর বির্ম্থে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এ স্বাধীনতা ঈশ্বরদত্ত। রুপালীর

স্বাধীনতা বলতে আমি ব্রিঝ বিদ্রোহীর স্বাধীনতা। রাজামাত্রের বির্দ্ধে বিদ্রোহ করার স্বাধীনতা প্রজামাত্রেরই আছে। আর প্রভূমাত্রের বির্দ্ধে বিদ্রোহী হবার স্বাধীনতা দাসমাত্রেরই আছে। এ হলো স্বাধীনতা ফিরে পাবার স্বাধীনতা। র্পালীকে প্রথমে স্বাধীনা মানবী হতে হবে।

কিন্তু হতে চাইবে কি সে? হতে চাইলেও দাম দিতে চাইবে কি? কেমন করে জানব? আমি তো অন্তর্যামী নই। ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, বংশগোরব, নিরাপত্তা, এর কোনটি বা তুচ্ছ। কোনটি বা ত্যাগ করা সহজ! কিন্তু ত্যাগ না করলে মৃত্তি কোথায়! রুপালীকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। চাই বললেই পাওয়া যায় না। দাম দিতে হয় চ্বাধীনতার দাম সোনার পার চেয়ে, সামাজিক মর্যাদার চেয়ে, বংশগোরবের চেয়ে, নিরাপত্তার চেয়ে বেশী। এসব কথা রুপালীকে বোঝায় কে? আমিতা পারব না। তোমারি এ কাজ।

সোনালীর সমস্যা এক হিসাবে অত কঠিন নর। ভাগ্যে থাকলে সে তার মনের মানুষ পাবে। সে মানুষ যদি মানুষের মতো মানুষ হরে থাকে তবে সোনালীর প্রনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। যদিও সম্ভাবনা স্বল্প। কিন্তু রুপালীর ভাগ্যে তেমন মানুষ মিললেও সোনার শিকলের বাধা দ্বস্তর। আইনের বাধা তো আছেই। সমাজসম্মত স্বামীর গ্রাস থেকে তাকে উন্ধার করা নরক থেকে গ্রাণ করার চেয়েও দ্বর্হ। সে আপনিবিদ্রোহী না হলে আর কেউ কিছু করতে পারবে না।

যাক, এসব ভাবনা ভেবে মাথা ঘামানোর অবসর আমার কই? আমার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। এবার ফিরে গিরে পড়াশুনায় মন বসাতে হবে। আর তিন মাস বাদে পরীক্ষা। আমার জীবনের শেষ পরীক্ষা। পরীক্ষার পর আর পড়ছিনে। পড়তে পড়তে বদি জীবন ভোর হয়ে যায় তবে বাঁচব কখন? দেখব কখন?

চিঠি লিখতে গিরে রাত ভোর হরে এলো। বাইরে বৈষ্ণবীর প্রভাতী গান শ্নতে পাছি। ও থেমে থেমে সবাইকে জাগিয়ে দিরে টহল দিরে

ফিরছে। রোজ এই করে। একমাস ধরে করবে। ওই আমার কল্পনার স্বাধীনা নারী। ওর কোনো বাঁধন নেই। সাধী আছে, সাধী কিন্তু প্রভূ নম্ম। স্বয়ং ভগবানকেও সে প্রভূ ভাবে না। তিনিও কি প্রভূ হতে চান? তিনি কান্ত।

গোরী, এখন তা হলে আসি। চতুরীকে দেখতে ইচ্ছা করছে। স্বাধীনাকে দেখলে আমি অপূর্ব প্রেরণা পাই। জানতে চাই কী আছে ওর মধ্যে। রূপ তো নেই। তবে কী? রস। শিখতে হবে রস কাকে বলে।

অজন্ত শৃভকামনা জেনো। ইতি।

তোমার রাখীবন্ধ ভাই

চিঠি লিখে রত্নর মনটা হালকা হয়ে গেল। বিপদকে দ্র থেকে যত ভরক্ষর মনে হয় বিপদ আসলে তত ভয়ক্ষর নয়। তা যদি হতো মান্য এত রকম দ্বিপাকের ভিতর দিয়ে এসে সভ্যতার মুখ দেখত না, মাঝ রাস্তায় মুখ ধ্বড়ে পড়ত। দ্বর্যোগকে স্বোগে পরিণত করতে জানলে মান্বের হায় নেই। মানবাদ্মা অদম্য।

তার উল্লাস, তার গর্ব এই যে জন্মদিনে গোরী আর কাউকে রাখী পাঠার্রান, পাঠিয়েছে একমাত্র তাকেই। ডাক পড়ে অনেকের, বেছে নেওয়া হয় অলপ কয়েকজনকে। এক্লেত্রে মাত্র একজনকে বেছে নিয়েছে নিয়িত। কী জানি কোন দ্বর্শভ স্কৃতির দর্ন। মনোনয়ন পেয়েছে রয়। একমাত্র রয়। গৌরবে তার মাথা উচ্চ হয়ে গেছে। সে রাখীবন্ধ ভাই। একালের হ্মায়্ন। সকলের কাছ খেকে সে এটা গোপন রাখতে চায়। অনাবশ্যক নম্বতার সঞ্গে কথা বলে। জানে তার উচ্চতা বেড়ে গেছে। তব্ এমন ভাব দেখায় যেন সে লক্জায় নতশির। শ্ব্যু উচ্চতা নয়, দায়িছ বেড়ে গেছে। কী এক দ্রের্জের গ্রেছ্ভার তার উপর নাসত।

চিঠিখানা ডাকে দিতে না দিতেই আরেকখানা হাজির। সাধারণ খাম, বা ডাকঘরে কিনতে পাওয়া বায়। তার ভিতরে এক্সারসাইজ ব্রক খেকে ছি'ড়ে নেওয়া পাতা। দ্রত হসতাক্ষরে কী লিখেছে শ্রীমতী? এ কী!

এ চিঠি পড়া হয়ে গেলে প্রাড়য়ে ফেলবে। ললিত গ্রেশ্তার। খ্ব সম্ভব মাডালের পথে। ছোট ননদের সঙ্গো তার বিরের কথা ছিল। ললিতের ইচ্ছা নয়, সেইজন্যে কি সে স্বেচ্ছায় ধরা পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল? ও ছেলের মনের তল পাওয়া ভার। ও বোধ হয় আরেকজনকে ভালোবাসে। কাকে, বলব? না, থাক। এইসব হতাশপ্রেমিকদের জন্যে দ্বংখ হয়। কিন্তু এদিকে যে আমি ম্শাকিলে পড়ল্ম। ছোট ননদের বিয়ে না হলে এরা আমাকেই দোষী করবে। সাব্ ল্বিকয়ে ল্বিয়ের কাঁদছে আর আমার উপর ঠোঁট ফোলাচ্ছে। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। সত্যি, কৃতজ্ঞতা বলে দ্বিনয়ায় কিছ্ম নেই। বিয়ের সম্বেধ্ধ করেছিল কে? সে আমিই। নইলে ও বাড়ীতে এক মেয়ে দেবার কর্বে অভিজ্ঞতার পর আরেক মেয়ে দিতে কেউ এত দিন গা করেনি। এখন আমার প্রোপ্রাইটর পর্যন্ত আফসোস করছেন আর আমার দিকে সজল চোখে তাকাচ্ছেন। বড় মাছটা চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

আছ্না, আমি এখন কী করতে পারি! লালত যদি প্রালশকে দেখিয়ে দেখিয়ে সাম্পেতিক লিপি পাচার করে ও ধরা পড়ে আমার কী করবার আছে! আমি অত কাঁচা মেয়ে নই। আমি বলছি আমি এর মধ্যে নেই। প্রোপ্রাইটর তব্ সজল চোখে তাকাবেন। তাঁর বিশ্বাস আমি এর মধ্যে আছি। শ্রনছি প্রলিশ সাহেবকে বিরাট ডালি পাঠানো হয়ে গেছে। তাঁর অধীনস্থদের যাঁর ষেমন মর্যাদা তাঁকে তেমন নজরানা দিতে সদরে ম্যানেজারবাব্ গেছেন। যাতে এ বাড়ীতে খানাতল্পাসী না হয়। বা আমাকেও প্রেশ্তার না করে। আমি তো তৈরি। কিন্তু আমাকে ধরছে কে? আমি যমেরও অর্টা।

রত্ব, তোমার কাছ থেকে আগাম বিদায় নিয়ে রাখছি। লিখতে যদি দের জেল থেকে চিঠি লিখব। এটাও তো একটা জেল। দৃঃখ করার কী আছে? অন্থের কিবা রাহি কিবা দিন। বরং ওরই মধ্যে একট্ নৃতনত্ব আছে। একট্ হাওয়াবদল। ভালো কথা, আমার রাখীশাম্থ চিঠি কি তোমার হাতে পড়েনি? প্রলিশে আটক করেছে নিশ্চর। কত কথা লিখেছিলম্ম তাতে। আর কি সময় আছে শ্বিতীয় বার লেখার? এ চিঠি বার মারফং বাচ্ছে সে এই মৃহ্তের্ রওনা হচ্ছে। সেখান থেকে ভাকে ছাভবে। ভাকঘরের খামে। ভালোবাসা চিরকালের জন্যে।

একেই বলে বিপদ। রক্ষ শিউরে উঠল। ললিত—বাকে সেদিন রাজশাহীতে দেখে এলো সে—এখন হাজতে কি কোথায় ভগবান জানেন। গোরী—বার চিঠি এইমাত্র পেলো সে—এতক্ষণে জেনানা ফাটকে কি কোথায় দেবতারাও জানেন না।

রঙ্গর মুখ শ্রকিরে গেল ভাবনার। টেলিগ্রাম করলে হয়। কিন্তু কাকে করবে? গোরীকে না তার প্রোপ্রাইটরকে? কোন অধিকারে করবে? টেলিগ্রাম বিদি পর্নিশের থপরে পড়ে তা হলে সেও তো সন্দেহভাজন হয়। একই দলের বলে তাকেও তো ধরতে পারে। তা বলে সেই ভয়ে পেছিয়ে যাওয়াও তো রাখীবন্ধ ভাইয়ের সাজে না। কী গেরো!

তার মনে পড়ল যে খবরের কাগজে যাদের নাম বেরিরেছে তাদের মধ্যে শ্রীমতীর নাম নেই। গ্রেম্তার হলে তার মতো বিখ্যাত মহিলার নাম নিশ্চর কাগজে উঠত। ছবিও ছাপা হতো। অত বড় একটা খবর চেপে যাওয়া সম্ভব নর। ললিত না হয় নগণ্য ছাত্র, শ্রীমতী যে বেগমপ্রেরের ছোট তরফের জমিদার-বধ্যে।

রত্ন আরো করেকখানা খবরের কাগজ খংজে পেতে পড়ল। একখানার এক কোণে গ্রেম্বারীদের তালিকার ললিতানন্দ বর্মণের নাম ছিল। রত্ন লক্ষ করে বিমর্ষ হলো। বেচারা ললিত। সেদিন হাওয়া হয়ে গিয়েও নিস্তার পেলো না। অমন একখানি বপ্র বার সে গা ঢাকা দেবে কোথার! ফাঁদ পাতা ছিল, আটকে গোল।

এর পর প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটি কাগজ খুটিয়ে খুটিয়ে পড়া রত্নর কাজ হলো। যদি শ্রীমতীর নাম থাকে। ছবি বেরোয়। দেখতেও সাধ যায় ওকে। পশ্চিমে ফিরে যাওয়ার দিন এসে পড়ল। রত্ন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় এলো চিঠি। আবার সেই নীল খাম। ভিতরে সেই নীল রঙের কাগজ। রত্ন আশ্বস্ত হলো। যাক, বিপদ কেটে গেছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

চিঠিখানা খ্লতে না খ্লতে ঝ্প করে একখানা ফোটো খসে পড়ল। ছোট একটা স্ন্যাপশট। দেখি, দেখি। রঙ্গ তুলে নিয়ে দেখল। না, স্ন্যাপশট নয়। বড় সাইজের ফোটো থেকে কেটে নেওয়া একটি বাস্ট। সম্ভবত গ্র্প ফোটো থেকে। আরো বঙ্গের সঙ্গে খ্রিয়ে খ্রিয়ে দেখলে মাল্ম হয় বিয়ের সময়্কার ফোটো থেকে।

এই গোরী! রক্ন অশেষ কোত্হলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করল। কই, প্রভাতের বর্ণনার সঙ্গে তো মেলে না। মিলবে কী করে! ও যে চোম্দ পনেরো বছর বয়সের নবোঢ়া। রীড়ায় নতম্খী। নিষ্পাপ নিরীহ। বিষম একটা আঘাত পেয়ে বিষাদময়ী। সচকিত সশক্ষ। তব্ কী স্কলর! কলিকা বয়সে এই! ফ্টলে কি র্পের অর্বাধ থাকবে! রক্নকে আরো আনন্দ দিল তার আবিষ্কার যে কোথাও প্যাশনের পূর্ব লক্ষণ নেই। প্রভাত বলোছল কতক মেয়ে থাকে যারা এমনিতেই গরম। কই, তা তো মনে হয় না।

গ্রীমতী লিখেছিল—

সন্থবর দিচ্ছি। ললিত ছাড়া পেয়েছে। তবে একটা শর্ত আছে।
অবিলন্দের বিয়ে করতে হবে। এটা আমার প্রোপ্রাইটরের কারসাজি।
পর্নলিশ্যের তরফ থেকে প্রস্তাব। কলকাটি নাড়ছেন ম্যানেজার। ললিতের
বাবা এখন এমন কৃতজ্ঞ যে কাল দিন ফেললে কালকেই ছেলের বিয়ে দেন।
তা যাক, বিয়ের দেরি আছে। তোমাদের সবাইকে আসতে হবে বরষাত্রী
হয়ে। সাত ভাই চম্পার সাত জনকেই একসংগে দেখতে চাই। বিশেষ
করে একজনকে। রত্ন, তোমার ওজর আপত্তি শ্ননব না। জান তো,

আমার বন্দী জীবন। তোমার সন্দের দেখা করতে চাইলে করতে পাব না।
কিন্তু বিরেবাড়ীর হৈ চৈরের মধ্যে দেখা হরে যাবেই। বর যখন আসবে
তখন তার এক পাশে তুমি থাকবে। বর যেখানে বসবে তার এক পাশে
তুমি বসবে। তোমাকে আমি চিনে নেবই। নারীর সহজাত দৃষ্টি দিরে।

কিন্তু তুমি কি আমাকে চিনতে পারবে? সন্দেহ। পর্র্বের দ্ভিট্ণিক ক্ষীণ। ভাবলুম তোমাকে আমার একখানা ফোটো পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। তা দেখে চিনবে। কিন্তু ফোটো খ্জতে গিয়ে দেখি কোনোখানাই আমার পছন্দ হয় না। ব্রুড়ো বয়সের ফোটো দেখে তোমারই বা কোন স্থ! দিন দিন মোটা হয়ে যাছিছ। গড়ন যখন আমার রজনীগধার মতো ছিল, বরণও ছিল তেমনি, তখনকার একটা ফোটোর একাংশ পাঠাছিছ। কাউকে দিয়ো না। কাছে রেখো। ও বয়স আর ফিরবে না। বিয়েতে এসো কিন্তু। না এলে নিরাশ হব।

তুমি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছলে যে আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে। এখন তুমি শ্বনে নিশ্চিন্ত হতে পার আমাকে ধরবে না। আমি কিশ্তু একট্বও খ্লিশ নই। কেন আমাকে ধরবে না? আমি এমন কী অপদার্থ? আমি কি দেশের জন্যে কম করেছি? প্রকৃত ব্যাপার কী, জান? চুপি চুপি বলছি। ওরা সব খবর রাখে। আমাকে পাকড়াবে বলে সব ঠিক করে রেখেছিল। মাণ্ডালে চালান দিত। কিশ্তু কোন দেবতাকে কী দিয়ে তুন্ট করতে হয়, কাকে বেলপাতা, কাকে তুলসী, এ বিদ্যা আমাদের ম্যানেজার মশায়ের চোখের তারায়। যার দিকে একবার তাকাবেন তার কিসের উপর লোভ তা নির্ঘাত জানতে পারবেন। লোকটা তান্দ্রিক সাধক। সম্ভর বছর বয়স হলো। য্বার মতো উজ্জ্বল তার চোখ। ম্যানেজার জানতেন ম্যাজিশ্রেট ডালি নেবেন না, রাগ করে গালি দেবেন। তাঁকে দিতে হয় নবাবী আমলের ছবি। বিনা ম্লো নয়। নামমান্ত ম্লো। সাহেবের ছবির সপ্তয় চমৎকার। সব বাড়ী থেকে একখানা দ্ব'খানা গেছে। এত দিন এ বাড়ী থেকে যার্যান। আমার বেতে দিইনি। এবার একসংশ্যেখান দুই গেল। আলিবর্দি খাঁর রাজসভার ছবি। আমার শ্বশ্বর মশায়

তো মাধার হাত দিয়ে বসেছেন। আজকের বাজারে চল্লিশ হাজার টাকার কম নর। বদিও মূল চিত্র কি না নিশ্চর করে বলা যায় না।

অতএব আমি গ্রেশ্তারের অবোগ্য। ম্যাজিস্ট্রেট নাকি আমাদের বাড়ী চা খেতে আসবেন। আমি তাঁর মেয়ের বরসী। আমাকে ব্রিষয়ে স্বীবারে নিব্তু করবেন। তিনি আমার বাপের মতো। তব্ এ বাড়ীর সম্মান রাখতে তাঁর ও আমার মাঝখানে একটা মোটা চাদরের পদা খাটানো হবে। তিনি কথা কইবেন, আমি শ্বনব। তার পর আমি কথা কইব, তিনি শ্বনবেন। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাব না। কী অত্যাচার, বল দেখি! এসব কেতা বদি এখনো মানতে হয় তবে স্বাধীনতা কিসের জন্যে ও কার জন্যে? ইংরেজই বা এসবের প্রশ্রম দেয় কেন? ও বোধ হয় ভাবছে মাঝখানে যদি পদা না থাকে আমি হয়তো ওকে গ্রেলী করে বসব। আমার নামে অনেক বাজে কথা শ্বনেছে নিন্চয়।

দ্র হোক, মন ভালো নেই। বিন্দনী যদি হতে হয় রাজবিন্দনী হতুম।
দেশন্দ্ধ লোক স্থ্যাতি করত। দেশটাও মৃদ্ধি পেত। আমিও। গৌরবে
অবিশ্বিট জীবন অতিবাহিত হতো। না হয় কারাগারেই প্রাণ য়েত। সেও
কত বড় একটা ভাগ্য! তা তো হবার নয়। পচতে হবে এই অন্তঃপ্রের
অন্ধক্পে। ক্পমন্ডুক হয়ে। মন্ডুক রাজকুমারের সন্গো। সাধ
আহ্মাদ বলতে আমার ওই মন্ডলী। কিন্তু ধরপাকড়ের ফলে মন্ডলী
এখন বিপর্যন্ত। ললিতের নাম করল্ম। অন্যান্যদের নাম করা বারণ।
ওরা কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। বাইরে আছে একমার জ্যোতিদা।
সে হলো গান্ধীপন্থী। বাদিও সম্পূর্ণ সংস্কারম্ভ উদারপ্রকৃতির ম্বক।
সে-ই আমার অন্ধের চক্ষ্ব, বিধরের কর্ণ।

তার পর, রঙ্গ, তুমি তা হলে আমার 'রাখীবন্ধ' স্বীকার করলে! আমার বড় ভর ছিল তুমি হয়তো আমার শতে রাজী হবে না, রাখী ফিরিয়ে দেবে। দিলে আমি কী করতে পারতুম, বল! অবলা নারী আমি। সংসারে আমার আপনার বলতে কে আছে! মা বাবা তো সাফ বলে দিয়েছেন যে মা না হলে তাঁদের বাড়ী যাওয়া নিষেধ। দাদা তো সেই

ব্যাপারটার পর থেকে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। দিদিরা হিংস্টে।
তাদের ধারণা আমি তাদের বরদের জাদ্ব করব বলে মোহিনী রূপ ধরে
এসেছি। ছোট বোনটা আমার অনুগত ছিল। কিন্তু তার বর তাকে চোখে
চোখে রেখেছে, পাছে আমার মতো বকে যায়। আত্মীয় শ্বজন যে যেখানে
আছে সকলের মনোভাব মোটের উপর একই রকম। পাঁচ বছর হলো বিয়ে
হয়েছে, কেন এতদিন মা হইনি? মা না হলে নারী নিরাপদ নয়। তাকে
দিয়ে অন্যের অনিষ্ট হতে পারে। অন্যের শ্বারা তার সর্বনাশ হতে পারে।
তার শ্বামী আবার বিয়ে করতে পারে। তার পর মা হতে পারলে কত
বড় একটা নিশ্চিতি! শ্বামী তাড়িয়ে দিলে ছেলে প্রেবে, প্রামী মারা
গেলে ছেলে সহায় হবে, ছেলেই নারীর জীবনবীমা। সকাল সকাল মা
হয়ে রাখাটা শেষ বয়সের অন্নসংস্থান। আমার মতো নির্বোধ আর কে
আছে!

সন্তু আমার ছোট ভাই আমাকে ভব্তি করে। তার মতে আমিই ঠিক।
সে বে'চে থাকুক। আপদে বিপদে সে-ই একমান্র ভরসা। মাঝে মাঝে
দেখা করে যায়। বলে, "সেজদি, আমি বড় হলেই তোকে এখান থেকে
নিয়ে যাব। ক'টা দিন সব্র কর।" ছেলেমান্য, ও কী ব্যথবে, কেন
আমি সব্র করতে নারাজ। তুমি ওর চেয়ে বড়। তুমিও কি বোঝ!
শ্বনে অভিমান করলে তো?

রুপালীর কথা যা বলেছ তা মানি। তাকে স্বাধীনা হতে হবে সব আগে। কিন্তু মরে যাই তোমার রুচি দেখে! স্বাধীনা নারীর আদর্শ হলো কোথাকার এক বোষ্টমী! তোমার চিঠি পাবার পর মুহুত থেকে তোমার সংগ ঝগড়া করছি এই নিয়ে। এখন ব্রুলে তো কেন আমার মন ভালো নেই। ওসব মেয়ের সংসর্গ ছাড়ো। ওরা ডাকিনী। তোমার সর্বনাশ করবে একদিন। আমি তোমার রাখীবন্ধ বহিন। তোমাকে রক্ষা করা আমারই তো কর্তব্য। কী করে রক্ষা করব এত দ্র থেকে? যদি তুমি আমার কথা না শোন। রক্ষ, তোমার যদি আমার উপর কিছ্মাত্র মমতা থাকে তুমি চতুরীর দিকে আর তাকাবে না, ওর চাতুরীতে ভূলবে

না। আমার মাধার দিব্যি রইল। তোমার জন্যেই আজ আমার এ মাধা-ব্যথা। ইতি।

তোমার রাখীবন্ধ বহিন

গোরী যে গ্রেশ্তার হয়নি, ললিত যে ছাড়া পেয়েছে, এ দর্টি খবর রক্লকে তৃশ্তি দিল। তবে ললিতের বিয়ের কথায় সে একটরও খর্লি হতে পারল না। যাকে ভালোবাসে না তাকে বিয়ে করবে, নিজে জনলবে, আরেক জনকে জনলাবে—কে জানে, হয়তো আয়ো একজনকে। কী দরকার ছিল এর! জেল থেকে বেরিয়ে আসা কি এতই জর্বির! এলেই দেশ স্বাধীন হবে!

রত্ন লক্ষ করেছিল শ্রীমতী এবার গোরী বলে স্বাক্ষর করেনি, ভালোবাসা জানারনি। রত্ন যে ওসব চার বা আশা করে তা নর। বরং ওসব দেখে বিব্রত বোধ করে। ওর চেয়ে এই ভালো। তব্ তার মনের কোণে কাঁটা খচখচ করে। গোরী অন্যোদন করে না চতুরীর প্রতি তার সরস মনোভাব। তার সপ্রশংস দ্ভিট। গোরী সন্দেহ করে চতুরীকে।

বৈষ্ণবী যে স্বাধীনা এই সরল সত্যের দিকে চোখ বুজে থাকতে হবে, এ কী বাদশাহী ফরমান! রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই! চতুরীকে সে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে। বয়সে অনেক বড়। কাছেই কোনোখানে ওর আখড়া। কিন্তু এক আখড়ায় বেশী দিন ও থাকবে না। মাঝে মাঝে অদর্শন হয়ে যাবে। এক বছর কি দ্বৈছর বাদে ফিরবে। ইদানীং রক্স নিজে প্রবাসে থাকে, চতুরীর খোঁজখবর রাখে না, দৈবাং দেখা হয়়। ও যেমনটি ছিল তেমনিটি আছে। ওর বয়স বাড়েনি বোধ হয় দশ বছর ধরে। এদিকে রক্স আর ছোট ছেলেটি নয়। কত বড় হয়েছে। এককালে যা শ্বেন হাঁ করে থাকত এখন তা শ্বনলে নাক কান সিপ্র হয়ে ওঠে, ল্বকোতে পথ পায় না। "কই, আমার মনোচোরা কই গো? আমার নাগর কোথায়?" রক্স এসেছে জানলে বৈষ্ণবীও আসে।

র্পসী নয়। রসবতী। হাবে ভাবে চলনে বলনে কটাক্ষে রসের ঝরণা ঝরছে। কেমন চ্ড়া করে কেশ বাঁধে। মোহন চ্ড়া। শম্ভূ চ্ড়া। অর্ধেক

রছ ও শ্রীমতী

আকর্ষণ ঐ কেশে। বাকীটা স্মধ্র প্ররে। রসালাপে। ক'টি বাউল বৈষ্টেম পার করেছে সেই জানে। জ্যাঠাইমা এই নিয়ে পরিহাস করলে সে অপ্রতিভ হয় না। বলে, "মধ্য থাকলে ভ্রমর আসে। ফ্লের অপরাধ কী?" গ্রনগ্রনিয়ে ওঠে, "ও সে রসিক ভ্রমর জানে ফ্লের মর্ম অরসিক তা জানে না।"

কই, কখনো তো মনে হয়নি বে সে ডাকিনী। তার একখানা ভালো কাপড় কি গয়না নেই, বাক্স কি তৈজস নেই, জমি নেই, বাড়ী নেই, সেসব দিকে নজর নেই। ডাকিনী হলে কি সে গ্রছিয়ে নিত না? এমন কারো নাম শোনা যায় না যার কাছ থেকে সে কখনো টাকাকড়ি গয়নাপত্র নিয়েছে বা আর কোনো উপহার। যেদিন যেট্কু দরকার—চাল কি ডাল কি তেল কি ন্ন— সেইট্কু তার ভিক্ষা। তার বদলে সে যা দিয়ে থাকে তা বহুগুণ ম্লাবান। তার গান শ্নতে পাড়ার মেয়েরা ভিড় করে। কান ভরে ভিক্ষা নিয়ে যায় তার কাছ থেকে। তার পর প্রাণভরে নিন্দা করে। তারা যে স্বাধীনা নয়।

গোরীর দ্'খানা চিঠির জবাব বাকী। কিন্তু রক্সর হাতে সমর ছিল না। সে তার আত্মীয় ও বন্ধাদের সভেগ দেখা করে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। হীর্ চলল তার সভেগ স্টেশন অবধি। প্রতি বারের মতো। পথের জন্যে কিছু সন্দেশ রেখে গেল।

কলকাতায় মাসিকপত্র মহলে ঘোরাঘ্ররি করে দিন দ্বই কাটল। নবনী ইতিমধ্যে পৌ'ছেছিল। সেই হলো তার পা'ডা। রত্নর নাম কেউ কেউ শ্রেছেলেন, কিন্তু নবনীর মুখ চিনতেন অনেকেই। সে মুখ একটি প্রিয়দর্শন সৌম্য স্বজনের।

নবনী ললিতের বিয়েতে বরষান্ত্রী হবে। সে চায় রত্নও যেন হয়। এ রক্ষ একটা বিয়েতে যোগ দিতে অর্নুচি নেই নবনীর। সে নিজেও তো এই রক্ষ একটা বিয়েতে বর সেজেছে। কিন্তু রত্ন বিশ্বাস করে না প্রেমবিরহিত বিবাহে।

নবনীর গারে লাগে। সে অভিমান করে বলে, "আমাদের দেশের মেয়েদের তুমি চেন না। বিয়ে না করলে বা বিয়ের আশা না জাগালে কোনো মেয়ে

তোমাকে এমনি ভালোবাসবে না। এমনি ভালোবাসার জন্যে কি তুমি বোঁবন ভোর করে দেবে নাকি? একদিন না একদিন তোমার হোঁশ হবে। হার, দিন যে গেল! তখন লালাবাব্র মতো তুমি সংসারত্যাগ করবে না, বিয়ে খা করে সংসারী হবে। আমি না হয় দ্বিদন আগে থাকতে করে রেখেছি। আর ভালোবাসার কথা যদি বল, বিয়ের আগে যা মেলে না বিয়ের পরে তা মেলে। কোনো মেয়েই তোমাকে বণ্ডিত করবে না। তোমার জন্যে সর্বস্ব দেবে, রতন।"

রত্ন খং ধরে। "আমাকে নয়। তার স্বামীকে।"

"তুমিই তো তার স্বামী।"

"উ'হ্ । আমি আমি। স্বামী স্বামী। একই ভালে দ্ই পাখী বসলে দ্ই এক হয়ে যায় না। যে মেয়ে স্বামী বলে আমাকে ভালোবাসবে সে স্বামীকেই ভালোবাসবে। আমাকে নয়। যে মেয়ে আমি বলে আমাকে ভালোবাসবে, সে আমাকেই ভালোবাসবে। স্বামীকে নয়। স্বামীর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে আমার তাতে কী? আমার জন্যে যদি অতি সামান্য কিছ্ ত্যাগ করে সেই আমার কাছে সর্বস্বের অধিক। কারণ তার স্বটাই আমার। স্বাস্ব্ । তেমন মেয়ে কি ভূভারতে নেই? সাত্যি জান, নবনী?"

নবনী এক কথায় উড়িয়ে দেয়। "নেই।"

"তা হলে আমার জর্ড় নেই এ দেশে। আমাকে দেশান্তরী হতে হবে।"
তা শর্নে নবনী আরো ক্ষ্মে হয়। তকটা মোড় ঘোরে। কখন এক সমর
ওরা প্রেমবিরহিত বিবাহ থেকে বিবাহবিরহিত প্রেমে পৌ*ছয়।

নবনী চমকে উঠে বলে, "তার মানে কী হলো? চণ্ডিদাস ও রামী?" "আমি হলে বলতুম, রাধা ও কৃষ্ণ।"

নবনী আঁতকে ওঠে। "না, না। আমি ভাবতেই পারিনে। তেমন প্রেম যদি অশরীরী হয় তবে অতৃপিত রেখে যায়। আর যদি শরীরী হয় তবে গন্ধ করে। কামগন্ধ।"

রত্ন হেসে বলে, "মন্দ্র পড়লে আর গন্ধ থাকে না? আহা! মন্দ্রশন্তি!" নবনী অপ্রস্তৃত হয়, কিন্তু নিরুত হয় না। তখন রত্ন এই বলে শেষ করে দেয় যে, "কেউ কারো উপরে জোরজার না করলেই হলো। সেইটেই মন্দ।

আর কিছুই মন্দ নয়। আমি কখনো কারো উপরে জাের খাটাতে বাব না। কিন্তু কেউ যদি খ্মি হয় ও খ্মি করে তা হলে রসের ভিতর দিয়ে যাব। মন্দ্র পড়তে আমার আপত্তি থাকবে না, তবে সমাজের আপত্তি থাকতে পারে।"

দশ

পশ্চিমে ফিরে গিয়ে রত্ন দেখল প্রভাত আরো আগে ফিরেছে ও পড়াশনুনায় ডুব দিয়েছে। ললিতের বিয়েতে যাবে কি না প্রশ্ন করায় এক ট্রকরো কাগজ ছি'ড়ে নিয়ে তাতে লিখল, "না।" লিখে রত্নর দিকে বাড়িয়ে দিল। বিচিত্র ব্যাপার! রত্ন অবাক হলো। তখন প্রভাত আবার লিখল, "খ্রশবন্ত সিং দার্ণ পড়ছে।" অর্থাৎ তার প্রতিযোগী তাকে ছাড়িয়ে যাছে।

রত্মর সংশ্যে যার প্রতিযোগিতা সে বিদ্যাপতি। সে যদি দার্ণ পড়ত বাধ্য হয়ে রত্মকেও মৌনীবাবা সাজতে হতো। সৌভাগ্যের বিষয় সে রত্মর প্রাধান্য মেনে নিয়েছে। চ্যালেঞ্জ করেনি। তাতে দ্ব'পক্ষের স্কবিধা। কাউকে দার্ণ খাটতে হয় না। তা হলেও প্রথম শ্রেণীটা তো পেতে হবে। সেটা অনায়াসলভ্য নয়।

প্রথম শ্রেণীর মান রাখতে হলে রীতিমতো কসরং করতে হয়। কারিক নর, মানসিক। কসরং করতে করতে যা হওয়া যায় তার নাম ইনটেলেকচুয়াল। এটা অনেকের পক্ষে—অনেকের কেন, সকলের পক্ষে—শলাঘার বিষয়। কিন্তু রম্ন এর জন্যে কুন্ঠিত। কুন্তিগির হওয়ার চেয়ে স্প্রেম্ হওয়া তার কাছে কাম্য। কারণ ওতেই সোন্দর্য। মনোরাজ্যে স্প্রেম্ হওয়া বলতে বোঝায় স্বর্সিক হওয়া। স্ব্যম হওয়া। এর প্রস্তৃতি অন্য প্রকার।

তা ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল হয়ে মান্য সত্যকে জানতে পারে, কিল্ছু সৌন্দর্য-বোধ বিকশিত না হলে স্ন্দরকে জানতে পারে না। সত্যকে জানবে অথচ স্ন্দরকে জানবে না, এর কোথাও একটা ফাঁকি আছে। সেই ফাঁক দিয়ে সত্যও বেরিয়ে যাবে। বিশেলষণ শক্তির সংগে সংশেলষণ প্রতিভা ব্রন্ত না হলে সমগ্র দর্শন হয় না। যা হয় তা খণ্ড দর্শন। অন্থের হাতী দেখা। রত্নর এতে বিশ্বাস ছিল না।

তার পর মাদতন্কের সভেগ সভেগ হৃদয়েরও অনুশীলন চাই। মহৎ অদতঃকরণ না হলে বৃহৎ মনীষা নিয়ে মানুষ করবে কী! যা করবে তা অনাস্থি। মন্ততন্তের মতো যন্ততন্ত্র। মানুষ নিজেই একটা যন্ত হয়ে যাবে, কিংবা একটা ময়দানব। রত্ন সেইজন্যে বিশ্বন্থ ইনটেলেকচুয়াল হতে অনিচ্ছ্রক। পরীক্ষায় বিফল হতে অবশ্য চায় না। কিন্তু সফল হলেও সে অবিমিশ্র স্থী হতে পারে না। শংকা জাগে পাছে তার ভিতরকার রস শ্রকিয়ে যায়। রাসক অদৃশ্য হয়। প্রথম শ্রেণীতে পাশ না করলে তার আত্মবিশ্বাস কমে যাবে, কিন্তু তা করতে গিয়ে সে হৃদয়বৃত্তির অবহেলা করতে রাজী নয়।

অঞ্জন একরাশ ফোটো তুলে এনেছিল। হিমালয়ের বিবিধ দৃশ্য। বিদ্যা-পতি সেই সব আলোকচিত্রের বর্ণচ্ছিটাময় বর্ণনা দিয়ে বন্ধন্দের বিমন্থ রাখল। রত্মর মনে হতে থাকল সেও তাদের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে গেলে ভালো করত। না গিয়ে ভূল করেছে।

একট্ব স্থির হয়ে বসার পর রত্ন শ্রীমতীকে চিঠি লিখল। এত দিন কেন লেখেনি তার কৈফিয়ৎ দিয়ে ললিতের বিয়েতে কেন যাবে না তার জন্যে জবার্বাদিহি করল। আশ্বঙ্গিত প্রকাশ করল গোরী রাজবিন্দিনী হয়নি বলে। এক বন্ধন কাটাতে পারছে না বলে আরেক বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে চাওয়া ম্ট্তা। তুগ্ত কটাহ থেকে জব্লুন্ত উন্নে ঝাঁপ দিতে যাওয়া যেমন। তার পর লিখল—

গোরী, তোমার কিশোর বয়সের ওই ফোটোখানি পাওয়া আমার জীবনের একটি অনুপম অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের গানের একটি কলি আমার কানে গ্রনগ্রনিয়ে উঠছে। সেটিও শরংকালের অনুভূতি। "আমার নয়নভুলানো এলে। আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।" এদিকে যে শরং শেষ হয়ে এলো সে খেয়াল নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে অন্তরের জগতের সামপ্তাস্য হচ্ছে না। অন্তরে ধর্নিত হচ্ছে, "আমার নয়নভুলানো এলে।"

মান্বের যতগ্রেলা বয়স আছে তার মধ্যে কৈশোর শ্রেষ্ঠ। "বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ।" মনে পড়ে যায় আমার হারানো কৈশোর। ফিরে যেতে

রছ ও শ্রীমতী

ইচ্ছা করে সে বয়সে। হার, সাত সমৃদ্র তেরো নদী পার হয়ে যেতে পারি, কিন্তু সাতটি বছর পেরিরে যেতে পারিনে! মুখে চোখে আনতে পারিনে সে লাবণ্য, সে লালিতা। সেদিনের সেই আধাে আলাে আধাে ছায়া অস্পণ্ট অস্ফুট মন আজ কােথায়! পিছন ফিরে তাকাতে স্প্তা নেই। জানি সেসব আজ রুপকথা। "এক যে ছিল রাজা" বেমন, তেমনি "এক যে ছিল কিশাের।"

আমার কৈশোরকে আমি তোমার কৈশোরের প্রতির্পে প্নরাবিষ্কার করল্ম। রুপ তোমাকে ভগবান দিয়েছেন। আমাকে দেননি। ওই দিনপথ কমনীয় রুপ কি এখনো তেমনি আছে? ওই জ্যোৎদনার মতো রুপ? গোরী, তোমাকে দেখতে কি আমার অনিচ্ছা! কিন্তু সম্ভব নয়। আমি ব্যুস্ত। আর আপনাকে দেখাতে আমার কুপ্ঠা। আমি চির দিনই লাজ্মক। ল্যুকিয়ে ল্যুকিয়ে বেড়াই। ছেলেদের সামনেই বেয়োতে লভ্জা। মেয়েদের সামনে তো আরো। আমাকে আমার নিভ্ত পরিবেশে না দেখলে চেনা যায় না। হাটের মাঝখানে যাকে তুমি চিনবে সে আমি নয়, আমার দ্বনামা কোনো ব্যক্তি। গোরী, জান তো, সেই রাজপ্রত রানীর স্থেগ হ্মায়্মন বাদশার কোনো দিন চোখের দেখা ঘটেনি। তবে আমাদের বেলাই বা কেন ঘটবে?

যার দিকে তাকাতে বারণ করেছ তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাং হর্য়ান। নিকট ভবিষ্যতে হবেও না। পরীক্ষার পর যদি আমি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ি তা হলে কি আর কোনো দিন দেখা হবে জীবনে! কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুযোগ আছে, গোরী। রাখীবন্ধ ভাই কি আঁখিবন্ধ ভাই? আমার যদি কাউকে ভালো লাগে তার দিকে আমি তাকাতে পারব না? তা হলে স্বরদাসের মতো দ্'চোখ বি'ধে অন্ধ করে দিলে হয়! না চোখে ঠুলি পরব কল্বে বলদের মতো? প্রকৃতির বিচিত্র দ্শোর মতো নারীর বিচিত্র রূপ মানুষমান্তেরই দর্শনীয়। আমি কি মানুষ নই? রুপ দিয়ে কি আমি আমার দ্'চোখ ভরে নিতে পারব না? রস দিয়ে আমার অন্তর? তবে কেনই বা জন্ম নিল্ম এ লোকে? কেনই বা বাঁচব?

রছ ও শ্রীমতী

ধনসম্পদ আমি চাইনে। সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই। আমার ঐশ্বর্ষ আমার ভিতরে। কিম্তু এই ভিতরটাকে ক্রমাগত ভরিয়ে নিতে হয়। চোখ দিয়ে কান দিয়ে অন্যান্য ইন্দিয় দিয়ে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে ধ্যান দিয়ে ভরিয়ে নিলেই আমি ঐশ্বর্ষবান। নইলে আমি নিঃস্ব। নিঃস্বের কাছে তুমিই বা কী পাবে, গোরী? সেইজন্যে বলি, আমাকে চোখ ব্রজে থাকতে মাথার দিব্যি দিয়ো না। চোখ কান খোলা না রাখলে আমার ভিতরটা দ্বিকয়ে যাবে, যেমন শ্বিকয়ে যায় প্রেকরিণী উৎসম্খ রুখ হলে।

চিঠিতে চতুরী সম্বন্ধে আর যা লিখবে ভেবেছিল তা লিখল না রয়।
চিঠিখানা শেষ করে দিল সহান্ত্তির স্বরে। সহান্ত্তি গোরীর নির্বাধ্যব
দশার জন্যে। বাপ মা ভাই বোন কেউ তার সহায় নয়। সকলের সংগ্র
নিঃসম্পকীর্যাতা। কে একজন জ্যোতিদা তার একমান্ত নির্ভার। তাঁকে ধন্যবাদ।
রাজনীতি প্রসংগ্রের একটি কথাও লিখল না। তার মন তখন রাজনীতিবিম্বধ।
তা বলে স্বাধীনতাবিম্বধ নয়। দেশের লোকের স্বাধীনতা সে নিজের স্বাধীনতার
মতোই কামনা করে।

প্রিনিসপাল একদিন কমিশনারকে হস্টেল দেখাতে নিয়ে এলেন। ইনি একটি প্রবন্ধ লিখতে দিলেন আবাসিকদের। আধ ঘণ্টার মধ্যে লিখতে হবে হস্টেল ওয়ার্ডেনের সাক্ষাতে। যে প্রথম হবে সে প্রক্ষার পাবে। রত্ন প্রথম হলো। প্রিনিসপাল তাকে ডেকে পাঠালেন। জানতে চাইলেন সে কী পেলে খ্রিশ হবে। টাকা না বই? রত্ন বলল, বই। কী বই? রত্ন নাম দিল এমন সব বইয়ের যা শ্রীমতীকে উপহার দেওয়া চলে। সব ইংরেজী যদিও। বই যেদিন হাতে এলো সেদিন কী ফ্রিত! বিদ্যাপতিরা কেড়ে নিতে চায়। সে ছাতে দেবে না। তারা ব্রুতে পারে না কেন। নতুন বই দেখলে সে নিজেই তো কেড়ে নিয়ে পড়ে তাদের হাত থেকে। কী করে তাদের বোঝায় এসব বই তার নয়, আরেক জনের!

বইগ্রেলো গোরীকে পাঠিরে চমকে দেবার মতলব ছিল রত্নর। ডাকঘরে গিয়ে পার্সেল করে এলো। পার্সেলের ভিতরে ছোট একখানা চিঠি গ‡জে দিল। তাতে

লেখা ছিল মা সরম্বতীর কাছে সে মানং করেছিল প্রস্কার পেলে প্রস্কারের বই রাখীবন্ধ বহিনকে রাখীর পরিবর্তে পাঠাবে। বইগ্রলো যে ভাষার রচিত সে ভাষা মা সরস্বতীর অজানা। তা হলেও তার আশা আছে গোরী এসব বই পড়ে ব্রুবরে, না ব্রুবলে জ্যোতিদার কাছ থেকে ব্রুবে নেবে।

ইতিমধ্যে গোরীর চিঠি এলো। বই পাবার আগে লেখা। সাব্র বিয়ে নিয়ে ব্যতিবাসত। এক দণ্ড ফ্রসং পাছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছে। কলমের কালি ফ্রিয়ে যাওয়ায় পেনসিল দিয়ে। ব'টি দিয়ে কাটা পেনসিল। জন্মদিনে তোলা ফোটো এনলার্জ হয়ে এসেছে। একখানা প্রিণ্ট আলাদা করে পাঠাছে। ভালো ওঠেন। চেহারাও তো খারাপ হয়ে যাছে। যাবে না? খাঁচার পাখাঁর কি রঙের বাহার থাকে?

রত্ন, আমার রুপের দেদার সুখ্যাতি শুনুনেছি। কিন্তু তোমার মুখে ষা শুনলুম তা একজন জহুরীর অভিমত। আমার আক্ষেপ শুধু এই ষে সুখ্যাতিটা আমার এখনকার পাওনা নয়। যখনকার পাওনা তখন যদি তুমি থাকতে! তোমাকে আমার এখনকার ফোটো পাঠাতে আমার সাহস হয়নি। হতো না। কিন্তু ওই যে তুমি জানতে চেয়েছ আমার রুপ কি এখনো জ্যোৎস্নার মতো আছে, ওই জিজ্ঞাসার উত্তর আর কী ভাবে দিতে পারি? না, নেই, বললে কি তুমি বিশ্বাস করতে? এখন দেখ। বিশ্বাস কর।

তুমি আসছ না জেনে রাগ করেছি। খবরটা আমি প্রথমে পাই লালিতের কাছে কলকাতার। সে পেরেছিল নবনীর কাছে। তুমি নাকি এ কথা বলেছ যে তুমি এ বিবাহ সমর্থন কর না? কেন, মশার? লালিত সাব্বকে ভালোবাসে না বলে? কিন্তু সাব্ব তো লালিতকে ভালোবাসে। সে-ই বা কী করে আর কাউকে বিয়ে করবে? না সারা জীবন আইব্রুড় থাকবে? মেরেদের দিকটা তোমরা দেখবে না, ব্বববে না, ভাববে না। আমি যা করেছি তা সাব্র মণগলের জন্যে করেছি। লালিতেরও মণগলের জন্যে। সাব্র মতো বৌ পেলে ও বর্তে যাবে। ভালোও বাসবে। তুমি দেখবে আমার কথা ফলে কি না ফলে।

হাঁ, কলকাতা যেতে হয়েছিল সাব্র জন্যে গয়না পছন্দ করতে। মাসীর বাড়ী উঠেছিলুম। তুমি যদি আর কয়েকটা দিন দেরি করতে তা হলে কলকাতায় দেখা হতে পারত। তা আমিও তো আগে জানতুম না যে কলকাতা যাবার অনুমতি মিলবে। জানলে কি তোমাকে জানাতুম না?

রঙ্গর নামে ফোটো এলো আলাদা ডাকে। সে তখন কলেজে। পিয়নের হাত থেকে নিয়ে চাদরের আড়ালে ল্বকিয়ে রাখল। ছেলেরা দেখলে ছিনিয়ে নিয়ে খ্লে দেখত। চারটের পর ঘরে গিয়েও কি নিরিবিলি পাবার জো আছে! একজন না একজন আসবেই। আড়া দিতে কিংবা পড়া ব্বে নিতে। সন্ধ্যাবেলা বইপত্র সামনে রেখে বসতে হয়। প্রিফেক্ট্ ঘ্রুরে বেড়ান। স্পারিনটেনডেণ্ট টহল দেন।

রাত্রে শ্তে যাবার সময় রত্ন দরজায় খিল দিয়ে ফোটোখানা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তুলে ধরল। পোল্টকার্ড সাইজ। একাকিনী শ্রীমতী। একটি বৃহৎ ফ্লের তোড়া ব্কে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছে। দেশী ও বিলিতী নানা জাতের নানা রঙের ফ্ল। ও ফ্লের আড়ালে ঢাকা পড়েছে আরো দ্বিট ফ্ল। যৌবনের ফ্ল। ঘন কালো চুল কিন্তু শাদা ঢাকাই শাড়ী দিয়ে ঢাকা থাকছে না, ফ্টে বেরোছে। ছ্টে আসছে সামনের দিকে সম্দের লহরীর মতো। মাথার কাপড় খসা। ঘোমটার ভাণ নেই। মূথে রীড়াজড়ানো হাসি। সে হাসি চাউনিতেও। চাউনিতে আরো কিছ্ম আছে। মাদকতা, মদিরতা, বিলোলতা, বিদ্যুৎ, বহিং। প্রভাত হলে বলত, প্যাশন। রত্ন বলবে, জাদ্ব।

অলঞ্চার বলতে দ্বাতে দ্বাগাছি সোনাবাধানো শাখা। বাঁ হাতে নোয়া ও শোখীন হাতঘড়ি। নিরাভরণ হয়ে তার রুপ আরো খুলেছে। কৈশোরে যা ছিল দিনপ্ধ কমনীয় যোবনাগমে তা তীব্র রমণীয়। যে ছিল রজনীগন্ধা সে হয়েছে কেতকী। তখনকার বয়সের লালিত্য নেই, লাবণ্য নেই, তার জায়গায় এসেছে প্রাণোচ্ছলতা, প্রখয়তা। ভরা নদীর খয় ধারা। নিরীহতা নেই, তার জায়গা নিয়েছে তত্তা। কিল্ডু প্রসাধন বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষিত হয়। যেন কোন উদাসিনী রাজকন্যা।

আট নমাস আগে রক্ষ কি জানত যে এ জগতে শ্রীষতী বলে কেউ আছে, যাকে দেখতে এ রকম? প্রভাতের জবানীতে তার নাম ও বর্ণনা শন্নে চমক লেগেছিল। সেই সংগ্য ভয়। তাজ্ঞব ব্যাপার! শ্রীমতীকে রক্ষ চোখেও দেখেনি, দেখবে বলে মনেও হয় না। তার সংগ্য আলাপ নেই, পরিচয় নেই, এমন কোনো স্ত্র নেই যে স্ত্র ধরে আলাপ পরিচয় হয়। কোথায় শ্রীমতী আর কোথায় রক্ষ! মাঝখানে দৃশ্তর ব্যবধান। তব্ ভয় একজনকে আরেক জনের। সেই আট নমাস আগে গণগার ধারে প্রথম শ্রবণে।

কেন ভর? রত্ন আত্মবিশেলষণ করেছিল। ভর প্রভাতবর্ণিত প্যাশনকে ও রত্নকলিপত বরসকে। কিন্তু বরসে তো মালাদিও বড়। তাঁর বেলা ভর নেই কেন? দ্বর্বোধ্য প্রহেলিকা। প্রহেলিকার উত্তর কি এই যে মালাদির সখেগ রত্নর সম্পর্ক নিরাপদ? তা যদি হয় তবে শ্রীমতীর সখেগ তো কোনো সম্পর্ক হৈ নেই তার, সেটা আরো নিরাপদ। রত্ন তখন কম্পনাই করেনি যে শ্রীমতী তাকে একদিন চিঠি লিখবে, তার চিঠি পেয়ে ক্ষান্ত হবে না, আবার চিঠি লিখবে। আবার চিঠি পাবে। এমনি করে দ্ব'জনের যোগাযোগ ঘটবে।

ইতিমধ্যে বয়সের ভয়টা ভেঙেছে। প্রীমতীই ছোট। কিন্তু প্যাশনের ভয়?
প্রথম ফোটোতে প্যাশনের বিন্দ্রবিসর্গ ছিল না। দ্বিতীয় ফোটোতে বা আছে
তা প্যাশনের নয়, জাদ্বর সম্মোহন। ওই তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেয়ারের
কাঁধে ডান হাতটি রেখে। বাঁ হাত ব্বকে চেপে। ফ্ল দিয়ে ফ্ল ঢেকে।
একটি শ্বেতপদ্ম আর সব দৃশ্যমান প্রপকে নিষ্প্রভ করেছে। ওটি যেন গোরীর
অন্তরের শ্ব্রতা। তার জীবনের কুংসিত অভিজ্ঞতা যেন ওই পদ্মপ্রের জল।

একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ রত্নর চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। আছে, প্যাশন আছে। কিন্তু নয়নে নয়, অধরে। আর ওপ্টে। রত্ন অবাক হলো, শব্দিকত হলো, তাড়াতাড়ি ফোটোখানা বাক্সবন্দী করে আলো নিবিয়ে দিয়ে শ্রুরে পড়ল। প্রাণপণে জপ করতে থাকল, মালাদি, মালাদি। এই তার মালাজপ। ধারে ধারে তার মনশ্চক্ষে ফ্রুটে উঠল মালাদির মূখ। সে ম্বেশে ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, আছে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যভাব। তিনি বেন কোন স্বর্গদৃত বা এঞ্জেল। যাঁর দেহ বলতে কিছ্বু নেই। দ্যুতি বেন

রছ ও শ্রীমতী

ম্তি ধরে নেমে এসেছে ভক্ত উপাসকের ভর ভঞ্চনের জন্যে। রক্স নিশ্চিক্ত হলো।

মালাদির সংগে দেখা হয়েছিল শেষ বার গত বড়াদনের সময় কাশীধামে।
রক্ষ যাছিল একটা দলের সংগে আগ্রা দিল্লী লখনউ বেড়াতে। পথে কাশীধামে
একটা দিন থামতে হয়েছিল। শ্নেছিল মালাদির মা তাঁকে নিয়ে কাশীবাস
করছেন। তাঁর বাবা কলকাতায় অন্যান্য সন্তানদের সংগে থাকেন। দলের
কাছ থেকে এক ঘণ্টার ছন্টি নিয়ে সে মালাদিকে দেখতে যায়। দেখে মালাদি
শয্যাশায়ী। তাকে পাশে বসিয়ে গণ্প করলেন। সহজে উঠতে দিলেন না।
না খাইয়ে ছন্টি দিলেন না।

প্রাইভেট ম্যাট্রিক পাশ করে মালাদির মন গেল কলেজে পড়তে। কিন্তু কলকাতা তাঁর সহ্য হলো না। তীর্থস্থানে থাকলে অন্তরে শান্তি পান। কাশীতে কলেজও আছে, শান্তিও আছে। তাই কাশীতে অবস্থান। কিন্তু নির্মাত কলেজে হাজিরা দিতে পারেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠার বসে থাকলে পিঠ ব্যথা করে। ননকলেজিয়েট পরীক্ষা দিতে চান, ভালো একজন প্রাইভেট টিউটর চাই। কিন্তু তেমন লোক বহু দিন সন্ধান করেও মেলেনি। যেই আসে সেই ধরে নেয় যে মালাদির বুন্দিধ কম, তাঁকে বকাঝকা করে। তা তো নয়। অকালবৈধব্যের দ্বঃসহ আঘাতে তাঁর বুন্দ্রিশ্রণ্ণ হয়েছিল, অতি কন্টে স্বাভাবিক বুন্দিধ ফিরছে। মেধা এখনো দুর্বল।

ভালো টিউটর হবেন সহান্ত্তিশীল, ধৈর্যবান, ধীর। টাকা খরচ করলেই তেমন লোক পাওরা যায় না। তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, প্রার্থনা করতে হয়। মালাদির মনে হচ্ছে তেমন মান্য একজন আছেন, তিনি পেশাদার টিউটর নন। তাঁর খাশি হলে তিনি পড়িয়ে যান। ইতিমধ্যে দাটি একটি ছারছারীকে পড়িয়েছেন, বেতন নেননি। বাঙালী। বাংলাদেশে এম এ পাশ করার পর অন্তরীন হন বা অন্তরীন হবার পর এম এ পাশ করেন। তার পর দিল্লীতে গিয়ে হোমিওপ্যাথী করেন। সেখান থেকে বন্বে গিয়ে জ্যোতিষী হন। এইসব করতে করতে তাঁর বয়স হয় পায়িরশ কি ছবিশ। তখন কাশীতে

বছ ও শ্রীমতী

এসে থিওসফি চর্চা করেন। অঞ্চতদার। স্বল্পাহারী। কোনো রক্ষে চলে যায়।

মালাদিকে সেদিন মিসেস ব্রাউনিংএর মতো দেখাচ্ছিল। তেমনি রুগ্ণ দুর্বল ক্ষ্মণকায় অথচ স্বগাঁর আভায় ভাস্বর। মানুষ তো নর, দীপশিখা। মোমের মতো শরীর যেন মোমবাতির মতো প্রভছে। কিন্তু আত্মায় এতট্বকুও দীনতা নেই, গ্লানি নেই। তাঁর সংগ কিছ্বক্ষণ থাকলে আপনাকে পবিত্র মনে হয়। পাগলের মতো একটা খেয়াল মাথায় চাপে। ইচ্ছা করে ব্রাউনিংএর মতো এই এলিজাবেথ ব্যারেটকে লুট করে নিয়ে পালিয়ে যেতে। ঘোড়ার পিঠেবসিয়ে। তা হলে দু'জনেরই পূর্ণ বিকাশ হতো। মালাদিও বাঁচতেন, রত্বও স্থিতিত্পের হতো।

এলিজাবেথ রাজী ছিলেন, মালাদি নারাজ। রত্নও উৎসন্ক নয়। সত্যি বলতে কি তার জীবনের পরিকল্পনায় মালাদির স্থান প্রবিৎ ছিল না। তাঁর সংগ তার ভালো লাগে, তাকে প্রেরণা দেয়। কিন্তু তাঁর ভানস্বাস্থ্যের দায় নিতে তার স্বতঃস্ফৃত অভিরন্তি নেই। সে স্বাধীন বিহণ্গের মতো দেশে দেশে উড়ে বেড়াবে সামনের দশ বছর। পরে ইয়তো কোনো এক দ্রগম অরণ্যে বা গ্রামে গিয়ে বসতি করবে। সেখানে তার সাথী হবে কোনো এক মাটির মেয়ে। চাষানী কি মেঝেন। নিটোল স্বাস্থ্যবতী, কর্মক্ষম, সন্তানবহনপট্। মালাদি না-মঞ্জন্ত্র। কিন্তু এ হলো অনেক দ্রের কথা। এই মৃহ্তে তার সংগে সম্পর্ক কাটানোর ভাবনা ভাবতে পারা যায় না। এখনো তিনি তার হাদয় জ্বড়ে রয়েছেন। তাঁকে তার দরকার আছে।

একলব্যের মতো সে একজনকে সম্মুখে রেখে প্জা করতে করতেই প্রেমশিক্ষা করবে। প্রেমিক হবে। শুখু স্বাধীন হয়েই তার তৃপিত নেই। সে যুগপৎ স্বাধীন তথা প্রেমিক হবে। মালাদি তার প্রেমগ্রের। ষারা প্জা করে তারা নিষ্কাম নয়, তারা ফলাকাঙক্ষী। রক্ষ কিন্তু তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। দিন দিন তার প্রেম শুষ্থ হচ্ছে। বাসনা কামনা থেকে শুষ্থ। সে দিতে চায়, নিতে চায় না। সে শিক্ষানবীশ। যারা শিক্ষানবীশ তারা গ্রেদক্ষিণা দেয়। পরিবর্তে তাদের কোনো রুপ দক্ষিণা পাবার কথা নয়।

তারা বুদি কিছ্ম পায় তবে তার নাম দাক্ষিণা। মালাদি বদি খ্রিশ হয়ে সংগ দেন তবৈ রত্ন খ্রিশ হয়ে সংগ পাবে। কিন্তু স্থ্ল অর্থে নয়। এখনো কেউ কারো গায়ে হাত দেয়নি। সেবাচ্ছলেও না।

শেষবার দেখার পর প্রায় এক বছর হতে চলল। এই এক বছরে রক্পর প্রশাচিতনা আরো স্পন্ট, আরো সাকার হয়েছে। মালাদির জীবনে যদি অত বড় একটা ট্রাজেডী না ঘটত তা হলে কি রক্প তাঁর প্রতি অতটা আকৃষ্ট হতো? শোকের আগ্নন তাঁকে দশ্ধ করেছে, তাঁকে শান্ধ করেছে। অগিনশান্ধ কাঞ্চনের মতো তিনি সন্বর্ণ। নইলে এমন কী আছে তাঁর মধ্যে যা কাছে টানতে পারে রক্পকে! তাঁর পরম সম্বল তাঁর ঐ শোক। শোক যদি তাঁর জীবনে না আসত তবে তিনি এমন মহিমময়ী হতেন না। তাঁর আধ্যাত্মিকতা শোকনির্ভার, শোকজ। এর মূল ভিতরে নয়, বাইরে। তবে এ মূল এত দিনে ভিতরে চলে গেছে। এই ক'বছরে।

সহজাত আধ্যাত্মিকতা নয়, শোকলস্থ আধ্যাত্মিকতা। প্রভেদটা ধীরে ধীরে পরিক্ষার হচ্ছিল। তাই প্রেমও ধীরে ধীরে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। যতথানি দেওয়া যেত ততথানি দিতে কুণ্ঠিত। প্রেমের সাধনায় দানকুণ্ঠতা এলে আর বেশী দ্রে অগ্রসর হওয়া যায় না। রত্ন উপলস্থি করল সে মালাদির বেলা দানকুণ্ঠ হতে চলেছে। আগে নিতে চাইত না, কিন্তু দিতে চাইত। এখন নিতেও চায় না, দিতেও চায় না। দেওয়া নেওয়া বাদ দিলে যদি প্রেম থাকে তবে প্রেম আছে। কিন্তু কত কাল থাকবে? এ কি প্রেম? না এ ভব্তি?

প্রেম হোক ভক্তি হোক যেটাই হোক যত স্বল্পকালীন হোক এখনো এর প্রভাব নিবিড়। দৃঃখশোক যার জীবনে আসে তাকে একপ্রকার আকর্ষণশক্তি দের। সে শক্তি অপরকে চুন্বকের মতো টানে। মালাদি রূপবতী নন। কেউ তাঁকে স্কুলরী বলে শ্রম করবে না। তবে ফরসাকেও তো লোকে স্কুলর বলে। মালাদি ফরসা ও ফ্যাকাশে। তাঁর মুখের গড়নটি হাতীর দাঁতের কাজের মতো খোদাই করা। রঙ্গকে মুখ্ধ করে তাঁর পক্ষ্ম। তাঁর শ্রন্কতা। তাঁর ঘন কৃষ্ণ চক্ষ্মতারকার অপাথিব দৃঃতি। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর শোকস্তব্ধ মহিমা। তাঁর দৃঃখদশ্ধ বরণ। রামায়ণের সেই ক্রেপ্তিবধ্ যেন মানবদেহ নিয়ে এসেছে।

দেহ নিরে এসেছে, অথচ বিদেহী। মালাদির সঙ্গো থাকলে দেহচেতনা থাকে না।

মোটের উপর এটা একটা মিশ্টিক সম্বন্ধ। দ্ব'জনের মধ্যে মনের মিল বা মতের মিল নেই। কারিক আকর্ষণ নেই। জীবনের পথও এক নর। তা সত্ত্বেও রক্ষর হ্দরে মালাদির আসন এখনো স্প্রতিষ্ঠ। রাত্রে শ্বতে যাবার সমর মালাদিকে মনে পড়বেই। যদিও ক্ষণকালের জন্যে। যেখানেই হোক মালাদি আছেন। তার অহ্তিত্ব অদ্শ্য থেকে রশ্মি বিকীরণ করছে। আলো আসছে কালো ভেদ করে। সে আলো আর কারো জন্যে নর, যে ভালোবাসে তার জন্যে। রক্ষ এখনো তাঁকে ভালোবাসে। প্রজা করে। কিন্তু রাউনিংজারার মতো নর। এই রোগিগণীর সেবা করার মতো থৈর্য ও দরদ তার নেই। এই শোকাকুলা নারীর ক্রোঞ্যশোক তাকে বিধ্র করে, কিন্তু লক্ষ্যদ্রভী করতে পারে না। দ্বাখিনীর দ্বাখ দ্ব করা তার অসাধ্য। আর কেউ যদি তাঁর ভার নেন সে ম্বিন্থর নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। মিশ্টিক সম্বন্ধ থেকে নর, সাংসারিক দারিত্ব থেকে ম্বিন্থ। এক কথার তার প্রেম মানবীর জন্যে নর, মানসীর জন্যে।

এগারো

ন্বিতীয় ফোটো পেরে গোরীকে কী লেখা যায় ভাবছিল রত্ন। মিথ্যা বলবে না, ঠকাবে না, বিশ্বাসের স্থোগ নিয়ে অবিশ্বাসের কাজ করবে না। তা হলে সব কথা খ্লে বলতে হয়। যা থাকে কপালে। কিন্তু তার আগে সাহস সঞ্চয় করতে হয়। রত্নর অত সাহস ছিল না যে কোদালকে সোজাস্বিজ কোদাল বলবে।

এদিক থেকে চিঠি গেল না। ওদিক থেকেই এলো আবার। গোরী তার বইগ্রেলোর প্রাশ্তিস্বীকার করেছে। ছোটু একরত্তি কাগজে পেনসিলের আঁচড়। বিরেবাড়ীর গোলমালের মধ্যে লেখা। হল্মদ লেগে আছে চিরকুটখানায়।

প্রিয়তম ভাই,

মনে বড় অভিমান ছিল তুমি এলে না। তার বদলে এলো তোমার রাশি রাশি আদর। এসব বই পড়ে ব্রুতে পারি এত বিদ্যে কি আমার আছে! ব্রে নিতে হলে তোমার কাছেই ব্রে নেব। আর কারো কাছে নয়। আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন। একটা কথা আমি খ্রু মানি। যে যার সে তার। নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার। আমার ব্রুভরা ভালোবাসা নিয়ো। ইতি।

তোমার আদরিণী গোরী

খামের ভিতরে একমনুঠো গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিল। রক্স স্বক্ষে তুলে রাখল একটি কাঁচের পারে। তাতে জল ভরে দিল। জলের উপর ভাসতে লাগল পাপড়িগনুলি। একটি ফিনশ্ব সন্গব্ধে ভরতে লাগল ঘর। বই হাতে করে উপভোগ করতে লাগল রক্ষ। মোগল উদ্যানে অধ্যয়ননিরত হুমায়নুন বাদশার মতো।

চিঠিখানিও স্গান্ধ হয়েছিল। অন্তরে বাইরে স্গান্ধ। এতট্কু চিঠি, তব্ এত স্গান্ধ! এত স্গান্ধ নিয়ে কী করবে রছ! কোথায় রাখবে! একে তো পাত্রে ভরে রাখা যায় না। এ যে ঘর ভরবে। বাক্সয় বন্ধ করে রাখলেও কি এ বন্দী থাকবে! রছ নির্পায় হয়ে ব্কে চেপে ধরল ও চিঠি। কেউ দেখে ফেললে কী মনে করত!

এ কী লিখেছে গোরী! এ ষে ভয়ত্কর কথা! এমন কথা তো রাজপন্ত রানী লেখেননি মোগল বাদশাকে। রাখীবন্ধ বহিন হলে লিখত না রাখীবন্ধ ভাইকে। "যে যার সে তার।" এর মানে কী! "নইলে মাধবের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার ছিল না রাধার।"

রত্বর বৃক দৃ্লছিল ঝোড়ো হাওয়ায় খেয়া নৌকার মতো। মন মাঝি বলছিল, সামাল সামাল। তরগের পর তরগে উঠছিল। শোঁ শোঁ করছিল বাতাস। চিঠিখানি বৃকে চেপে ধরার পরিণাম এই। বৃক থেকে কলিজার

মতো ছি'ড়ে বাক্সর বন্ধ করলেও কি পরিয়াণ আছে! বৃক্ত তেমনি তোলপাড় করতে থাকল।

ম্গনাভি বৃকে নিয়ে মৃগ যেমন অন্ধ হয়ে গন্ধ খৃজে বেড়ায় রয়ও তেমনি দিশাহায়া হয়ে দিন কাটায়। গোরী যা লিখেছে তার অর্থ কী? সহজ বৃন্থিতে তো বোঝা যায় গোরী রয়র, রয় গোরীর, নইলে রয়র পাশে দাঁড়ানোর অধিকায় থাকে না গোরীর। কিন্তু সহজ বৃন্থি এখানে পরাস্ত। অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। গোরী জানে। রয় জানে না।

তা হলে কি সে চিঠি লিখে জানতে চাইবে কী ব্যাখ্যা? না, না। তার
লম্জা করে। সব চেয়ে ভালো ও কথা ভূলে যাওয়া। ও কথা কেউ লেখেনি,
ওটা না লেখারই সামিল। যদি লিখেও থাকে তব্ বিশেষ কিছ্ম মনে করে
লেখেনি। লিখতে লিখতে মান্য কত কী লেখে। বলতে বলতে কত কী
বলে। সব কথা ধরতে নেই।

রত্ন ক্রমে শান্ত হলো। গোরী একটি খেয়ালী মেয়ে। যখন যা খেয়াল হয় তখন তা বলে বসে। না ভেবে না চিন্তে। বিয়েবাড়ীর হটুগোলে ওর মাথার ঠিক নেই। হঠাৎ এক রাশ বই পেয়ে যা মাথায় এসেছে তাই লিখে বসেছে, হাতের কাছে যা জনুটেছে তাই দিয়ে। বইয়ের বিনিময়ে দিয়েছে গোলাপের পাপড়ি। বইয়ের চেয়েও মলাবান। রত্ন সেই ম্লাবান উপঢৌকন আবার খামে ভরে বাক্সয় তুলে রাখল।

কিন্তু চিঠির একটি কথা বার বার হানা দিতে থাকল সারা দিন সারা সাঁঝ। অনেক রাত অবধি। "আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন।"—এ কি কখনো হতে পারে? আর কেউ নেই তোমার? আমিই তোমার শেষ অবলম্বন? গোরী! গোরী! কেন ও কথা বললে?

রাখীর বিনিময়ে গেল বই। বইয়ের বিনিময়ে এলো গোলাপ ফ্লের পাপড়ি। পাপড়ির বিনিময়ে কী যাবে? করবী ফ্লে। রত্ন দ্বিট করবী ফ্লে তুলে খামে ভরে গোরীর নাম লিখে রাখল চিঠি লেখার আগে। একটি রক্ত করবী। একটি শ্বেত করবী। তার পর লিখল এই চিঠি।

আমার আত্মার বোন গোরী,

তোমার ন্বিভীয় ফোটো পেরেছিল্ম, গোলাপ ফ্লের পাপড়ি পেল্ম। ফ্লের উত্তরে গেল ফ্লে। ফোটোর উত্তরে কিছ্ন না। আমার ফোটো নেই। থাকলেও পাঠাবার মতো হতো না। কিন্তু আমার কিছ্ন বলবার ছিল। বলি বলি করে এত দিন বলতে পারিনি। আজো সাহস পাচ্ছিনে বলতে। যখন বলব তখন নির্জালা সতাই বলব। তুমি রাগ করবে, জানি। সেইজন্যেই ইতন্তত করছি। তা ছাড়া তুমি তো মন্তব্য চাওনি।

তোমাকে আরো কত কথা বলতে মন যায়। কিন্তু তুমি শন্নবে কখন? ললিতের বিয়ে নিয়ে মহাব্যুন্ত। তোমার বিশ্বাস তুমি যা করছ তাই ঠিক। আমার বিশ্বাস তা নয়। যেখানে এমন গভার ব্যবধান সেখানে কেমন করে এই স্নেহের সম্পর্ক সম্ভব হলো? কেমন করে সহজ হলো? তুমি আমার মায়ের পেটের বোনের মতো প্রিয়। তোমার মা আমারও মা। আমার মা তোমারও মা। আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোন। এখন মনে হচ্ছে তুমি ভিন্ন আমার আর কোনো বোন নেই। আমি ভিন্ন তোমার আর কোনো ভাই। সেই জন্যে তুমি লিখেছ, "আর কে আছে আমার! তুমিই আমার শেষ অবলম্বন।" কথাটা আমাকে পেয়ে বসেছে। যতই আব্তি করি ততই অন্ভব করি ওর অন্তর্নিহিত সত্য।

যেখানে মিল এত গভীর সেখানে কেমন করে ঐ ব্যবধান সম্ভব হলো? কেমন করে গভীর হলো? এইটেই বরং বিক্ষারকর। গোরী, তোমার সঙ্গো আমার পরিচয় ক'টাই বা দিনের! তব্ কত কালের! আমি তো এরই মধ্যে দিনগণনা হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে লিখেছি কি না ক্ষারণ নেই, তোমার চিঠি যেদিন পাই তার মাস ছরেক আগে তোমার নাম আমার কানে আসে। তোমার ছবি আমার চোখে আঁকা হয়ে যায়। সে ছবি এবার তোমার দ্বিতীয় ফোটোখানির সঙ্গো মিলিয়ে দেখল্ম। খ্ব অপরিচিতের মতো লাগেনি তোমার ফোটো। পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি, তোমার প্রথম চিঠিও খ্ব অপরিচিতের মতো লাগেনি।

তোমার নাম যেদিন প্রথম কানে এলো, তোমার ছবি যেদিন চোখে

আঁকা হলো, সেদিন আমি ভাবতেই পারিনি যে তোমার সংগ্যে একদিন ।
আলাপ হবে, তব্ সেই প্রথম জ্ঞান থেকেই আমার প্রাণ তোমাকে চিনেছে।
চিনেছে সাতত্বে। বোধ হয় সানন্দে। আনন্দ অনেক সময় আতত্বের র্প নেয়। কিন্তু সে কথা আজ নয়। যা বলেছি এক দিনের পক্ষে যথেন্ট বলেছি। এর থেকে আশা করি এইট্রক্ প্রমাণ হবে যে আমরা রাখীবন্ধ ভাইবোন হবার আগেই আত্মার ভাইবোন হয়েছি। কী বল? প্রমাণটা কি নেহাং কাঁচা হলো? আমার মনে হয় এই রকম একটা কিছ্ মনে করেই তুমি লিখেছ, "যে যার সে তার।"

আমার বন্ধ্রা কে কে ওখানে গেছে, কার কার সঞ্চো তোমার দেখা হয়েছে, কাকে কেমন লেগেছে, এসব শ্নব বলে কান পেতে রইল্ম। না জানালেও তুমি জানবে আমি তোমাকে ভালোবাসি। ইতি।

তোমার আত্মার ভাই রত্ন

রঙ্গ ভেবেছিল বিয়ের পাট চুকলে গোরী আবার চিঠি লিখবে, কিল্তু ললিতের বিয়ের বর্ণনা দিয়ে প্রথম চিঠি যার কাছ থেকে এলো সে গোরী নয়, কানন। তাতে বধ্ সাবিহীর একটি লিপিচিহ্র ছিল। সেইসঙ্গে তার দাদা যশোমাধববাব্রও। সত্যিকার অভিজাত ভদ্রলোক। বিলেতফেরং ও প্রগতিশীল। মুখে ফ্রেপ্টকাট দাড়ি, চোখে প্যাঁস নে চশমা। নাকটা একট্ থ্যাবড়া দেখায়। নিচের ঠোঁটটা বেরিয়ে থাকে। সেটাকে ভিতরে টেনে নিতে গেলে গাল দুটো ফুলে ওঠে। সোজনাের অবতার। কাননদের সসম্প্রমে অভার্থনা করে গোলাপ কুণ্ডির বােকে স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন বােতামের গর্তে। গোলাপ জল ছিটিয়ে দিলেন জামায় চাদরে। সিগার অফার করলেন। ড্রিঙ্ক অফার করলেন। রাজা রাজড়ার সঙ্গো সমান ব্যবহার। কাননরা যে বরের বন্ধ্র।

বশোবাবরে পিতা ফোজদার মশার কন্যা সম্প্রদানে নিয়ন্ত থাকার জ্যোতিবাবরের পিতা মুস্তফী মশার সব দেখাশুনা করছিলেন। ইনি বেগমপ্রেরের ম্যানেজার। সন্তর বছর বয়স, কিন্তু একটিও চুল পাকেনি। একটিও দাঁত পড়েনি। কেবল গোঁফ জ্যোড়াটি পাকা। শোনা যায় ইনি বীরাচারী তালিক।

ষশোবাব, পর্যানত এ'কে ডরান। হাঁকডাক নেই। নীরবপ্রকৃতির লোক। কিন্তু যাঁর দিকে তাকান সে-ই তটম্প হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ায়।

জ্যোতিবাব্র সংশাও আলাপ হলো। মোটা খন্দরের কটিবাস পরা, খালি গায়ে শন্ধ্ একখানা খন্দরের উড়ানি জড়ানো গান্ধীয্গের উগ্র ক্ষরিয়। রেদে প্রুড়ে বিন্টিতে ভিজে শীতে ফেটে সীজন হয়েছে শরীয়। চবি বিহানি পেশীপ্রধান অংগ। ব্রন্থিদীশ্ত মন্খমন্ডল স্থির সংকল্পে কঠোয়। অয়য়ে গজানো এক মন্খ দাড়ি গোঁফ। যশোবাব্র পাশে দাঁড়ালে সভ্যতার পাশে বর্বরতার মতো দেখায়। কিন্তু আলাপ হলে বোঝা যায় লোকটি রসিক। কোড়ক দিয়ে বিদ্যা ঢাকতে চান। সকলে সমীহ করে একে।

জ্যোতিবাব্র পাশে বসে আহার করছিল ললিতের বন্ধ্রা। যশোবাব্র স্থা শ্রীমতী দেবী বসেছিলেন পর্দার আড়ালে। মাঝে মাঝে উণিক মেরে দেখছিলেন কে কী খাচ্ছে না, ফেলে রাখছে। কে কী খেয়ে হাত গর্টিয়ে বসে আছে, সন্কোচে আরেকট্বখানি চেয়ে নিতে পারছে না। জ্যোতিবাব্রক ডেকে বলছিলেন তান্বির তদারখ করতে। ওটা যে জ্যোতিবাব্রর দায়িছ। পরিবেশককে নির্দেশ করছিলেন কার পাতে কী দিতে হবে। "না" "না" শর্নলে চলবে না। সকলের হাত ধোয়া মোছা হয়ে গেলে পরে সোনার তবক মোড়া পান দিতে ঘরে ঢ্রুকলেন শ্রীমতী স্বয়ং। সে সময় প্রত্যেকের সন্ধো আলাপ পরিচয় হলো তাঁর। কাননকে নবনীকে হৈমকে অন্রোধ করলেন আবার আসতে বড়দিনের ছর্টিতে। জিজ্ঞাসা করলেন রত্নর কথা, প্রভাতের কথা। জানতে চাইলেন গিরীন কেন এলো না।

কাননের চিঠিতে শ্রীমতীর র্পবর্ণনা ছিল। জন্মদিনের ফোটোর সঙ্গে মিলে বায়। নতুনের মধ্যে এই যে সে মাথায় খাটো। তার উপর ভরন্ত গড়ন বলে তাকে অযথা মোটা দেখায়। আর একট্লেন্বা হলে ও রকম মনে হতো না। মিহি ঢাকাই শাড়ী পরে সে তন্বী সাজতে চায়, কিন্তু তাতে লম্জা নিবারণ হয় কি না সন্দেহ। গায়ে একখানা শাল কিংবা স্কার্ফ থাকলে শোভন হতো। পর্দার ভিতরে যা মানায় পর্দার বাইরে তা বেমানান।

কানন ছেলেটি বরাবর সেন্টিমেন্টাল। গদ্গদ হয়ে লিখেছে, "এত দিন

আমাদের সাত ভাই চন্পার পার্ল বোন ছিল না। এত দিন পরে পার্ল বোন এলো। সেই দিনই তাঁকে আমি পার্লিদ বলে ডেকেছি। তিনি সাড়া দিয়েছেন। তুমিও ডেকো।"

কাননকে রক্ন জানতে দিল না শ্রীমতীর সঞ্গে তার সম্পর্ক কোথার এসে ঠেকেছে। সে ওকে কী বলে ডাকে। ও কেন সাত ভাই চম্পার সাত জনের বোন হক্তে যাবে! ও তার একার বোন। যে যার সে তার। মাঝখান থেকে তোমরা কে হে, বাপঃ!

দিন কয়েক পরে গোরীর চিঠি এলো। সেও লালতের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছিল। দিয়ে আক্ষেপ করেছিল যে কিছ্রই তার মনের মতো হলো না। তার মন ভয়ানক খারাপ। শরীরও প্রান্ত। আর বইতে পারছে না। এখন বোধ হচ্ছে এ বিয়ে না দিলেই ছিল ভালো। কেন সে কথা আর কাউকে বলোন, বলবার নয়। রয়কেই বলছে বিশ্বাস করে।

সাব্ শ্বশ্বরবাড়ী থেকে ফিরেছে। আমার ভাবনা ও ভয় ছিল ওর ফ্রলশব্যার অভিজ্ঞতাও হয়তো আমারই মতো গ্লানিকর ও বেদনাবহ হবে। নর মারেই নরপশ্ব। ব্যতিক্রম যদিও সম্ভব। ললিত যদি ব্যতিক্রম না হয় সাব্ কি আমাকে ক্ষমা করবে? আমি কি আমার মাকে ক্ষমা করেছি? বলতে গেলে আমিই তো ও বেচারিকে বাঘের গ্রহায় ঠেলে দিল্ম।

এখন আমি হেসে গড়িয়ে পড়ছি। হাসতে হাসতে মারা যাব। বাঘ বলে যাকে মনে হয়েছিল সেটা ভেড়া। রাতের পর রাত কাটল, সাহস তার কোনো দিল হলো না। সাব্ অক্ষত অবস্থার ফিরে এসেছে। বিয়ের জল পড়েনি। এ নিয়ে বেচারি শরমে সঙ্কোচে অর্ধমৃত। মেয়ে মহলে কিছ্ই ছাপা থাকে না। হাসি ঠাট্টা তব্ সহ্য হয়, কিন্তু মেয়েমান্মের মৃথে মৌমাছির মতো হলু আছে যে!

লালিত নাকি বলেছে অত কম বয়সে মা হতে যাওয়া অহিতকর। আরো তিন বছর সব্বর করতে হবে। এই তিন বছর অসিধার রত। তা মন্দ বলেনি লালিত। এক দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু

আরেক দিক দিয়ে চিন্তিত। ললিত যদি এ বৌ নিয়ে মর না করে লোকে আমাকেই দ্ববে। বিয়েটা তো আমারই দেওয়া। কেন দিতে গেল্ফে?

ললিতের বিয়েতে তার বন্ধ্রাও আসবে ও তাদের মধ্যে তুমিও থাকবে, এটা আমি সরল বিশ্বাসে ধরে নির্মেছিল্ম। আমি ভাবতেই পারিনি যে এ বিয়ে তুমি সমর্থন করবে না, সেটা তোমার না আসার হেতু হবে। বরষান্ত্রীরা যথন এলো তখন আমার মন বলছিল তুমি এসেছ, শেষ ম্হুর্তে মত বদলেছ। কোন জন তুমি তাও আন্দাজে চিনেছিল্ম। রেঙে উঠেছিল্ম একট্ বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে। জ্যোতিদাকে সাধল্ম, যাও না, দেখে এসো রত্ন এসেছে কি না। এসে থাকলে ওকে বোলো আমার দ্তে গিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে আসবে।

কী দৃঃখ! কী লজ্জা! ও রঙ্গ নয়। নবনী। রঙ্গ আর্দোন। উৎসবের সব আলো আমার চোখে নিবে গেল। অর্থহীন উৎসব। সাব্র বর এলো, আমার বর এলো না। আমি কেন আনন্দ করব!

নেহাৎ ওরা তোমার বন্ধ্, ওদের আপ্যায়নে হ্রটি থাকলে তুমি ব্যথা পাবে, এ কথা ভেবে তোমার বন্ধ্নদের ডাকিয়ে আলাদা একখানা ঘরে বসিয়ে খাওয়াল্ম, জ্যোতিদাকে দিল্ম দেখাশ্নার ভার। পরে এক সময় ওদের সংগে আলাপ হলো অলপক্ষণের জন্যে। গিরীন ছিল না। খাসা লাগল নবনীকে কাননকে হৈমকে। কানন তো আমার সংগে পার্লদি পাতিয়েছে। ওদের বলেছি বড়দিনের বন্ধে বেগমপ্র আসতে। শান্তিনিকেতনে কে আছে যে যাবে! কবি তো দক্ষিণ আমেরিকায়।

এবার তোমার কোনো অজ্বহাত খাটবে না, প্রিয়। শান্তিনিকেতনে গেলে পরীক্ষার ক্ষতি হবে না, বেগমপুর এলে হবে, এ যুক্তি অচল। ইচ্ছা করলেই তুমি আসতে পারতে, তব্ এলে না। এ দ্বঃখ আমি ভূলব না। তুমি যে আমার কী তা আমি দিন দিন হৃদয়ণ্গম করছি। মুক্তি যদি এ জন্মে পাই তবে তা তোমারই কল্যাণে। বলেছি তো, তুমি আমার শেষ অবলন্বন। স্থম্খীর মতো তোমারই দিকে আমি তাকিয়ে আছি। আমি তোমারই। আমার এখন মনে হয় পূর্ব জন্মে আমরা পরস্পরের

রছ ও শ্রীমতী

ছিল্মে। নইলে আমার নাম আর বর্ণনা শ্রেন তুমি কেন অমন গ্রুত হতে? আর আমিই বা কেন ভোমার নাম আর ব্তাশ্ত শ্রেন উন্মনা হয়ে চিঠি লিখতুম?

বিশ বছর কেটে গেল। আর ক'টা দিনের জীবন! যথনি মনে হয় যে দেখা হয়তো এ জীবনে হবে না, চার চোখ এক হবে না, তথনি অসহায়ের মতো ম্যড়ে পড়ি। মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আমাদের মিলন এ লোকে নয়। প্রিয়তম, তুমি কী বলতে চাও নির্ভাষে বল। আমার র্প আর জ্যোৎস্নার মতো নয়, এই কথা বলবে তো? আমি আর স্ক্রেরী নই, এ কথা বলতে এমন কী সাহস লাগে! আমি জানি সৌন্দর্যলক্ষ্মী চল্চলা।

আরো কতক দ্রে গিয়ে গোরী ইতি দিয়েছে। ইতির পরে লিখেছে, "তোমার পূর্বজন্মের স্থিগনী গোরী।"

রত্ন খানিকক্ষণ সতব্ধ হয়ে রইল। তার হৃৎস্পন্দন থেমে এলো। এ কি সত্য! এ কি কখনো হতে পারে যে গোরী তাকে মনে মনে বর বলে বরণ করেছে! প্রিয়তম বলে ডেকেছে! সে ওই চিঠিখানা কাঁপতে কাঁপতে আরেক বার পড়ল। খ্রিটিয়ে খ্রিটিয়ে আরো এক বার। গোরী যদি মিখ্যা না বলে থাকে তবে সত্যই তাকে ভালোবেসেছে। তার প্রেমে পড়েছে।

রঙ্গর জীবনে স্নেহপ্রীতির অপ্রাচুর্য ছিল না। তেমন ভালোবাসা সে অঝোর ধারার পেয়েছে আত্মীয়া অনাত্মীয়া চেনা অচেনা অনেক মেয়ের কাছে। পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু এমন ভালোবাসা এই প্রথম। এত দিন তার সমবয়সিনীরা তাকে তাদেরই একজন বলে গণ্য করেছে। তাতেই সে কৃতার্থ। এই প্রথম সে প্রেম্থ বলে স্বীকৃতি পেলো।

উল্লাসে তার নাচতে ইচ্ছা করা উচিত। কিন্তু কী জানি কেন তার কাঁদতে ইচ্ছা করল। অব্যক্ত স্থানিল দ্বংথের আবরণ। তার ম্থখানা শ্বিকয়ে কালো হয়ে গেল। কেউ যদি তথন সেখানে এসে পড়ত তা হলে ভাবত সে সহসা গভীর শোক পেয়েছে। অথচ ছলনা নয়। আছে হয়তো কোনো প্রচ্ছয় সাদৃশ্য

মৃত্যুর সংখ্য প্রেমের। জগতের দৃই পরাক্রান্ত শক্তির। যখন আকাশ থেকে নামে তখন বাজপাখীর মতো ছিনিয়ে নিয়ে যায়, উড়িয়ে নিয়ে যায়।

গোরীকে তার মনে মনে ভয় ছিল। সেই প্রভাতের বর্ণনা শোনার পর থেকে। তা ছাড়া সে কি ওর যোগ্য! অমন একটি বিখ্যাত মহিলার! পরকীয়া, সেটাও একটা কথা, যদিও তার মতে প্রেম যাকে স্বকীয়া করে সেই স্বকীয়া। বিবাহ যাকে স্বকীয়া করে সে পরকীয়া।

তার পর এটাও তার বিশ্বাস যে একজনকে হুদয়ে স্থান দিতে হলে আরেকজনকে স্থানচ্যুত করতে হয়। মালাদিকে না সরিয়ে গোরীকে বসানো যায় না। মালাদিকে সরাতে মায়া হয়। মনে হয় বিনা দোষে বেচারিকে ত্যাগ করা হলো। রয় কিছ্বতেই তাঁকে ত্যাগ করবে না। তা হলে কী করে গোরীর প্রেমের প্রতিদান দেবে? না দিলে গোরী কী মনে করবে? ওর কি অভিমান নেই, অপমানবাধ নেই?

হার হার করতে লাগল রত্নর অশ্তর। হার, গোরী, কেন ভালোবাসসে! কেন প্রেমে পড়লে! এ কী সঙ্কটে ফেললে! ভাইবোনের সম্পর্ক কেমন নির্বিদ ছিল। আর এই নতুন সম্পর্কের যে গোড়া থেকেই বিবাদ। যে ভালোবাসে সে ভালোবাসা পার না। যে ভালোবাসা পার সে ভালোবাসতে ভয় পার, কুণ্ঠিত হয়। এমন ভালোবাসা কে চেয়েছিল? তেমন ভালোবাসাই ছিল ভালো।

সত্যি? তেমনি ভালোবাসাই ছিল ভালো? রক্ন আপনাকে জেরা করে জবাব পায়—না, তাতে বৈচিত্রা নেই। তা প্র্রুষকে প্রুষ্থ করে না। তার চেয়ে এই ভালো। এত দিন মনে খেদ ছিল যে নারীর প্রেম আসেনি জীবনে। প্রিবী থেকে চলে যাবার সময় প্রতাবোধ নিয়ে যাবে কী করে? এখন তো আর কোনো খেদ রইল না। নারীর প্রেম এলো জীবনে অবশেষে। বিশ বছর বয়সে। যে বয়সে প্রত্যাশা করেছিল সে বয়সে নয়। যার কাছে প্রত্যাশা করেছিল তার কাছ থেকে নয়। অপ্রত্যাশিতার কাছ থেকে। অপ্রত্যাশিত সময়ে।

এ কী পরম সোভাগ্য! মান্ত্রকে অমর করে দেবার মতো। কিন্তু এমনি

তার কপান। প্রাণ খ্রেলে আনন্দ করতে পারছে না। পাড়ার লোককে ডেকে বলতে পারছে না, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য প্রাঃ। অত কথায় কাজ কী, তার প্রিয় বন্ধ্ব প্রভাতকেই জানাতে পারছে না।

আহা, কেন এমন হলো? কেন গোরী বোন হয়ে নিরুত্ত হলো না? বড় আদরের বড় আপনার বোন। এখন যে সে ওকে আর বোন বলে চিহ্নিত করতে পারবে না। করলে সেটা হবে ছলনা। বোন যদি না হয় তবে কী হবে ওর পরিচয়? প্রিয়া? না, না, অমন কথা ভাবা ষায় না। তার চেয়ে বরং ফিরে যাক সে প্রে পরিচয়ে। বোন হোক। আত্মার বোন। আরো অল্তরণা। আরো আত্মীয়। বেশ একটা মিন্টি সন্বন্ধ। মিন্টিক সন্বন্ধ।

কেন, এটাও কি একটা মিস্টিক সম্বন্ধ নয়? রত্ন লজ্জায় রক্তিম হলো।
কিন্তু পরে ভেবে দেখল মালাদির সজ্গে সম্বন্ধ যদি মিস্টিক হয়ে থাকে গোরীর
সজ্গে সম্বন্ধও তাই। প্রভেদ শাধ্র এই যে মালাদির বেলা সে সাড়া পার্যান,
গোরীর বেলা সে অসাড়। গোরীর জন্যে তার মন কেমন করতে লাগল। চির
দ্বংখিনী আবার দ্বংখ পাবে, যখন শানুবে যে রত্মর হৃদয় অন্যন্ত নাস্ত। মিলনের
আশা কোথায় যে আশায় আশায় থাকবে! দেখা সাক্ষাতে কী ফল! সেটা
পরিহার করাই শ্রেয়। তা হলেই হয়তো গোরীর এ মোহ কেটে যাবে। এই
ক্ষণিক মোহ। হাঁ, এটা একটি তর্বাীর ক্ষণিক মোহ। রোমাণ্টিক দিবাস্বসন।

প্রভাতের পর তার সব চেয়ে নিকট বন্ধ্ব ছিল বিদ্যাপতি। পরীক্ষার মরস্বমে রাত থাকতে উঠে একজন অপরজনের ঘ্রম ভাঙিয়ে দিত। তার পর স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি করতে বসত রত্ন। জমাট দ্বধ মিশিয়ে। বিদ্যাপতি হাজির হতো এক টিন বিস্কৃট হাতে করে। চা খেতে খেতে বিস্কৃট চিবোতে চিবোতে তারা অন্বমিত প্রশ্নপত্রের উত্তর রচনা করত। তারই ফাঁকে ফাঁকে বা সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিষয়ে কথাবার্তা চলত।

পরের দিন বলি বলি করে কিছ্নতেই বলতে পারল না রত্ন যে, এ জগতে এমন নির্বোধ মেয়েও আছে যে তার মতো অপাত্রের প্রেমে পড়ে বসে আছে। এটা অদর্শন থেকে। অদর্শনেরও একটা সম্মোহন আছে। চোথে দেখলে এমন অঘটন ঘটত না। তা হলে আনন্দের কী আছে!

এর পর থেকে দেখা গেল রত্ন কারো সংশ্য মিশতে চায় না। একা থাকতে, একা একা ঘ্ররে বেড়াতে ভালোবাসে। হাতে একখানা বই। সেটা কিশ্তু পড়বার জন্যে নয়। পড়তে মন যায় না। ভালো লাগে ভাবতে, কল্পনা করতে। দ্'হাতে ব্রক চেপে ধরতে, মাথা চেপে ধরতে। অল্তরের কলরোল থামাতে। কিংবা চুপ করে শুনতে।

এক দিন যা লেখে আরেক দিন ডাকে দেবার সময় তা ছি'ড়ে নন্ট করে ফেলে।
এ বেলা যা লেখে ও বেলা তা শোধরাতে গিয়ে কেটেকুটে একাকার করে। এমনি
করে চিঠি লেখা হয় গোরীকে। অন্যান্য কথার পর ধীরে ধীরে আসে আসল
কথায়।

ষে পর্বর্ষ বিশ বছর হলো প্থিবীতে এসেছে, কখনো কোনো প্থিবীর মেরের মুখে "প্রিয়" সম্বোধন শোনেনি, যে কেবল ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পার্মান, তাকে তুমি কোনখান থেকে এসে "প্রিয়তম" বলে ডাকলে? বাউলের করোয়াতে চাল বা প্রসা না দিয়ে মোহর ফেলে দিলে? মোহর না মাণিক?

গোরী, আমি ধন্য। আমার মতো ধনী কে? তুমি যদি তুমি না হয়ে যে-কোনো একটি মেয়ে হতে তা হলেও আমি ধন্য হতুম। ধনী হতুম। কিন্তু তুমি যে-কোনো নও। তুমি অনন্য। তুমি নারীকুলের রানী। তোমার তুলনা নেই। তুমি নারীদের মধ্যে নারী। রাধার পর তোমার মতো নারী ভারতের মাটিতে জন্মার্রান। অন্তত আমার তো জানা নেই। দেবী দেখতে দেখতে আমার চোখে অর্কি ধরেছে। এই প্রথম একটি মেয়ে দেখছি যে দেবী নয়, যে সামান্য মানবী নয়। যে অনন্যা।

এর পর যা বলব তা কি তুমি সইতে পারবে? যদি না বলি তোমার সংগ মিথ্যাচরণ হবে। তুমি আমার মুঠোর মোহর ভরে দিলে। মোহর না মাণিক? তোমার মতো দাতার সংগ যদি আমি ছলনা করি তবে আমার মতো অকৃতজ্ঞ কে? গোরী, আমি যদি প্রতিদান দিতে না পারি তার কারণ আমি স্বাধীন নই। "স্বাধীন নই" এ কথা কব্ল করতে আমার মুখে

বাধছে, কেননা আমার তো ধারণা ছিল আমি স্বাধীন প্রের্য। আমার সাধনাও ছিল তাই। প্রভাত আমাকে বলেছিল, "যে প্রেমিক সে স্বাধীন নর, তার মতো পরাধীন আর নেই।" তখন আমি বিশ্বাস করিনি। কিল্তু এখন দেখছি কথাটা অযথা নয়।

অনুমান করতে পেরেছ বোধ হয় যে আমার হৃদয় দেওয়া হরে গেছে।

যাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি কিন্তু জানেন না। জানলেও ফেরং দিতে
পারতেন না। তিনি তাঁর মৃত পতির অনুচিন্তায় বিভার। আমি তাঁর
ধ্যানভাগ করতে অনিচ্ছুক। কীই বা আছে আমার যা দিয়ে আমি তাঁর
স্বামীর অভাব প্রেণ করতে পারি! তার পর আমি তো চলার পথে।
আমার পথের সাথী হতে আমি তাঁকে ডাকব না। এ পথ দিগন্তে মিলিয়ে
গেছে। তাঁর কণ্ট হবে। তা ছাড়া তিনি সাধারণত অস্কুথ। আমি যদি
সেবায় রত থাকি আমার পথ চলা হয় না।

তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে দেবতার মতো প্জা করি। তিনি যদি কোনো দিন সাড়া দেন আমার সব পরিকল্পনা বদলে যাবে। আশা আমার দিন দিন কমে আসছে। নেই বললেও চলে। তব্ আমাকে আরো কিছ্ কাল অপেক্ষা করতে হবে। এ আমার অন্তরের নির্দেশ। কী করি, বল! আমি যে পরাধীন। আমার প্রেম আমাকে যেমন পরাধীন করেছে তোমার বিয়েও তোমাকে তেমন পরাধীন করেনি। বিয়ে তো জোর করে দেওয়া হয়েছে। মন তা মেনে নেয়নি। তুমি আমার চেয়েও প্রাধীন। প্রেমে পড়ার মৌলিক স্বাধীনতা মন্ত্র পড়ে কেড়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু একবার প্রেমে পড়লে দ্বতীয় বার প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা থাকে না, যত দিন না প্রথম প্রেম ক্ষীণ হয়ে আসে।

সে দিন যে কবে তার কোনো ধারণা নেই আমার। তোমাকে তত দিন বসিয়ে রাখব না। অনিদিশ্ট কাল অনিশিচতের আশায় কেনই বা তুমি বসে থাকবে পথিক মান্বের ম্বারে, ফকির মান্বের ম্বারে? তোমার মতো রানীর কি তা শোভা পায়? তোমার দাক্ষিণ্য পেলে কত প্রবৃষ প্রেমে পড়বে, কত পতংগ আগন্নে প্রভবে। তোমার কি ভক্তের অকুলান! গোরী,

তুমি আমার মতো অক্ষমের প্রেমে না পড়ে কাননের মতো একজন স্প্রেষের প্রেমে পড়। তা হলেই আমি স্থী হব। আমি তোমার রাখীবন্ধ ভাই, তুমি আমার রাখীবন্ধ বহিন। এই সম্পর্ক বহাল থাক। আর কোনো সম্পর্কে কাজ কী?

সম্পর্ক বিদি বদলাতে হয় তবে এসো আমরা দ্'জনে দ্'জনের মিতা হই, বন্ধ্ হই। এই সম্পর্কেই সব চেয়ে কম দাবীদাওয়া, কম বাধ্যবাধকতা। অথচ সব চেয়ে বেশী ভাব। এত দিন এটা মেয়েতে মেয়েতে প্রুষ্থে প্রুষ্থে হয়েছে। এখন থেকে মেয়েতে প্রুষ্থে হোক। ভাইবোনের সম্পর্কের মতোই এটা নিরীহ নির্দোষ। অথচ প্রিয়্ম সম্পর্কের মতোই এটা নিরীহ নির্দোষ। অথচ প্রিয় সম্পর্কের মতো সরস স্মুষ্থুর। মনে মনে আমি এমনি একজনকে খ্বেজছিল্ম। মিতা। বান্ধবী। প্রিয়া নয়। বধ্ নয়। নয়, নয় বোন।

কেমন ? রাজী ? এ সম্পর্ক পাতালেও দেখবে তুমি আমার বড় আদরের, বড় আপনার। গোরী, আমিও তোমার।

এর পর গোরীর নতুন ফোটোর প্রসংগ ও র্পের প্রশংসা। র্প কথনো একই রকম থাকে না। দিনে দিনে বদলায়। কৈশোরের গোরী আর যৌবনের গোরী একই মানুষ হলেও র্প তাদের একই র্প নর। জ্যোৎস্নার কমনীরতা থেকে স্যোদিয়ের রমণীয়তা পরিবর্তানস্ত্রে এসেছে। সেও যেমন স্কলর ছিল এও তেমনি স্কলর। সৌল্বর্যের কমতি কোথায় যে ফোটো পাঠাতে এর সাহসের অভাব হবে? বরং যাকে পাঠানো হয়েছে তারই সাহসের অভাব। সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, দ্'হাতে চোখ ঢাকে। এমনিতেই সে মেয়েদের দেখলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। নারীভয় যার সন্তায় সে কি ফোটোকেও নিরাপদ জ্ঞান করে! বিশেষ করে গোরীর বেলা। তার বেলা সে চিত্রাপিতকেও প্রত্যক্ষের মতো ভরায়।—

জানি তুমি দৃঃখ পাবে। তব্ তোমাকে সব কথা খ্লে বলাই ভালো। এর ফলে তোমার আমার সম্পর্ক পায়ের তলার মাটির মতো স্থির হবে। প্রেমের চেয়ে স্নেহ প্রীতি বন্ধৃতা কোনোটাই খাটো নয়। সত্যিকারের

ভাইও সত্যিকারের প্রেমিকের মতো মহং। সত্যিকারের বন্ধরে মতো মহং কোন মিথ্যা স্বামী? গোরী, ভূলে যেয়ো না যে তোমার পক্ষে স্বাধীনতাই সর্বপ্রথম প্রশ্ন। প্রেম তার পরের কথা। এত দিন আমি তাই জানতুম। এখন লক্ষ্য কর্রাছ তুমি পরের কথাটাকে আগে টেনে আনছ। তাতে তোমার দ্বঃখ কেবল বাড়বে।

রঙ্গ তার জীবনে এত বড় গ্রের্ডসম্পন্ন লিপি লেখেনি। চিঠিখানা বার বার পড়ে নিশ্চিত হলো যে লিখে ঠিকই করেছে, না লিখলে ভূল করত। গোরী যদি দ্বঃখ পায় তবে অধিকতর দ্বঃখের হাত থেকে বাঁচবে। বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়তে তার বন্ধ্ব প্রভাত তাকে নিষেধ করেছিল। প্রভাতই তাকে সতর্ক করে দিরেছিল যে শ্রীমতীর মধ্যে প্যাশন আছে। এসব উপেক্ষা করতে হয়তো সে রাজী হতো, যদি মালাদির প্রতি তার আন্বাত্য না থাকত। তিনি দ্রোণ, সে একলব্য। এখনো তার সাধনার প্রয়োজনে তাঁর ম্তি প্রো করতে হয়। পরে হয়তো প্রয়োজন থাকবে না। তখন তার হৃদয় খালি হবে।

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে রত্ন গণগার ধারে গিয়ে গা মেলে দিল। এই তো মাত্র কয়েক মাস আগে তার মনে হচ্ছিল তার জীবনের সব সংকট কেটে গেছে, তার অশ্তরে পরম শান্তি। সে ভালোবেসেই তৃশ্ত, ভালোবাসার প্রতিদান প্রার্থনা করে না। নারীকে সে দ্রে থেকে ধ্যান করবে, প্রশাঞ্জলি দেবে। সংগস্থ নাই বা জন্টল। মালাদি আর কারো সংগে সন্খী হোন। সে স্বাধীন থেকে দেশবিদেশ ঘ্রে বেড়াক। মাস কয়েক যেতে না যেতে এ কী হলো! প্রেম এলো তার স্বারে অনাহ্তের মতো। যার প্রেম সে সামান্য মানবী নয়। নারী উত্তমা। কিন্তু তার প্রেম স্বীকার করলে নৃতুন এক সংকট। যার পার দেখা যায় না।

বড়দিনের বেশী দেরি ছিল না। শান্তিনিকেতনে যাওয়াই স্থির হলো। নেতা পাওয়া গেল সলিল ব্রহ্মকে। তার বাবা ওখানকার অধ্যাপক। সলিল অভয় দিল জায়গার জন্যে ভাবতে হবে না। বিদ্যাপতি অঞ্জন এরা সলিলের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিল। রক্স বলল, বেশ।

ওদিকে কানন নবনী ওরা বেগমপ্রে যাবে বলে কথা দিয়েছিল। রত্নকেলেখার সে অসামর্থ্য জানিয়েছিল। প্রভাত তো মৌন। সে উত্তর দিল কি না সে-ই জানে।

দেখতে দেখতে গোরীর চিঠি এসে পড়ল। খুলতে ভরসা হচ্ছিল না রত্নর। মেয়ে নিশ্চয় রাগ করেছে। রাগ করাই স্বাভাবিক। চিঠি খুলতেই ছিটকে পড়ল আবার একখানি ফোটো। ছোট একটি স্ন্যাপশট। গোরী দ্ব'হাতে মুখ রেখে ভাবছে। মাথায় কাপড় নেই। অবিনাস্ত কেশ কালো স্লোতের মতো দ্ব'ক্ল ভাসিয়ে নিছে।

এবার সে প্রিয়তম বলে সম্বোধন করেছিল সরাসরি। লিখেছিল—

তুমি যদি ভেবে থাক যে সহজে আমার হাত থেকে রেহাই পাবে তবে সেটা তোমার ভূল। তুমি যা লিখেছ তা আমার অপ্রত্যাশিত নয়। বিশ বছর বয়সের একজন য্বাপ্র্য আর কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েনি এ কথা হলপ করে বললেও আমি বিশ্বাস করতুম না। আমার কাছে যারা সাধ্য সাজে তাদেরকেই আমার বেশী সন্দেহ। সন্দেহ অকারণে নয়।

আমি যেসব কাণ্ড করেছি তার তুলনায় তুমি কীই বা করেছ! আমার তো মনে হয় কিছুই করনি। তোমার চিঠি পড়ে আমি মনে মনে হেসেছি। দেবী বলে যাঁর প্রজা করছ তাঁরও তো ভোগ চাই। এমন কোন দেবতা আছেন যাঁকে ভোগ দিতে হয় না? তোমার মালাদির জন্যে আমার দৃঃখ হয়। বেচারিকে সারা জীবন দেবী সেজে অসাড় হয়ে থাকতে হবে। সাড়া দিলেই যে তুমি আঁতকে উঠবে। তাই তো! এ কেমন দেবী! তা হলে কি দেবী নয়! দৃঃখ হয় তোমার জন্যেও। একটা অহেতুক আশায় তুমি মরীচিকার পিছনে ছুটেছ। মরীচিকা ধরে তোমার কী হবে! সে তো জল নয় যে অণ্য জুড়াবে। মরীচিকা ধরা দেয় না। দিতে পারে না। তোমার দেটিতানোই সার।

তুমি তোমার প্রাণের কথা রেখে ঢেকে বলনি। স্পষ্ট করে বলেছ। এবার আমার পালা। আমিও খ্লে বলছি। রাগ কোরো না। তুমি আমার রাখী-বন্ধ ভাই হতে রাজী হয়েছিলে। আমিও খ্লি হয়েছিল্ম তোমার রাখীবন্ধ

রত ও শীমতী

বহিন হয়ে। পরে ব্ঝতে পারল্ম ওর মধ্যে সত্য নেই। সত্যের খাতিরে ও সন্বন্ধ বাতিল করতে হলো। আমাদের সন্বন্ধ ভাইবোনের নয়, বন্ধ্ববন্ধার নয়। স্নেহপ্রতি বন্ধ্বতার নয়। তবে কার কার ও কিসের? একট্ব একট্ব করে আমার প্রত্যের হলো যে তুমি আমার কান্ব, আমি তোমার রাই। তা না হলে এমন কেন হবে যে দেখা নেই, চেনা নেই, চিঠিতে চিঠিতে ভাব। সে ভাব কত নিবিড়। তুমি যে আমার এই তার প্রমাণ। আমি যে তোমার এ তুমি আজ না মানলেও কাল জানবে। আমরা একসংগ্রেই ধরণীতে এসেছি, একই বছর। মাসটা বা দিনটা যদিও এক নয়। হঠাং মনে হতে পারে আমরা যমজ। তা নয়। আমরা য্গল। রাধা আর কৃষ্ণ ওরাও তো একবয়সী ছিল। মার পনেরো দিনের ছোট বড়।

প্রিয় আমার, তোমার চিঠি ষেদিন আসে সেদিন আমি শোবার ঘরে
দ্বেক দরজায় খিল দিই। বলি আমার মাথা ধরেছে। শ্বেয় শ্বেয় তোমার
চিঠি পড়ি। একট্ব একট্ব করে পড়ি। ফ্রিরয়ে যাবে বলে আধখানা হাতে
রাখি, রাত্রে বার করি। আমার তো আর কোনো শয্যাসাথী নেই। তোমার
চিঠিই আমার শয্যাসাথী। ব্বেক রাখি, মুখে রাখি, মাথায় রাখি। কোথায়
না রাখি? তুমি কি জান যে তোমার চিঠি দিনের বেলাও আমার সংগী
হয়, রাউসের ভিতরে? স্নানের ঘরেও তোমার চিঠি খ্লে পড়ি। রয়,
তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। প্রেম আমার জীবনে এই
প্রথম নয়। আগে হাত প্রড়েছে বলে জানি এর নাম আগ্বন। এ আমার
জ্বলাত সত্য।

প্রিয়তম, তুমি আমার সংশ্য মিথ্যাচরণ করনি। আমিও তোমার সংশ্য মিথ্যাচরণ করব না। প্রেম আমার জীবনে এই প্রথম নয়, এই দ্বিতীয় নয়, এই তৃতীয় এবং শ্রেন্ট। আমার নিজের দিক থেকে। অন্য দিক থেকে যদি বলি তুমি বিশ্বাস করবে না। ভাববে গোরী বাড়িয়ে বলছে। কড লোক বে এ অভাগিনীর প্রেমে পড়েছে তার হিসাব রাখিনি। তাদের একজনকে তুমি চেন। সে তোমার প্রিয় বন্ধ্ব লালত। ছেলোট ভালো। তাকে আমার ভালোও লাগে। কিন্তু ভালোবাসা অন্য কথা। তাকে আমি ভালোবাসতে

পারব না। তার মনে দৃঃখ হবে, তাই সাব্দর সঞ্গে তার বিরে দিল্ম, সাব্দর ভালোবাসা পাবে। আমিও মৃত্তি পাব অবাঞ্চিত ভালোবাসা থেকে।

এই বেমন ললিতের কথা বলল্ম তেমনি আরেক জনের কথা বলি। সে তোমার যেমন মালাদির প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা ও ভব্তি জ্যোতিদা। জ্যোতিদার তেমনি আমার প্রতি অনুরন্তি। কী চোখে যে দেখেছে আমাকে. শত প্রত্যাখ্যান সত্তেও আমার দিকেই ঝকেবে, আর কারো দিকে না। কত বার কত মেয়ের সণ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি, বিয়ের সম্বন্ধ করেছি ; কিন্তু ভবী ভূলবে না। আমার মধ্পলের জন্যে তার মতো কেউ চিন্তিত নয়। স্বার্থ কাকে বলে জানে না। দেশের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছে। বড়লোকের ছেলে, থাকে গরিবদের পাডায়, গরিবদের সপ্সে। নিজের পরিশ্রমে যতটাক হয় ততট্টকুতেই চালায়। তবে আমরা বন্ধ্বান্ধবরা খেতে বলি, উপহার দিই। পরের পরিশ্রম নেবে না, পরশ্রমজীবী হবে না। দেবতা যদি কেউ থাকে তবে জ্যোতিদা। তার প্রেম দেবতার প্রেম। আমার মতো অযোগ্য পাত্রে তার প্রেমের অপচয় হচ্ছে দেখে বিষম দঃখ হয়। কী করি! আমি যে তাকে ভালোবাসতে পারিনে। সে আমার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমিও তার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ বন্ধ্য। মিতা বলে যে নতুন সম্পর্কের প্রস্তাব করেছ সেটা আমার জীবনে নতুন নয়। সেই সম্পর্ক জ্যোতিদার সঙ্গে আমার। কিন্ত প্রেমিকের মাল্য তাকে আমি দেব না। সে মাল্য তার জন্যে নয়।

দ্বিট উদাহরণ দিল্ম। আরো দিতে পারতুম। বেশীর ভাগই র্পম্শ্থ তর্ণ্য শ্ধ্ব তর্ণ নয়, প্রোঢ়ও আছে। এমন কি, বৃশ্ধও আছে। বিশ্রী লাগে তাদের আর্তি দেখে। পর্দার বাইরে কতট্বকুই বা বেরোই! বেরোতে হয় দেশের কাজে। তার পরিণাম এই! সোন্দর্য একটা অভিশাপ। য়য় আছে তাকে গিলে খাবার জন্যে রাহ্বরা হাঁ করে রয়েছে। তব্ তো আমি গয়না গায়ে দিইনে। ফ্যাশনের ধার ধারিনে। অশোকবনে সীতার মতো থাকি। নিই যেট্বকু না নিলে নয়। দিই যেট্বকু না দিলে নয়। কোনো মতে বেণ্টে থাকার জন্যে যেট্বকু করতে হয় করি। শ্বেদ্ব বেণ্টে থাকা। তার বেশী নয়।

আছে।, ভাই, তুমি কি বলতে পার? আমি তো কাউকে ভরাইনে। লোকে আমাকে ভরার কেন? কী আছে আমার মধ্যে যা দেখে তুমিও ভর পেরে গেছ? ভর পেরে বেসনুরো গাইতে শ্রন্ করেছ। "আমি পরাধীন, আমি অক্ষম" তোমার মুখে এ কী বিপরীত উল্লি! নিজেই যদি পরাধীন হলে স্বাধীন করবে কাকে? আমি যে কত আশা করেছিল্ম তুমি আমাকে মুল্ভ করবে। তোমার চিঠিপত্রে যে অদম্য মুল্ভির স্নুর ছিল তা কি একখানা ফোটো দেখেই নেতিরে পড়ল? তা হলে আর একখানা ফোটো পাঠাই। এটা দেখে যদি তোমার ভর ভাঙে। সত্যি, তোমার ভর ভাঙানো দরকার। তোমার চিঠিপত্র পড়ে মনে হর তুমি যে কেবল দেবীপ্জক তাই নর, তুমি নারীপ্জক। নারীকে প্জা কর বলেই কি এত ভর কর? তা হলে কাজ নেই তাকে প্জা করে।

তোমার বন্ধ্বরা আবার আসছে। তাদের পার্ল বোন হতে আমি রাজী। কিন্তু তোমার পার্ল বোন হতে নয়। তোমার সংগ্র আমার অন্য সন্পর্ক। এখন তাদের কাছে প্রকাশ করব না। পরে তারাও জানবে। প্রেম কখনো ছাপা থাকে না। জানবে সকলেই। আমার প্রোপ্রাইটরও জানবেন। কপালে দ্বংখ আছে। তার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি। এই যে আমি গয়না পরিনে, মাছ খাইনে, নাচার না হলে কিছ্ব নিইনে বা দিইনে, এ আমার দ্বংখবরণের প্রস্তৃতি। ভয় আমার নেই। কিন্তু ভাবনা আছে। আমি যে বড় নিঃসংগ। আমার যে সংগী নেই। চার দিকে লোকজন থাকার নাম সংগী থাকা নয়। আমি একটি পক্ষিণী। আমার পক্ষীটি কই? ওগো বনের পাখী, তুমি কি এই খাঁচার পাখীর সংগী হবে না?

ওগো বনের পাখী, মনের পাখী, পরীক্ষার পর তুমি যদি কোথাও চলে যাও আমি কি সইতে পারব? আমি কি প্রাণে বাঁচব? স্বাধীনতা নিয়ে আমি করব কী? হ্দয় যদি শ্বিকয়ে যায়, অঙ্গ যদি না জব্জায়, মন যদি না ভরে, আত্মা যদি আত্মীয় না পায় তবে কিসের জন্যে স্বাধীনতা?

এর পর সে লিখেছিল জ্যোতিদা বেলগাঁও কংগ্রেসে যাচ্ছে। শিষরে এলে জানা যাবে নতুন কোনো সত্যাগ্রহ আন্দোলন হবে কি না। হলে গোরী তাতে ঝাঁপ

দিয়ে স্বাধীন হবে। রক্সর সাহায্য নিতে হবে না। রক্সকে তার প্রয়োজন স্বাধীনতার জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে। ইতির পর যোগ করেছিল, "তোমার অন্বরাগিণী গোরী।"

রত্বর চোখ দর্টি আবেগে ঝাপসা হয়ে এসেছিল। দর্থফাঁটা জল গড়িরে পড়ল। এই দর্শখনী মেয়েটির জন্যে কীই বা করতে পারে একা একটি তর্ব! এক হাতে ক'দিন লড়তে পারে সমাজের সঙ্গে, বড়লোকের সঙ্গে! বোধ হয় আইনের সঙ্গেও। রাজনীতির আবতে ঝাঁপ দিয়ে গোরী যদি মর্ন্তি পায় তবে সেই সব চেয়ে ভালো।

চিঠির বেখানে নারীপ্জার উল্লেখ ছিল রক্নকে তা স্মরণ করিয়ে দিল বহ্নকাল প্রের কথা। অধ্যাপক গণ্ডেগাপাধ্যায়কে সে ঋষির মতো ভক্তি করত। মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেত। তন্ময় হয়ে তাঁর উপদেশ শ্নত। তিনিই একদিন বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বর ব্ঝিনে, পরকাল ব্ঝিনে। দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও তিনটি উপাস্য দেবতা আছেন, তাঁরাই আমার ট্রিনিটি বা হয়ী। আমার বাবা, আমার মা, আর আমার স্হাী।" রক্ন তা শ্নেন চমৎকৃত হয়েছিল। প্রথম ন্বিতীয়ের জন্যে নয়, তৃতীয়ের জন্যে। "আমার স্হাী।"

কথাটা রত্নর মনে গাঁথা রইল। সে তো ধর্মবিশ্বাসে খ্রিনিটি বা গ্রিসত্ব মানত না। সে ইউনিটারিয়ান। অধ্যাপক মহাশয়ের আর্ষবিচন থেকে সে প্রথম দ্বিতীয়কে বাদ দিল। রাখল শাধ্র তৃতীয়কে। "আমার স্থানী।" তার আবার "স্থা" শব্দটা পছন্দ নয়। সেটাতে শ্রুমার ভাব যথেন্ট নেই। তাই সে ওখানে বিসিয়ে দিল "নারী।" এই তার নারীপ্জার ইতিহাস। তখন থেকে সে তার অধ্যাপকের মতো বলে আসছে, "আমি দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে। কিন্তু আমারও একটি উপাস্য দেবতা আছেন। তিনি আমার নারী।" বলে আসছে মনে মনে। কদাচ কখনো মাধ্র ফাটে।

ইতিহাসের আরেক অধ্যায় তার মনে পড়ছিল। মাঘোৎসবের দিন সান্ধ্য উপাসনার পর রত্ন ও প্রভাত দুই বন্ধ্ব রাহাসমাজ থেকে ফিরছিল। অভিভূত ভাব তখনো কার্টেনি। প্রভাত বলল, "ভাই রতন, ছেলেবেলা থেকে আমি রাহাদের হাতে গড়া। মনে প্রাণে আমিও তাদের একজন। তা হলে দীক্ষা নিইনে কেন?

গ্রন্জন রাগ করবেন এই যা অন্তরায়। কিন্তু আমার সংখ্য তুমিও যদি দীক্ষা নাও দু'জনের গ্রন্তুজনের রাগ অর্থেক হয়ে যায়।"

অধ্কশান্দে এ রকম বলে নাকি? রত্ন তর্ক করতে পারত। তা না করে বলল, "প্রভাত, ভাই, ছেলেবেলা থেকে না হলেও বড় হয়ে অবধি আমিও তাদের একজন। কিন্তু কেমন করে বলব যে কেবল তাদেরি একজন? গিজায় যখন যাই তখন বলতে সাধ যায়, আমিও তোমাদের একজন। মসজিদের আজান যখন শর্নান তখন বলতে ইচ্ছা করে, আমিও তোমাদের একজন। আর বাড়ীর প্রজাপার্বণ যখন দেখি তখন মনে মনে বলি, দেবদেবী মানিনে, বিগ্রহ মানিনে, তব্ব আমিও তোমাদের একজন। আমার মতো লোকের কি কোনো একটি ধর্মে দীক্ষা নেওয়া উচিত? যে মান্ত্র সকলের সে কেন এক সম্প্রদায়ের হবে?"

প্রভাত পরিষ্কার করে বলল, "ব্রাহ্মদের একজন হতে চাই বলে দীক্ষা নিতে চাই তা নর। ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাস করি, এটা প্রকাশ্যে স্বীকার করার মধ্যে সংসাহস আছে।"

এবার রত্ন তর্ক করল। "বিশ্বাস করা এক। দীক্ষা নেওয়া আরেক। দীক্ষা বদি নিতে হয় তবে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে আমরা কি শ্ব্ধমাত্র নিরাকারবাদী, না ঈশ্বরকে পিতা বলে উপাসনা করার পক্ষপাতী? আমার কথা যদি জিল্পাসা কর, আমি সাকারবাদে আস্থা হারিয়েছি, কিন্তু ব্রথতে পারিনে ঈশ্বরকে পিতা কেন বলব, মাতা বলব না কেন।"

"ব্রাহমুরাও মাতা বলে উপাসনা করেন।"

"প্রেমিক বলে?"

"রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়নি?"

"প্রেমিকা বলে?"

প্রভাত চমকে উঠল। "কী বলে? কী বলে?"

রত্ন প্রনর্ত্তি করল। "ঈশ্বরকে প্রেমিকা বলে উপাসনা করা যায় না?"

প্রভাত চলতে চলতে থেমে গিয়ে বন্ধ্র দিকে কঠোরভাবে তাকাল। বলল, "এটা কি তর্কের খাতিরে তর্ক? না ঈ*বরকে নিয়ে কোতুক?"

রত্ন তেমনি নিরীহভাবে বলল, "না, ভাই। এটা আমার উপলব্ধি। ছেলেবেলা

থেকে বৈষ্ণব পরিবেশে মান্ত্র হয়েছি। ওদের পরমাত্মা কৃষ্ণ, জীবাত্মা রাধা। আমি তো স্বভাববিদ্রোহী। আমি বলি উলটোটা কেন হবে না? জীবাত্মা কৃষ্ণ, পরমাত্মা রাধা।"

"শ্রেছে স্ফীরা ও রকম ভাবে। ওটা ভালো নয়। ছি! ভগবানকে নারী ভাবা!" প্রভাত বলল চলতে চলতে।

"কেন? ভগবানকে নারী ভাবা কি নতুন কথা হলো? রামকৃষ্ণ কি তাঁকে জননীরূপে আরাধনা করেননি?"

"তা বলে প্রেমিকার্পে! ওতে তাঁকে নিচু করা হয় যে!"

রত্ন তর্ক করল, "আর প্রেমিকর্পে? তাতে নিচু করা হয় না?"

প্রভাত গলা খাটো করে বলল, "দ্বার সংশ্য প্রব্ধের যে সম্বন্ধ তাতে দ্বা নিচু নয় তো কী! মনে নেই পশ্ডিত মশাই কী বলেছিলেন! নরনারীর সমান অধিকার নিয়ে তুমি তাঁর সংগ্য তর্ক করতে গেলে। ক্লাসের মাঝখানে মোক্ষম কথাটা উচ্চারণ করেন কী করে! পরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, প্রভাত-মোহন, তোমার বন্ধ্ব রত্নকাশ্তকে বলবে এটা প্রকৃতির বিধান যে প্রব্নুষ উপরে, দ্বা নিচে। কেবল মান্বের বেলা নয়, সব প্রাণীর বেলা। তুমি তা শ্বনে লাফাতে লাগলে। বায়োলজির কেতাব ঘাঁটলে লাইব্রেরীতে বসে। পেলে না মুখের মতো জবাব।"

রত্ন শোচনার স্করে বলল, "হায়, হায়! তখন যদি আমার জয়দেব পড়া থাকত! পশ্ডিত মশাইকে পরাস্ত কর্তম তাঁর নিজের অস্তে।"

"কিন্তু তাতে করে কী প্রমাণ হতো? মেয়েরা উপরে। সমান তো নয়।" এই বলে প্রভাত রত্নর মুখ বন্ধ করে দিল।

পশ্ডিত মশাই ধরে নিয়েছিলেন যে নরনারীর সম্বন্ধটা প্রাণিতত্ত্বের ম্বারা নিয়ন্তি । প্রভাতেরও ধারণা তাই । সেইজন্যে সমান অধিকারের প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেল । ইতিমধ্যে রত্নর স্বৃত্বন্ধি হয়েছে । সে আর বিজ্ঞানের ধার দিয়ে যায় না। ও প্রসংগ উঠলে সোজা শ্রনিয়ে দেয়, "নরনারীতত্ত্ব নৃতত্ত্ব নয়। এখানে প্রকৃতির বিধান অবান্তর। নর ও নারী যাদের বলা হয় তারা কি আত্মায় তাই? আত্মা নির্পাধি। তবে, হাঁ, জগতে দ্বটো ম্লতত্ব রয়েছে । প্রুষ্থ প্রকৃতিঃ

ম্যাসকুলিন ও ফেমিনিন। দুই না হলে জগত চলে না। দুটোই সমান। দু' পক্ষই সমান। সমানে সমানে আছিক সম্বন্ধ। মিদ্যিক সম্বন্ধ।"

তার নিজের স্বভাবেই অসংগতি ছিল। ফেমিনিস্ট হিসাবে সে বিশ্বাস করত যে নরনারীর সমান অধিকার। ওরা সমান। কিন্তু নাইট হিসাবে নারীকে দিত উচ্চাধিকার বা অগ্রাধিকার। তার একবার মনে হতো স্বাধীন প্রেষ্থ বা স্বাধীনা নারী কেউ কারো প্রাভা করবে কেন? ওরা যে সমকক্ষ। আরেক বার মনে হতো পরমান্মা যদি নারী র্প্ধরে আসেন তা হলে তো তাঁকে সেই র্পে প্রো করতে হয়। সেইটেই প্রের্ষের ধর্ম। তাঁর সংগে সমান হতে চাওয়া প্রারীর মনস্কামনা নয়।

এখনো সেই অসংগতির অবসান হয়নি। এখনো সে নারীসাম্যবাদী ফেমিনিস্ট। অথচ মনে প্রাণে মধ্যযুগের নাইট কিংবা রুবাদ্রের। ধ্যান করে প্রজ্ঞাপারিমিতা বিয়াট্রিসের। কল্পচক্ষে অবলোকন করে বিয়াট্রিস আগে আগে চলেছেন, দান্তে তাঁর পিছনে পিছনে। এক তারালোক হতে আরেক তারালোকে। উধের্ব, উধের্ব, আরো উধের্ব। নারী এখানে নারীসভ্ব বা চিরন্তন নারীত্ব। গ্যোটে যার বন্দনা করেছেন ফাউন্ট নাটকের ষর্বনিকাপতনের পূর্বক্ষণে। "The Eternal-Womanly draws us above."

ভাবতে ভালো লাগে যে মালাদি তার বিয়াট্রিস। মালাদির সে দান্তে। বেশ তো ছিল সে তার ভাবনা নিয়ে। কোনখান থেকে এলো প্রীমতী! রত্নর জগতে এখন শ্ব্র্ব্ব্ দান্তে ও বিয়াট্রিস নেই। আছে রাধা ও কৃষ্ণ। দ্বেই ধরণের দ্বই য্রগল। কিন্তু দ্বই অসম। উভয় ক্ষেত্রেই নারী বড়, প্রব্ব্ব ছোট। নারী গ্রের্, প্রব্ব শিষ্য। নারী উচ্চে, প্রব্ব নিচে। র্পক আকারে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন জয়দেব।

গোরী বলছে সে-ই রাধা। কিন্তু রক্ষ এখনো স্বীকার করতে পারছে না। স্বীকার করলে বিষম জটিলতা। মালাদির প্রতি আন্ত্রতাত ত্যাগ করা যায় না, সে যে দার্ণ ব্যথা। শ্বে কি মালাদির প্রতি? বিয়াট্রিসের প্রতি, বিয়াট্রিস-র্পিণী নারীর প্রতি, নারীসত্ত্বে প্রতি। না, সে তার নারীত্বের আদর্শ ছাড়তে পারবে না।

বছ ও শ্রীমতী

অথচ গোরীও তার বড় আদরের, বড় আপনার। এই ক'মাসে সে ও গোরী ব্যক্ত হয়ে গেছে। ব্যক্ত, ধ্র্ণল নর। সে চার তাদের দ্র'জনের সম্বন্ধটাকে সেই স্তরে রাখতে। কিন্তু গোরী তাতে রাজী নর। ব্যক্তকে ব্র্ণল না করে ওর ত্রিত নেই। আবার বলছে কিনা, কাজ নেই নারীকে প্রা করে। তা হলে সম্বন্ধটা কী দাঁড়াল?

রত্নর ব্বকের কাঁপন থামলে হয়। তার আশৎকা হয় সে মরে যাবে। এত আনন্দ তার সইবে না। একে সোজাস্বৃদ্ধি অস্বীকার করলেই বাঁচন, নয়তো মরণ। তার ভয় করে রাধাকে, রাধার্বিপণী নারীকে। নারীত্বের যে আদর্শ গোরীকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ যেন অন্য সাধনা। অতি ভয়ানক, অতি বিপজ্জনক। কেননা এর মধ্যে দেহের ভূমিকা আছে। মালাদির মতো গোরী বিদেহী নয়। ওই তো তার এবারকার ফোটো। কেবলমাত্র বাস্ট। গোরী দ্বৃহাতে মুখ রেখে ভাবছে। ভাবাকুলা নারী। বিষাদমধ্র মুখ। কীযে আছে ও দ্বিট পল্লবঘন নেত্রে! তড়িৎ না চুন্বক! চেয়ে থাকলে কাছে টেনে নেয়।

তেরো

রত্ন নিজে সোন্দর্যবাদীদের সংখ্যা শান্তিনিকেতন চলল, কিন্তু সাত ভাই চম্পাকে নির্দেশ দিল বেগমপুর যেতে। নবনী কানন হৈম গিরীন ললিতকে লিখল ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা স্থানকেন্দ্রিক না হয়ে নীতিকেন্দ্রিক হতে। কয়েকটি ম্লেনীতি না মানলে সাত ভাই চম্পার অস্তিত্ব নির্থাক। সেগ্র্লি কী কী তা নতুন করে স্থির করা হোক একসংখ্য বসে বেগমপুরে। রত্নর নিজের সিম্ধান্ত এই যে, অতীতের সম্মোহন সম্পূর্ণর্পে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ভারতের ভবিষ্যৎ নেই। স্থাবিরের আবার ভবিষ্যৎ কী? ভবিষ্যৎ হচ্ছে তর্বেরে। অথবা শিশ্রে। যেসব সভ্যতা জীর্ণ হয়েছে তাদের সসম্মানে যাদ্যেরে স্থান দিতে হবে। জীর্ণসংস্কার পশ্ডশ্রম।

যাবার আগে গোরীকে চিঠি লিখল রাত জেগে। লিখল—

এসব কথা এত নিগ্র্ট যে বন্ধ্বদের কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না। নির্বাক হয়ে একা একা ঘ্রুরে বেড়াই। দ্বৃহাতে ব্রক চেপে ধরি, ঘাড় চেপে ধরি। লোকে হয়তো ভাবে পাগল না ক্ষ্যাপা। এই ক'দিন আমি ক্ষ্যাপার মতো অস্থির হয়ে কাটিয়েছি। শেষপর্যন্ত স্থির জেনেছি—কীজেনেছি, শ্রুবে?

গোরী, তুমি হচ্ছ আর-একটি আমি। আমি যদি নারী হয়ে জন্ম নিতৃম আমার নাম হতো গোরী। আমার রূপ হতো গোরীর। তুমি আমার প্রতিবিন্দ্র। কিংবা আমিই আমার। আমরা যমজ নই। কারণ যমজের মধ্যে আছে পার্থ ক্যের ভাব। আমরা যুগল নই। কারণ যুগলের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব। তা হলে আমরা কী? আমরা এক অপরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা একই ব্যক্তির নামান্তর ও রূপান্তর। জন্মান্তরে নয়। একই সময়ে।

আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। এর পিছনে আছে অনেক নিদহারা রাত। ক্ষীণাহারী দিন। এ আমার অনেক দ্বঃখের উপলব্ধি। গোরী, তুমি এসে আমার অন্তজীবনের ঘরকল্লা ওলটপালট করে দিয়েছ। অগোছালো সংসার নিয়ে আমি ভীষণ কণ্ট পাচ্ছি। একে গোছাতে হলে তোমার সংগ্রে আমার সম্বন্ধটা চিরকালের মতো নির্ণয় করতে হবে। আজ ভাইবোন, কাল বন্ধ্ব বন্ধ্বনী, পরশ্ব মিতা মিতানী পাতিয়ে চিরকালের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বাকী থাকে প্রেমিকপ্রেমিকা। তার বাধা কোনখানে তা কি তুমি জান না? আমার হ্দয় পড়ে আছে আর-একজনের কাছে। সেইজনেয় আমার সমাধান এই যে, তুমি আর-একটি আমি। আমি আর-একটি তুমি। প্রেম তো আপনার সংগ্রে আপনার হয় না।

তা ছাড়া প্রেমের উপর নির্ভার করে চিরকালের সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। প্রেম যেন বহতা নদী। কোথাও একঠাই আবন্ধ থাকে না। তাকে বন্ধন দিয়ে স্থিতিবান করতে গোলে বন্ধনই সার হয়। গোরী, আমার সংগ চিরকালের সম্বন্ধ যদি চাও তবে প্রেম বাদ দাও। তা বলে তোমার জীবন থেকে প্রেম বাদ দিতে বলব না। তুমি আর কাউকে ভালোবাসবে। আর

কারো ভালোবাসা পাবে। তোমার হৃদর যদি শ্ন্য থাকে আমার একটি নিবেদন আছে। তুমি আমার বন্ধ্ কাননকে ভালোবেসো। সর্ব জীবে ওর কর্ণা। পশ্নপক্ষীর এমন দরদী আর নেই। দৃঃখী মান্বেরও। সোনালীর দৃঃখে ওই তো প্রথম সাড়া দের। ওর হৃদরটিও সোনালী। কিনা সোনার। ওর কাছে তুমি একট্বতেই সাড়া পাবে। ওর নিজের জীবনেও একটি স্কুদর যোজনা হবে। বেচারা কানন! কোনো মেরে ওকে ভালোবাসে না। ও অশ্তরে অশ্তরে নিঃসংগ।

আমার কথা যদি জানতে চাও তেং জানাতে পারি, কিন্তু রাগ করবে না তো? আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি যে নারী প্রব্রের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। আমি ফেমিনিস্ট। নারীসাম্যবাদী। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে নারীকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তাই poetic justice হিসাবে কবিরা সাধকরা নারীকেই গ্রুর্ বলে বরণ করেছেন। আর সকলের চোথে সে ছোট। কবিদের সাধকদের চোথে সে বড়। এমিন দর্টি নারী-আদর্শ আমার মনে মর্দ্রিত হয়ে গেছে। রাধা ও বিয়াট্রিস। মধ্যযুগের কবি ও সাধকদের প্রেমগ্রুর্। নারীর এই ভাবর্প আমিও ধ্যান করেছি। কিন্তু ধ্যান করে ক্ষান্ত থাকিনি। বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছি। আমার মনে হয়েছিল মালাদির মুখে বিয়াট্রিসকে দেখেছি। ক্রমে সে ধারণা ফিকে হয়ে আসছে। এখন মনে হছে বিয়াট্রসকে যদি ম্তিমতী দেখতে চাই তো এ দেশে পাব না, ও দেশে যেতে হবে। ইউরোপে।

আর রাধাকে? রাধাকে যদি নারীতন্তে দেখতে চাই তো ও দেশ থেকে এ দেশে ফিরে আসতে হবে। তার পর নিজের শ্রেণী থেকে নিচের শ্রেণীতে নেমে যেতে হবে। কৃষ্ণ তাঁকে ক্ষতিয়কুলে পাননি। পেয়েছিলেন গোপকুলে। আমি হয়তো পাব চাষীকুলে কি মাঝিকুলে। গোরী, তুমি আমার আর-একটি আমি। তোমার কাছে খ্লে বলতে সঙ্কোচ নেই। আমার প্রত্য় হয় না যে তুমি রাধা। দেখেছি তো তোমার ফোটো। আমার কল্পলোকের রাধার সঙ্গে মেলে না। মিললেও আমি রাধার জন্যে প্রস্তুত নই। মালাদির প্রতি আমার আনুগত্য। বিয়াট্রিস-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা।

ওদিকে বড়িদনের বন্ধে আসবে বলে শ্রীমতীকে বারা কথা দিয়েছিল ভাদের মধ্যে একমার্ট্র কানন তার প্রতিপ্র্রুতি রাখল। একটিমার কোকিলকে দিয়ে বসন্তকাল হয় না। ম্লানীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে কে? বৈঠকখানায় যশোবাব্রের সঙ্গে আন্ডা দিয়ে ও তাঁর সেই বিখ্যাত বিলিতী বেহালা শ্রুনে কাননের দিন কাটে। অন্দর থেকে ডাক এলে শ্রীমতীর সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করতে হয়। তার পরিপাটি আহারের সময় গোরী নিজে বসে পাখা করে। য়্র্যাত গুটা শীতকাল। মাধবের মতো কাননও আর কিছ্রু দিন বাদে ও বাড়ীর গ্রুদেবতা বনে যেত, কিন্তু একদিন তার আসন টলল। বেলগাঁও থেকে খবর এলো গান্ধীজীর ইছা নয় অদ্রে ভবিষ্যতে কোনোর্প গণ আন্দোলন করা। তাঁর কাছে যারা ফাইটিং প্রোগ্রাম দাবী করেছিল তাদের মাথায় তিনি ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছেন। ফাইটিং প্রোগ্রাম চাও তো আগে বিদেশী বন্দ্র বর্জন কর। মিলের কাপড় নয়, মিলের স্ত্রো দিয়ে তৈরি তাঁতের কাপড় নয়, হাতে কাটা স্তোর তাঁতে বানা খন্দর পর। চার আনা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য না হয়ে স্তো কেটে সদস্য হও।

আহ্মাদে অধীর হয়ে কানন বলে ফেলল, "সাবাস, গান্ধীজী। এই তো চাই।" ভেবেছিল শ্রীমতীও সায় দেবে। কিন্তু ওর ভাবভংগী দেখে ভয় হলো ও মাথায় বাড়ি খেয়ে ঘায়েল হয়ে পড়েছে। বেল পাকলে কাকের কী? বেলগাঁও কংগ্রেস রণছাড় হলে বেগমপ্রের শ্রীমতীর কী? কানন গালে হাত দিয়ে ভেবে আকুল। অনেক ক্ষণ পরে শ্রীমতী যা বলল তার মর্ম এই। দ্বভু ব্রুড়ো বেনিয়া ওর মাথায় হাত ব্রুলিয়ে ওর অলংকারগ্রুলি নিয়েছে। গণসত্যাগ্রহ করবার নাম নেই। বারদোলি সত্যাগ্রহ চোরীচোরার অজ্বহাতে স্থাগত রাখায় ও স্তান্ভিত হয়েছিল। তব্ ওর বিশ্বাস ছিল যে গণ আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। এখন সে বিশ্বাস চ্প্ হলো। না, সে ক্ষমতা গান্ধী ব্রুড়োর নেই। ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে তিনি বেকায়দায় পড়েছেন। ভান্মতীর খেল জমছে না। ডুগড়ুগি বাজালে কী হবে?

কানন একট্র প্রতিবাদের মতো করেছিল। শ্রীমতী দপ করে জনলে উঠেছিল। "তুমি কী ব্রথবে আমার ব্যথা! তোমার তো সর্বস্ব বায়নি।" তার পর ধীরে ধীরে কানন শ্রনতে পেলো শ্রীমতীর মর্মবেদনার হেতু। মৃত্তি

না পেলে সে বাঁচবে না। কেমন করে পাবে, যদি না গণ আন্দোলনে ঝাঁপ দের? কিন্তু গণ আন্দোলন হলে তো ঝাঁপ দেবে! সন্তাসবাদেও সে আর মনুন্তির হাতছানি দেখছে না। বিদেশী বসন বয়কট করে খাদি পরে স্তো কেটে কি সে আপনাকে মন্ত করতে পারবে? বৃথা স্বপন!

কানন তাকে নতুন কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি। যশোবাব্র মতো নিখং ভদ্রলোকের সংগে কেন যে তার বনছে না কাননের কাছে এটা এক দর্ভেদ্য রহস্য। স্বাোগ পেলে সে দর্জনের মাঝখানে মধ্যপ্রতা করতে রাজী আছে। নয়তো অত বড় একটা খানদানী বংশে কলঙ্ক লাগবে। শ্রীমতী কিন্তু মধ্যপ্রতার প্রস্তাবে সম্মত নয়। সে বলে, "কানন ভাই, চাঁদের উলটো পিঠ কেউ দেখতে পায় না। তুমিও দেখনি। ও শর্ধ্ব চাঁদের বৌ দেখেছে।" এর মানে কী? কানন তো হতবান্ধি।

বেগমপুর থেকে ঘুরে এসে কানন চিঠি লিখেছিল রত্নকে। মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে। তারই শেষের দিকে ছিল, "মানুষের জন্যেই ম্লনীতি। মানুষ যদি দ্বঃখ পায় তা হলে তার দ্বঃখ কিসে দ্র হয় সে কথা না ভেবে কতকগ্রলা শ্বুক্ত অনুশাসন দিয়ে কী হবে? ভাই রতন, পায়ুলবোন য়তে স্বখী হয় তার উপায় অন্বেশ কর। দেখেশ্বনে মনে হলো ও তোমার দিকেই চেয়ে আছে স্ব্ধানুখীর মতো। সাত দিন ছিল্ম, এমন দিন যায়নি যেদিন কথায় কথায় তোমার নাম ওঠেনি। আর কারো নাম দিনান্তেও একবার নয়। তোমার সম্বন্ধে ওর গভীর জিজ্ঞাসা। আমরা সবাই তোমাকে শ্রুখা করি জেনে ও পরম তৃষ্ঠিত পেলো। আমাকে বিশেষ করে বলেছে, তোমাকে যেন আমি বেগমপুর বা কলকাতা নিয়ে গিয়ে দেখাই। ও দেখতে চায়। কবে তোমার সময় হবে? পরীক্ষার পরে বোধ হয়। আমি তৈরি যে কোনো সময়।"

গোরীর বর্ণনাও ছিল কাননের চিঠিতে। পড়ে মনে হলো গোরী সমস্ত ক্ষণ জনলছে। তিলে তিলে দশ্ধ হচ্ছে তার দেহমন। আগন্নের হলকা ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে। হাওয়া গরম হয়ে উঠছে। শীতকালে পাখার দরকার হবে না? পাখাটা দিয়ে এমন মার মারল একটা বেড়ালকে যে কাননের পশন্দরদী মন গামরে উঠল। সে আর খাবে না বলে হাত গাটিয়ে বসল। লক্ষ্য করল

গোরীর চোখেও জল। এই হাসি এই কামা এই রাগ এই আদর। সব মিলিরে এই শ্রীমতী।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে কাননের চিঠির সংগ একই ডাকে গোরীর চিঠি পেরেছিল রত্ন। তাতেও কতকটা এই ধরনের কথা ছিল। কাননটা ছিচকাদ্ননে ব্র্ডো খোকা। ওর দিকে তাকালে বাৎসল্যের ভাব আসে। ওর প্রেমে পড়বে কোন মেরে! খোকাবাব্রকে ভালোবাসবার জন্যে একটি খ্রুমণি খ্রুতে হবে। একটি পাঁচ বছরের খ্রু। গান্ধীজীর অকর্মণ্যতায় গোরীর ব্রক ভেঙে গৈছে। সে আর রাজনীতি করবে না। রাজনীতির ভাবনা মনেও আনবে না। গত লোকাল বোর্ড নির্বাচনে শ্বশর মহাশয় দাঁড়িয়েছিলেন, সে তাঁর জন্যে ভোট ভিক্ষায় নেমেছিল। ফলে শ্বশর মহাশয় তাকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু শ্বশ্রপ্রের পারে আত্মসমর্পণের শঙ্কা তো অতীত হর্মন। সেইটেই স্বাধীনতার কন্টিপাথর। গোরী রত্নর উপর নির্ভর করেছিল। কিন্তু সেও তো ধরাছোঁয়া দিতে রাজী নয়। তার মালাদি আছেন যে! গোরী অভিমান করে লিখেছে—

তোমার চিঠিখানি মিছরির ছ্রির। মিণ্টি মিণ্টি কথা, কিন্তু সব কথার সার কথা তুমি আমাকে ভালোবাস না। ভালোবাসতে পারবে না। এই যখন তোমার শেষ কথা তখন আমার আর কী বলবার আছে? কী বলব?

আগড়ম বাগড়ম এত বকবক না করে তুমি যদি শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করতে! যদি বলতে, আমি তোমাকে ভালোবাসি! তা হলে কি আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে না জানি কোন মহৎ কাজ করতে যেতুম না! কত মহৎ সম্ভাবনা ছিল আমার জীবনে। কিন্তু সোনার কাঠি ছোঁয়াবে কে! কোন রাজপ্রে! প্রিয়তম, তুমি আমাকে নিরাশ করলে।

তোমার এ প্রত্যাখ্যান আমি ভুলতে পারছিনে। তাই তোমার মিঠে কথার ভুলছিনে। মিঠে কথা প্রায়ই মিছে কথা হয়। তুমি আর-একটি আমি। আমি আর-একটি তুমি। তা হলে তোমার আমার ভিন্ন নির্মাত কেন? আমি কেন বিন্দিনী? তুমি কেন মৃক্ত? আমি কেন কলেজে তোমার সহ-

পাঠিনী হতে পাইনে? অন্তত অন্য কলেজে? আমি কেন তোমার মতো স্বশ্ন দেখব না? প্রেষ্-আদর্শের? তোমার যেমন বিয়াট্রিস ও রাধা আমার তেমনি অর্জনে ও কৃষ্ণ।

তোমার মতো আমার কেন শ্রমণের স্বাধীনতা নেই? আমি কেন যেখানে মন চায় যেতে পারিনে? ইউরোপ তো অনেক দ্রের কথা। কলকাতা এত কাছে, তব্ সেখানে যেতে দেবে না। দিলে এক দল লোকলম্কর সর্গে দেবে। নইলে এদের মানসম্মান থাকবে না। আমার প্রাণান্ত। কোথায় এদের লোকজনকে রাখি? জানি তারা এক একটি গ্রুত্চর। আমি তাদের নজরবন্দী। তব্ তাদের তোয়াজ করতে হবে। সেদিন কলকাতা গিয়ে আমার খ্ব শিক্ষা হয়েছে। তা হলেও যাব আবার, যদি তোমার সংগ্র দেখা হয়।

কাননকে সের্ধেছি যেমন করে হোক যেখানেই হোক তোমার আমার সাক্ষাৎ ঘটাতে। বেগমপুরে হলেই ভালো, নয়তো কলকাতায়। কবে তোমার স্ক্রিধা হবে ওকে লিখো, আমাকেও জানিয়ো। সত্যি আমি সংকটাপন্ন। কিন্তু লেখনীমুখে বোঝাতে পারব না। লোকমুখেও না।

আমি যে সব আশা সব ভরসা হারিয়ে ফেলেছি! আমি কি তবে হেরে যাব? হার মানব? প্রথম বয়সে আত্মঘাতী হতে চেন্টা করেছিল্ম। তাতে আন্তরিকতা ছিল না। যে জগতে এসেছি তার পরিচয় না নিয়ে তার কাছে নিজের পরিচয় না দিয়ে অকালে বিদায় নিতে পা সরে না। আমি বাঁচতেই চাই। আমার যে সব দেখা সব শেখা সব পাওয়া সব করাই বাকী। আমার ইন্দিয়ে ইন্দিয়ে অশান্ত অতৃত্ত কামনা। এ নিয়ে আমি যাব কোন স্বর্গে? আমাকে বাঁচতেই হবে। তা বলে কি আমি অনন্তকাল জন্মব? জন্মতে পারে কেউ? দন্ধ হতে হতে আমার যোবন গেল। জীবনও যাবে? হ্দয়ভরা দাহ নিয়ে আমার র্প কত কাল থাকবে? তবে কি আমি পরাজিত হব? পরাজয় মানব?

ভাবতে পারিনে, প্রিয়। আমার মনে হচ্ছে আমি আবার অসন্থে পড়ব। একটা কোনো শক্ত অসন্থে। সন্থ না থাকলে অসন্থ তো করবেই। যেমন

তোমার মালাদির করেছে। কে জানে হয়তো আমার অসুখ করলে তুমি আমাকে দেখতে আসবে। হয়তো অস্তমুখী শশিকলার মতো মিলিয়ে যাচ্ছি দেখলে ভালোবাসবে।

রত্ন, পরিত্রাণের পশ্থা জান তো বল। জানা জর্বর। সব্র সইবে না। এমন কিছ্ ঘটে যাবে যার জন্যে সারা জীবন পশতাতে হবে। তোমার তপোভগ্গ করতে হচ্ছে বলে দ্বঃখিত। ওদিকে তোমার পরীক্ষা। এদিকে আমারও তো পরীক্ষা। তুমি পাশ করবে, আমি ফেল করবে এই কি আমাদের নির্য়তি? তোমার আর-একটি তুমি ফেল করলে সেটা কি তোমারই ফেল করা নর?

এমনি বিষণ্ণ সন্তর আরো অনেক কথা লিখে গোরী ইতি দিয়েছিল। ইতির পরে লিখেছিল, "তোমার অভাগিনী গোরী।"

শাল্তিনিকেতনের ভাবলোকে বিহার করতে করতে রত্ন বাস্তব সংসার থেকে অনেক দরের গিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসেও তার সংসারচেতনা হয়নি। সৌন্দর্যের ঘোর ভাঙতে চায় না। কিন্তু কাননের ও গোরীর চিঠি দ্র'খানি তাকে ধ্লির ধরণীতে নামিয়ে আনল। বিষাদে ভরে উঠল মন।

শাণিতনিকেতনে যে কয় দিন ছিল বস্তুলোকের উধের্ব রুপলোকে ছিল। সেখানে যেন সর্করের রাজত্ব। "যে যায় সে গান গেয়ে যায় সব পেয়েছির দেশে।" দিনে রাতে সকালে সাঁঝে যখন খর্শি যার খর্শি গান গেয়ে উঠছে। কত রকম গান। সব রবীন্দ্রনাথের রচনা। কী অপ্র্ব তার স্বর, তার ব্যঞ্জনা, তার অন্বর্গন! সাঁওতাল মেয়েরা সার বে'ধে গান গেয়ে চলেছে তাদের নিজেদের মতো করে। এক ঝাঁক ব্বনো পাখী আর কী! সাঁওতাল ছেলেরা বাঁশি বাজাচ্ছে আপন মনে। ছবি আঁকছে পট্রারা পথের ধারে বা মাঠের মাঝখানে। খোলা আকাশের তলে। বাইরে থেকে আকাশকে লুট করে নেবে, লুটে নেবে প্রকৃতিকে।

মেলা দেখতে মেলা লোক এসেছিল। কিন্তু রত্ন অঞ্জন বিদ্যাপতি তো মেলা দেখতে যার্যান। ওদের লক্ষ্য মেলামেশা। তার অফুরুনত সুযোগ জুটল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, তিনি তখন দক্ষিণ আমেরিকার। র্যান্ডর্জ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যার ইত্যাদি আরো অনেকে ছিলেন। আলাপ করে ও ফোটো তুলে, গান শ্বনে ও গল্প করে, মান্ষ চিনে ও দৃশ্য দেখে ওদের মনে হলো ওরা কত কাল শান্তিনিকেতনে আছে। ওরাও আশ্রমিক। দেশী বিদেশী তর্ণ তর্ণীর সঞ্গে পরিচয় হলো। তেমন পরিচয় দ্র্রভ। বিদ্যাপতি বলে, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং না গচ্ছামি। সলিল তাকে ক্ষ্যাপায়। তার বোনরা শ্বনে হাসে। শিশ্বমহলেও সে সমান জনপ্রিয়। নামের গ্বণে কি র্পের গ্বণে বলা যায় না। পরীক্ষার ভয় না থাকলে সে বোধ হয় ফিরতে চাইত না। রত্নও কি ফিরতে চাইত?

আহা! সেই বৈকু-ঠবাসের পর কোথায় তার স্মৃতির সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, তা নয়। মৃত্তির উপায় অন্বেষণ কর। সব্র সইছে না। জর্ত্তির। নইলে অস্থ করবে। শক্ত অস্থ। মালাদির মতো শ্রকিয়ে যাবে গোরী। মালাখানির মতো।

কেন এমন হয় যে রত্ন যত বার সোন্দর্য দিয়ে তার চেতনা ভরতে যায় অস্কুনর তত বার এসে তার ধ্যান ভেঙে দেয়! চেতনা জ্বড়ে বসে! নিষ্ঠ্র বাস্তব তাকে স্বাধীন হতে দেয় না। আর সকলের মতো সেও বস্তুলোকের নিরমাধীন। মানতে চায় না শাসন, মানতে হয়। অন্যথা প্রাণধারণ অসম্ভব।

রত্ন যখন উদ্দ্রান্ত বোধ করে তখন হস্টেলের বেড়ার বাইরে করবীর ঝাড়ের নিচে অর্ধশায়ান হয়। কবিত্ব করে বলে, "করবীকুঞ্জ।" বেমন শান্তিনিকেতনের "মঞ্জন্মালতী কুঞ্জ।" সেখানে কেউ তাকে বিরম্ভ করতে আসে না। এক বিদ্যাপতি আন্দাজ করে যে কিছন্ একটা হয়েছে, কাছে এসে সহান্ভৃতি জানায়।

সেদিন বিদ্যাপতি বলল, "কি হে, অমন মনমরা হয়ে ভাবছ কী? যাদের ফেলে এসেছ তাদের কথা? 'কোনো নামটি মন্দালিকা, কোনো নামটি চিত্রলিখা।' আবার কবে শান্তিনিকেতন যাওয়া হচ্ছে আমাদের? বসন্ত উৎসবের সময় গেলে কেমন হয়?"

তিন বন্ধ, এরই মধ্যে দক্তির কাছে ঢোলা পায়জামার ফরমাস দিয়ে

এসেছিল। বাবরী রাখবে বলে নাপিতকে জানিরে দিরেছিল। বাকী থাকে তিনজনের তিনটি দাড়ি। কিন্তু একালের মেরেরা কেউ দাড়ি বরদাসত করবে না, যদিও দাড়ি বাদ দিলে গ্রের্দেবের গ্রের্ছ বারো আনা কমে যায়।

"ওঃ! তুমি দেখছি শান্তিনিকেতনে হ্দয় হারিয়েছ। হারামণি খ্রুজতে যেতে চাও! নিজের ভাবনা আমার উপর আরোপ করছ।" রক্ন পরিহাস করতে গেল। কিন্তু পরিহাসের স্বর বাজল না। ধরা গলায় বলল, "ভাই বিদ্যাপতি, একসণ্গে যে ক'টা দিন আছি একগ্রবাসের মাধ্বরী দিয়ে পেয়ালা ভরে নিই এস। এর পরে তুমি কোথায় আর আমি কোথায়! আমার জীবনের একটা অধ্যায় তো সারা হয়ে এলো। সমাণ্তির হাওয়া গায়ে লাগছে।"

"কেন? তুমি এম-এ পড়বে না?"

"না। তোমাকে প্রথম হবার স্থোগ দেবার জন্যে আমি অপসরণ করব।"
বিদ্যাপতি খ্রিশ না হয়ে ক্ষ্মে হলো। "কোথায় যাবে? শান্তিনিকেতন?"
রত্ন বলল, "না, ওখানে আমার হারামণি নেই। আমি লিখতে লিখতে
এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাব। লেখার উপার্জনে একজনের সংসার চলে
যাবে।"

"আরেক জন এলে?" বিদ্যাপতি কোত্হলী হলো।

"আমার জীবনের প্যাটার্ন স্থির হয়ে গেছে। আমি যত দ্র পারি একাকী উড়ব। সন্ধিনী যদি কেউ হয় সেও পাশাপাশি উড়বে। নীড় বাঁধার কথা ওঠে না। আমি একসংখ্য বাস করা পছন্দ করিনে। অতিপরিচয় থেকে অবজ্ঞা জন্মায়। কাছাকাছি বাস করলেই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে দেখা হবে। দেখা না হলেই বা কী!"

বিদ্যাপতি লম্জার মাথা খেয়ে বলল, "না হলেই বা কী! মিলন হবে না, বলতে চাও? কোনো দিন হবে না?"

রত্ন শরমে অর্ণ হয়ে বলল, "হবে হয়তো।"
বিদ্যাপতি সলম্জ ভাবে স্থালো, "সম্তান হলে?"
রত্ন রতিন হয়ে বলল, "হবে না।"
বিদ্যাপতি তড়িংস্প্রেম মতো চমকে উঠল। "তার মানে? রহ্মচর্ষ?"

রত্ন রেঙে উঠে বলল, "অন্য উপায় আছে।"

বিদ্যাপতি ঘেমে উঠে বলল, "ওসব চলবে না এ দেশে। অমন মেয়েই বা কোথায়! তা ছাড়া ওটা নারীত্বের আদর্শ নয়। নারীত্বের পরিণতি মাতৃত্ব।"

রত্ন এত ক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠল। তর্ক করতে পেলে সে আর কিছু চায় না। বলল, "ওসব চলে এসেছে সব দিন সব দেশে। এ দেশেও। তুমি খোঁজ রাখ না। অমন মেয়েও আছে বই-কি। আমি যখন আছি তখন সেও আছে কোথাও। নইলে জোড় মিলবে কী করে? ভগবান আমাদের জোড়ে জোড়ে পাঠান। আর ওই যে নারীত্বের আদর্শের কথা বললে ওটা প্রর্যের দাড়িত্বের মতোই সেকেলে রেওয়াজ। চিরন্তন নয়। একালের ছেলেরা একালের মেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে ঠিক করবে নারীত্বের আদর্শ কী হবে আর পৌর্বের আদর্শ কী হবে ভালো হয়।"

চোম্দ

কাননকে গোরীর মনে ধরেনি বলে রত্ন দ্বঃখিত হয়েছিল। কাননের জন্যেও বটে, গোরীর জন্যেও বটে। তার নিজের জন্যেও। কারণ এখন তো ভালোবাসার দায় তারই উপর বর্তায়। 'ভালোবাসব' বলা সহজ নয়, 'ভালোবাসব না' বলাও কঠিন। গোরীর মতো না হলেও রত্নও সক্কটার্ড। তার এটা উভয়সক্ট। সব চেয়ে ভালো হতো গোরী যদি কাননকে ভালোবাসত, কানন গোরীকে। তা তো হবার নয়।

রত্ন আত্মপরীক্ষা করে দেখল গোরীকে সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। রাখীবন্ধ বহিনকে পরিত্যাগ করা যায় না। বীরধর্মে বাধে। সম্পর্ক ইতিমধ্যে বদলে গেছে, কিন্তু রাখী তো বাঁধা রয়েছে। সে বাঁধন খোলেনি। আলগা হয়নি। রক্মারি সম্পর্কের কথা ভাবা গেছে। কোনোটা খাপ খাছে না। 'তুমি আমার আর-একটি আমি' 'আমি তোমার আর-একটি তুমি' এর মধ্যে চিরন্তনতা আছে, কিন্তু এ সম্পর্ক গোরী স্বীকার করবে না। একতরফা কেমন করে চলবে? সম্পর্ক যাই হোক না কেন, রঙ্গ বৃক্তে হাত রেখে জানল যে গোরীকে সম্কট-

মন্ত না করে তার সক্টমন্তি নেই। পথি নারী বিবজিতা আর যার স্বারা হোক তার স্বারা হবে না। তবে সে একা পারবে না অত বড় দায় বইতে। সাত ভাই চম্পাকেও বইতে হবে। কিন্তু আপাতত আর কাউকে বলতে ভরসা হয় না। গোরী কী মনে করবে! সে তো আর কাউকে তেমন করে চেনেই না। চেনে সাত ভাইরের মধ্যে কাননকে। আর যাকে চেনে সে রত্ন স্বরং।

রত্ন শিখল কাননকে, "একটা গান আছে বাউলদের। শ্নেছে? 'কামর্পেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।' আমিও ভাবছি বাউল হয়ে গান বাঁধব, 'বেলগাঁওতে কী হয়েছে বেগমপ্রে অস্থ কার।' গান্ধীজী গণ আন্দোলন করবেন না, তাই শ্রীমতী দেবীর ব্রুকে ব্যথা। তুমি, ভাই, তোমার পার্লবোনকে হাতে নাও। তুমি তো কাছাকাছি থাক, তোমার পাশ কোর্সের পরীক্ষায় অত চাপও নেই। আমাকে আপাতত মাফ করতে হবে। তবে যদি সত্যি কোনো রকম বিপদ আপদ ঘটে আমি সব সময় তৈরি।"

সব সময় তৈরি, এ কথা লিখবামাত্র তার মনের ভাব হালকা হয়ে গেল। হাঁ, নাইট সব সময় তৈরি। রত্ন এ জীবনে কত কী হতে চেয়েছে। সাধক, শিল্পী, প্রতিমাভণ্গকারী, ত্রবাদ্রর, নাইট। কিল্পু ঘটনাচক্র তাকে আর সব কিছ্র থেকে নিবৃত্ত করে নাইট করবে বলে বন্ধপরিকর। বেশ, তাই হোক। এটাও তার প্রার্থনার উত্তর। বর লাভ। সে এবার যখন গোরীকে চিঠি লিখতে বসল তখন লিখল—

সময় থাকলে তোমাকে শান্তিনিকেতন যাত্রার গলপ লিখতুম। সারা পথ সলিল ব্রহ্ম যা মজা করল তা শ্ননলে হেসে খ্ন হবে। বোলপ্র স্টেশনে নেমে দেখি আশ্রমের মোটরবাস আসেনি। সেই সনাতন গোর্র গাড়ীতে আমাদের সাত আটজনের মালপত্র চাপিয়ে আমরা পায়ের গাড়ী চালিয়ে দিল্ম। মাত্র দ্বামইল। বাংলাদেশের এই অঞ্চলটা সাঁওতাল পরগণার মতো অসমতল ও শ্বেক। চার দিকে একপ্রকার র্ক্ষ শোভা। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থলে স্থলে তর্রাজি। পথের দ্বই পাশে কাশের সারি। আশ্রমের চার দিকে প্রশাসত প্রান্তর আর ছোট ছোট ঝোপ ছাড়া আর কিছ্ব নেই। মর্ভ্রমিতে ওয়েসিসের মতো লতাগ্রম্পত্রপ্রত্বিত্বক অত্রালে অবস্থিত কয়েকটি

নানা আকারের নানা রীতিতে নিমিত কুটির। বেশীর ভাগই খড়ের। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব আছে।

আমার দৃষ্টি প্রকৃতির উপর ততটা নয় যতটা মান্বের নিমিতির উপরে। যা মান্বের হাতে গড়ে উঠছে তা আকারে উল্লেখযোগ্য নয়। তোমাদের ওখানে তার চেয়ে বৃহৎ আয়তন পাবে। তোমার চিঠিতে তুমি মহৎ' শব্দটি ব্যবহার করেছ। আমিও সেই শব্দটির শরণ নিচ্ছি। শান্তিনিকেতনে যা গড়ে উঠছে তা মহৎ। কেবল আশ্রম নয়, সম্তপণী কুঞ্জ নয়, কলাভবন নয়, বিশ্বভারতী নয়, আন্তর্জাতিক শ্রীক্ষের নয়। নতুন যুগের বালক বালিকা তর্ণ তর্ণী। আমাদের সংগ এদের মিলবে কেন? আমরা মান্ব হচ্ছি এক রাশ নেগেটিভ নিয়ে। আয় এরা মান্ব হচ্ছে একট্ঝানি পজিটিভ হাতে করে।

ব্ বিরে বলি। আমরা যেসব স্কুল কলেজে পড়ি সেসব আমাদের করেদখানা। কর্তারা আমাদের বিশ্বাস করেন না, আমরাও তাঁদের বিশ্বাস করিনে। এই দেখ না, এই হস্টেলের চার দিকে লোহার রেলিং। ঢ্বকতে হয় লোহার দরজা দিয়ে। সে দরজা বন্ধ হয়ে যায় রাত দশটায়। দশটা থেকে ছ'টা আমরা তালাবন্ধ। সকালে ও সন্ধায় প্রিফেক্ট ঘ্রের বেড়ান, দেখে যান যে যার কুঠরিতে পড়াশ্বনা করছে কি না। স্বুপারিনটেনডেণ্ট পরিদর্শন করতে আসেন। কাউকে অনুপস্থিত পেলে রক্ষা নেই। এর সঙ্গো তুলনা কর শান্তিনিকেতনের। ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা বলে, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্ব।' ধন্য রবীন্দ্রনাথ! ধন্য তোমার রাজত্ব!

তুমি আমার সহপাঠিনী হলে সুখী হতে? কিন্তু আমাদের কলেজ নারীবজিত। এ শুধু সন্ভব শান্তিনিকেতনে। সেইজন্যে আমার বন্ধ বিদ্যাপতির সে কী আফসোস শান্তিনিকেতন ছাড়তে! এখনো তার মাথার শান্তিনিকেতন ঘুরছে। কিন্তু যা বলছিল্ম। আমরা মানুষ হচ্ছি একরাশ নেগেটিভ নিয়ে। যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কয়েদ করেছে তাকে চাইনে। এ ব্যবস্থা যারা কায়েম করেছে তাদের রাজত্ব চাইনে। তাদের রাজত্ব যার

উপর দাঁড়িরেছে সেই শাসন পম্পতি চাইনে, সেইসব আইনকান্ন চাইনে। তার গোড়ার যা আছে সেই সভাতা চাইনে, সেই সংস্কৃতি চাইনে। আর শাস্তিনিকেতনের ওরা মান্য হচ্ছে একট্যখানি পজিটিভ হাতে করে। ওরা গড়ে নিতে চার। যা ওদের মানসে আছে তা গড়ে নিতে চার। যা ওদের অসতরে আছে তাকে বাইরে আনতে চার। বাইরে দেখতে চার।

গোরী, তুমিও কি ওদের মতো একট্খানি পজিটিভ নিয়ে শ্র্ব্ করতে পার না? এমন কিছ্ যা অপরের প্রতিবাদ নয়, পালটা নয়, বির্ম্থ নয়, বিপরীত নয়। যা অন্যানরপেক্ষ, আপনাতে আপনি স্থিত। যা নেতি নেতি নয়, ইতি ইতি। এমন কিছ্ কি নেই তোমার সন্ধানে? তোমার ধ্যানে? তুমি তোমার আপন কাজ খ্রেজ পেলে তোমার এ অস্থ অমনি সেরে যাবে। গোরী, তুমি অপরাজিতা। কে তোমাকে পরাজিত করবে? পরাভব আসে বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে। মান্স হারে তার নিজের দ্র্রলতায়। পরের প্রবলতায় নয়। তুমি হারবে না, গোরী, হারতে পার না। তুমি মহাশান্তিস্বর্ণিণী। তুমি প্রকৃতি। শান্তিনিকেতনে কত মেয়ে দেখল্ম, কিম্তু তোমার মতো কেউ নয়। তোমার কথাই কেবল মনে পড়ছিল। ভাবছিল্ম গোরী যদি এখানে পড়ার স্ব্যোগ পেত এদের স্বাইকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিত।

কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে জানিনে। আমার তো মনে হয় দেখা না হওরাই ভালো। এখনো আমাদের সম্পর্ক স্থির হলো না। তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এত দিনেও পরিষ্কার হলো না। সন্দেহ নেই যে আমরা নিকট সম্পর্কার। সেইস্ত্রে আমরা নিকটবতী হতে পারি। কিন্তু নিকটে গেলে তো ঠোকাঠ্কিও বাধে। একজন যা আশা করে আরেকজন যদি তা দিতে না পারে তা হলে আশাভঙ্গ অনিবার্য। তুমি কাদবে, আমি সইতে পারব না। এমনিতেই আমি কাল্লা সইতে পারিনে। কারো কালা।

তবে, ভগবান না কর্ন, তোমার যদি কোনো আকস্মিক বিপদ ঘটে তা হলে আমি দেশে থাকলে তোমার কাছে ছুটে যাব, জেনো। কোন স্বাদে

যাব, ভেবে দেখব না, ভেবে দেখবার সময় পাব না। তুমি আমার কে, আমি তোমার কে, এ গণনা তখন নয়। তখন আমি নাইট। নারী বিপল্ল। আমি তার পাশে। যেমন রোগী ম্ছিতি। ডাক্তার তার পাশে।

আর কলেজে হাজিরা দেবার বালাই ছিল না। টেস্ট চুকে গেছে। শীতের নরম রৌদ্রে পা ছড়িয়ে গাছের গ‡ড়ি ঠেস দিয়ে ঘাসের উপর দশ্তর পেতে বসে রক্ষ। সেইখানে তার কাছে পড়া ব্বেখ নিতে আসে তার সতীর্থরা। তারা কেউ তার প্রতিযোগী নয়। হলে তো সে বর্তে বায়। তা হলে আরো জারসে পড়ে। আরো এগিয়ে যায়। তার ঢিলেঢালা ভাবের জন্যে দায়ী তাদের ঢিলেঢালা ভাব।

ওদিকে মৌনীবাবা ঘরে খিল দিয়ে কঠোর তপস্যায় রত। প্রভাতকে বিরম্ভ করে এমন সাহস একজনেরও ছিল না। রত্বরও না। দুই বন্ধুর মাঝখানে বহু যোজন ব্যবধান। কত কাল যে ভাববিনিময় হয়নি। আর কবে হবে! পরীক্ষার পর কে কোথায় চলে যাবে। রত্বর দুঃখ হয় ভাবতে যে পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসছে বিদায়ের দিন ততই ঘনিয়ে আসছে। মন কেমন করা এখন থেকেই অনুভব করা যায়।

গোরীর চিঠি এলো চার দিন যেতে না যেতে। সে লিখেছিল—

আমার কী যে বিপদ তোমাকে তা জানাতে পারব না। প্রকাশ করা অসম্ভব। কেন তা হলে তোমাকে দেখা করতে বলে তোমার পরীক্ষার ক্ষতি করি? দেখা হলে স্থী হব, স্বর্গ হাতে পাব। আমার মনের জাের বেড়ে যাবে। কিন্তু বলতে পারব না তোমাকে কােনখানে কাঁটা খচখচ করছে। তুমি যে অন্মান করে নেবে সে ব্লিখ তোমার নেই। ক'জন বেটা ছেলের আছে! এসব মেরেলি ব্যাপার। মেরেদের খ্লে বলতে হয় না। তারা আপনি বােঝে।

একট্ন সামলে নিয়েছি। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে আমার স্বাধীনতার কী সম্পর্ক! অথচ তিন বছর কাল এই রাস্তায় ভেবেছি। এখন আমার মোহভগ্গ হয়েছে। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনে। কিন্তু রাজনীতির

সংখ্যা যোগসার না থাকলে আর কিছুর সংখ্যা যোগ স্থাপন করা দরকার বোধ করি। নইলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয়। বিচ্ছিন্ন বলে দুর্বল।

সেই আর কিছ্র নাম প্রেম। প্রেম আমার পক্ষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো প্রয়োজনীয়। এ না হলে আমি বাঁচব না। বাঁচলে তবে তো স্বাধীন হব? প্রিয়তম, আমাকে ভালোবাসতে দাও। ভালোবাসা পাই বা না পাই ভালোবাসছি, এট্রকু হলেও আমি বাঁচব। এই যে তোমাকে চিঠি লিখছি এট্রকুও আমার জীয়নকাঠি। এর থেকে বণিত হলে আমার মরণ।

এর পর থেকে এক দিন অন্তর একদিন গোরীর চিঠি আসতে থাকল। রক্ষর উত্তরের জন্যে সে অপেক্ষা করে না। তার কোনো দাবীদাওয়া নেই। রত্নকে সে সম্পূর্ণ মৃত্তি দিয়েছে মৃত্তির উপায়চিন্তা থেকে। রত্মরও ক্রমে প্রতায় হলো যে গোরী তাকে উন্দেশ্যাসিন্ধির জন্যে ব্যবহার করতে চায় না। এ রকম একটা সংশয় তার মনের কোণে ছিল। আর ছিল আত্মাভিমান। সে কেন অপর একজনের ন্বাধীনতার বাহন হবে? সে ন্বাধীন সত্তা। ধীরে ধীরে তার সংশয় দ্রে হলো। আত্মাভিমান গেল। তখন সে গোরীর প্রেমের মর্ম উপলব্ধি করল। রস আন্বাদন করল। গোরীর প্রেম রাধার প্রেমের মতো শৃন্ধ প্রেম। নিক্ষিত হেম।

সেও রোজ কয়েক লাইন লিখে রাখে। ভায়েরিরর মতো। দ্ব'এক দিন অন্তর খামে ভরে ভাকে দেয়। তার জীবনদর্শন এই সময় একটা নতুন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। এত দিন সে এক চোখে স্বন্দর এক চোখে অস্বন্দর দেখে এসেছে। এক চোখে ভালো এক চোখে মন্দ। এক চোখে সত্য এক চোখে অসত্য। এই যে ন্বৈত দ্ঘি এর বদলে আসছিল অন্বৈত দ্ঘি। যাই দেখে তাই সত্য, তাই শিব, তাই স্বন্দর। সমস্তটাই সত্য শিব স্বন্দর। তার নবলখ অন্বৈত বা অখন্ড দ্ভির কথা সে লিপিবন্ধ করে গোরীকে পাঠিয়ে দেয়।

গোরীর চিঠিতে রসের কথাই বেশী থাকে। সে তার হৃদর উজাড় করে প্রণর বর্ষণ করে। সাড়া না দিলেও ক্ষান্ত হয় না। রত্নর কাছে এ অভিজ্ঞতা অপ্রত্যাশিত অপূর্ব। সে মনে মনে অভিভূত হয়। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিদান

দেয় না। দিতে পারে না। মালাদির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন আছে। কিন্তু সেই প্রদেনর সঙ্গে এই প্রশন দিন দিন জড়িয়ে যাছিল যে গোরী কি কেবল দিয়েই যেতে থাকবে, পাবে না এক ফোঁটা? পেলে দোষ কী? ক্ষতি কার? কে তার হাতে ধরে বলছে, গোরীকে দিয়ো না, দিয়ো না! গোরীকে দিলে আমি যে পাইনে! আমার ভাগে কম পড়ে!

বেলগাঁও থেকে ফিরে জ্যোতিদা গোরীর স্বাধীনতার ভার নিয়্রেছিল। তার সমাধান রীতিমতো বৈশ্লবিক। সে বলে গোরী যদি সাত্যকারের স্বাধীনতা চায় তবে তাকে শ্রেণীচ্যুত হতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর একজন হতে হবে। শ্রমিক মেয়েরা খেটে খায়, স্বামীর উপর নির্ভার করে না। স্বামীস্টাতে যত দিন বনিবনা তত দিন একসঙ্গে থাকা। বনিবনার অভাব হলে স্টা স্বামীর ভাত খায় না। ভাত না খেলে বাঁধন আপনি খ্লে যায়। তার পর নতুন লোকের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক পাতায়। এইটেই যথার্থ স্ন্নীতি। বসে বসে স্বামীর অম ধ্বংস করা ও স্বামীর অনাচার সহ্য করা স্বাটিত নয়। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর স্বাচ্ছেন্দ্যের মান যতই উন্নত হোক না কেন, প্রকৃত নীতিবাধ তাদের নেই। ম্লেনীতির বেলা আপোস করতে করতে তাদের চরিত্রবল ক্ষয়ে গেছে।

অলক্ষিতে কথন এক সময় জ্যোতিদার প্রতি রত্ন ভক্তিমান হয়েছিল। যদিও কোনো দিন তাঁকে দেখেনি। তাঁর এই পন্থা সে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। গোরী কিন্তু নারাজ। সে অনেক রকম ত্যাগ করেছে ও করবে। ত্যাগে তার কুণ্ঠা নেই। কিন্তু শ্রমে তার অর্নাচ। হাতে কড়া পড়বে, পায়ের পাতা ফাটবে, গায়ের চামড়ায় খড়ি উড়বে। রং কালো হয়ে যাবে। কেই বা তখন তাকে ভালোবাসবে! যে স্বাধীনতার শেষে ভালোবাসা নেই সে স্বাধীনতা তার কোন কাজে লাগবে! সে তার প্রিয় প্রেন্থের ঘরণী হতেই চেয়েছিল, স্বাধীনা হতে চায়নি। ঘরণীই হবে, যদি তার প্রিয়তম প্র্র্মকে পায়। তা বলে সংসারের খাট্নিন তাকে দিয়ে হবে না। ঝি রাখতে হবে, চাকর রাখতে হবে। রাধ্ননী রাখতে হবে। নইলে সে দ্বিদনেই কালো কুংসিত ব্লুড়ী হয়ে যাবে। আর শ্রেণীচ্যুত হয়ে ছোটলোকদের একজন হওয়া! কিছ্নতেই নয়। যের গেলেও নয়। জ্যোতিদা প্রথম-প্রথম শ্রম্ধা করত না রক্তকে। বলত, "ইনটেলেকচুয়াল তো

বড় কম দেখলনে না। ইনিও তাঁদের একজন। পোশাক ছাড়লেই নিজ র্প বেরিয়ে পড়ে। হাড়ে হাড়ে পারিবারিক স্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ।" পরে তার মন একট্র ভিজল। তখন বলল, "ব্যক্তিগতভাবে নিঃস্বার্থ। শ্রেণীগতভাবে স্বার্থবান।" ইদানীং তার মন আরো নরম হয়েছে। বলে, "রঙ্গকে আমি ইনটেলেকচুয়ালের কোটায় ফেলে ভূল করেছিল্ম। কোনো লেবেল ওর গায়ে আঁটা যায় না। ও যেন পদ্মপাতার জল। শ্রেণীর পদ্মপাতায় কেউ ওকে ধরে রাখতে পারবে না।" রঙ্গ তার সমাধান সমর্থন করেছে শ্রুনে জ্যোতিদা পরম স্থা।

রত্বর কথামতো কানন আবার বেগমপুর যায়। এবার জ্যোতিদার সংশা তার দেখা হয়। জ্যোতিদা বেলগাঁও থেকে ফিরেছিল। ওর মনটাও মেঘলা। তবে মুথে হাসি মশকরা লেগে আছে। কানন জ্যোতিদার নিজের হাতে তৈরি কুটিরে রাহিবাস করে, বেলগাঁও কংগ্রেসের ইতিবৃত্ত শোনে। গোরীর মুক্তির উপায় পর্যালোচনা করে। কেউ কারো সংখ্য একমত হতে পারে না। কিল্তু দ্বাজনায় খুব ভাব হয়ে যায়। কাননের কাছে জ্যোতিদা রত্নর খোঁজখবর নিরেছিল। কানন বলেছিল, "রতন আমার বাল্যবন্ধ্ব। অসহযোগের আগে থেকেই ওদের বাড়ীতে বিলিতী কাপড় বন্ধ। এমন কি দিশী মিলের কাপড়ও। ওরা তাঁতের কাপড় পরত। মহাত্মাজীর শিক্ষায় খন্দর ধরল। ওর বাবা সরকারী চাকরি করলে কী হয়, গোঁড়া স্বদেশী। চরকাও কিছু দিন চালিয়েছিলেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। রতনও এক কালে স্তো কাটত। আজকাল কাটে না।"

জ্যোতিদা লোকটি স্প্র্র্ষ। চওড়া ব্ক, ক্ষীণমধ্য, বলিষ্ঠ অধ্পপ্রত্যধ্য। কোথাও মাংসের আধিক্য নেই। চবি আছে কি না সন্দেহ। রোদে প্র্ড়ে ব্লিউতে ভিজে বাতাসে শ্রিকয়ে শীতে ফেটে তার দেহ যেন ঋত্-জারিত সেগ্রনকাঠ। কম খায়, কিশ্তু যা খায় তা খাদ্যবিজ্ঞানসিম্ধ, অতএব অসিম্ধ বা অধসিম্ধ। কটিবস্ফ পরিহিত কটুর স্বদেশী, কিশ্তু চীনা বাদাম আর বিলিতী বেগর্নের ষম। সোয়া বীনের চাষ করছে, লেটাস লাগিয়েছে, ম্রগণীও প্রছে। ইংরেজী বই কলকাতা থেকে আনিয়ে পড়ে। আধ্নিক দর্শন ও সাহিত্য তার প্রিয় পাঠ্য। রাজনীতি প্রসংশ্য কথা বলতে চায় না। তবে গান্ধীনীতি ব্রিয়য়ে দেয়।

কানন রপ্নকে চিঠি লিখে বলেছিল রপ্ন যখন কলকাতা যাবে তখন কাননকে জানালে সেও যাবে, জ্যোতিদাকেও নিয়ে যাবে। তিন জনে মিলে মাথা খাটাবে। পার্লবোন থাকলে আরো ভালো হতো, চার জনে মিলে মাথা ঘামাত। কিল্ডু সেটা কলকাতা বা বেগমপ্র কোনোখানেই সম্ভব নয়। সর্বন্ন পাহারা। দেয়লেরও কান আছে।

ললিতকে গোরী ডেকে পাঠিয়েছিল। সে নতুন জামাই হয়ে নিজেকে খেলো করতে রাজী নয়। একবার শর্ধ্ব এক বেলার জন্যে এসেছিল। বলে গেল, "আমাকে বিয়ে করতে হ্রুম করা হয়েছিল, আমি বিয়ে করেছি। ব্যস্। ঐখানেই ফ্রুলস্টপ। ভালোবাসতে হবে এমন তো কোনো কথা ছিল না। তবে বংশরক্ষা বলে একটা কথা আছে বটে, কিন্তু সাব্র চেয়ে আমার চেয়ে বয়সে যারা দেড় গ্রুণ বড় তারা আগে দ্ভান্ত দেখাক।" ললিত এখন য়্যায়সা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে যে গোরীর মর্ন্তির প্রয়োজন স্বীকার করে না। তার মনে কেমন একটা খটকা বেধেছে। গোরী তো যশোবাব্রক একট্ও ভালোবাসে না, ছাড়তে পারলেই বাঁচে। কেন তবে যশোবাব্র বোনের জন্যে এত দরদ! এর পিছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। গোরী গোপন করছে।

বিদ্যাপতির সংশ্যে রত্নর মতান্তর হয়ে যায়। বিদ্যাপতি বলে, "নারীত্বের পরাকাষ্ঠা মাতৃত্ব। যে নারী মা হলো না সে পরিপূর্ণ নারী হলো না। তার সৌন্দর্য পর্নিমার সৌন্দর্য নয়। একালের মেয়েরা কি দ্বিতীয়ার চাঁদ হয়ে ছেলেদের মন পাবে?"

রত্ন বলে, "সেকালের লক্ষ্মী সরস্বতী মা হয়েছিলেন বলে শোনা যায় না। তাঁরা কি তবে পরিপূর্ণা ছিলেন না? আর রাধা? রাধার স্বমা কি কোনো অংশে অপূর্ণ ছিল? ভাই বিদ্যাপতি, কোনো মেয়ে যদি অকালে বিধবা হয় সে কি কারো চেয়ে কম সম্পূর্ণ?"

তার পর একটা ইতস্তত করে যোগ করে, "আর মীরার মতো যদি কেউ অস্থী হয়, যোগিনী হয়, ঘরসংসার ছেড়ে দেশে দেশে যায় তা বলে কি সে কারো চেয়ে কম সান্দর?"

বিদ্যাপতির মন মানে না। তার বন্তব্য এই যে মাতৃত্বের অনুভূতি না হলে

চরম অন্ভূতি বাকী রয়ে গেল। সেই সংখ্য পরম সৌন্দর্য। তার কি কোনো প্রতিপ্রেণ আছে?

রত্ন জবাব দেয়, "তা হলে বলতে হয় পিতৃত্বের অন্তুতিও সমান চরম। পিতা হলেই পরম সোন্দর্য। আমিও মানছি যে রসের সাধনায় ওটিও একটি ধাপ, অকারণে উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সন্তান কি চাইলেই হয়? হলো না বলে কি আমরা অপরিপূর্ণ থাকব? কখনো না।"

পনেরো

অবশেষে এলো সেই মাঘী পর্নিমার রাত, যে রাতে রত্ন পেয়েছিল শ্রীমতীর প্রথম পরিচয় প্রভাতের মুখে। এক বছর আগে।

সেই প্রিমা, সেই প্রতা, সেই সোল্বর্য, সেই বসল্তের প্রাভাষ। উন্মনা হয়ে ঘ্রেরে বেড়ায় রত্ন, যেদিকে দ্বাচাখ বায়। শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামাল্তরে, মাঠের ব্রকের উপর দিয়ে, পায়ে চলার পথ ধরে। আম গাছে বোল ধরেছে, শিম্বল গাছে আলতা রঙের ক্রিড়। কোকিলের কুহ্ব এখনো খোলেনি। হাজার পাখীর কলরব।

দিশাহারা হয়ে ঘ্রে বেড়ায় রয়। ক'টা বাজল হোঁশ নেই। কোন য্গ, কোন শতাব্দী খেয়াল নেই। রূপকথার জগতে এসে পড়েছে। সে জগৎ এ জগৎ নয়। পদে পদে রোমাণ্ড লাগে। এই পথ দিয়ে ওরাও গেছে। ওইসব রাজপুত্র মন্ত্রী-পত্র কোটালপ্র সওদাগরপ্রের দল। দলের পর দল। দল পরম্পরা। দল থেকে ছিটকে পড়েছে শুধু একজন। সে আজ একা। তাই তার গা ছমছম করে।

একা? না, আরো একজন আছে। অলক্ষ্যে। সে তাকে একখানি অপর্প চিঠি লিখেছে। চিঠির প্রত্যেকটি কথা তার মনে গাঁখা। লিখেছে—

কাশ্ত, আমার তো প্রত্যয় হয় না যে তোমাকে আমি কোনো দিন চোখে দেখতে পাব। তুমি আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেলে এ জন্মের মতো। এ যে কী দ্বঃসহ যন্ত্রণা কেমন করে তোমাকে বোঝাব! তুমি আছ, আমি আছি। কীই বা এমন দ্বেছ! ইচ্ছা থাকলে যে কোনো দিন দেখা হতে

পারত। তব্ হর না। হবেও না। যদি না আমি সব দড়াদড়ি কাটিরে তোমার কাছে ছুটে যাই একদিন না বলে কয়ে। খবর না দিয়ে।

তুমি একদিন অবাক হয়ে চেয়ে দেখবে আমি। ভাববে কে এ! চিনিনে তো একে। ছেলেদের হস্টেলে মেয়ে এলো কোন ফাঁক দিয়ে! তোমার বিশ্বাস হবে না যে আমি গোরী খাঁচার পাখী বনের পাখীকে দেখতে এসেছি। খাঁচায় ফেরার পথ খোলা রাখিনি। ফিরলে কেউ আমাকে নেবে না। ওদের ছেলের আবার বিয়ে দেবে। যেখানে যত আত্মীয় আছে সকলের মাথা হেণ্ট হবে, সব দরজা বন্ধ হয়ে য়বে। তখন তুমিই আমার একমার গতি। আমাকে ঘরে নিতে হবে তোমাকেই। তোমার সেই হস্টেলে। তা কী করে হবে? ওরা হতে দেবে কেন? তুমি ফাঁপরে পড়বে। কিন্তু আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না। আমি যে অসহায় নারী। শরণাগতা। তুমি যে নাইট। শরণাগতা।

আমার হাত ধরে তুমি বেরিয়ে পড়বে হস্টেল ছেড়ে কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে সংসার ছেড়ে সমাজ ছেড়ে। বেরিয়ে পড়বে, পিছন ফিরে তাকাবে না। হাত ধরে চলবে, হাত ছেড়ে দেবে না। সব ছাড়বে, হাত ছাড়বে না। আমার হাত তোমার হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। মাঝখানে পাহাড় এলেও না, পাথার এলেও না। মানুষ এলে তো নয়ই। মরণ হলেও না। তুমি আমার হাত ছেড়ে দেবে না, আমি তোমার হাত ছেড়ে দেব না। আমাদের দ্'জনের হাত ছাড়াছাড়ি হবে না। যদি মরি তা হলেও না। যদি বাঁচি তা হলেও না। তুমি আমার প্রাণ, আমি তোমার দেহ। প্রাণ বিনা কি দেহ থাকে? দেহ বিনা কি প্রাণ থাকে? তোমার সঙ্গে আমার দেহপ্রাণ সম্পর্ক। তুমি থাকবে, আমি থাকব, দেহ থাকবে, প্রাণ থাকবে। কী সম্পর্ক হবে, কী সম্পর্ক হবে, খ'জে পাচ্ছিলে না। এই নাও। এই সম্পর্ক হবে। তোমাতে আমাতে দেহপ্রাণ সম্পর্ক। এও একপ্রকার বিবাহ। বন্ধন, কিন্তু কদর্য নয়। রাজী?

ঘ্রুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে রত্ন যখন হস্টেলের পথ ধরল তখন বাইরে ডাকছিল "চোখ গেল।" তার সঙ্গে স্ব মিলিয়ে ভিতরে ডাকছিল "শান্তি গেল।" বার

বার "চোখ গেল," "শান্তি গেল।" "চোখ গেল," "শান্তি গেল।" পাখীর ডাকেরও বিশ্বাম নেই, অন্তরের ধ্বনিরও বিরতি নেই।

আর একট্র দেরি হলেই হস্টেলের লোহকপাট বন্ধ হরে যেত। ঘরের তালা খ্লে আলো জরালিয়ে রত্ন লক্ষ্য করল মেজের উপর এক ট্রকরো কাগজ পড়ে আছে। কুড়িয়ে নিয়ে পড়ল।—"তোমার ঘরে তালা দেখে তোমার খাবার আমার ঘরে দিয়ে গেছে। খেতে এস। প্রভাত।"

খেতে ইচ্ছা ছিল না, তব্ব প্রভাত তাকে প্রত্যাশা করছে বলে রত্ন চলল প্রভাতের ঘরে কাপড়চোপড় না ছেড়েই, হাতম্ব না ধ্রুয়েই। বলল, "ভাই প্রভাত, আজ আমার মন ভরে রয়েছে। পেট না ভরলেও চলে। আমি খাব না।"

সে চলে আসছিল, প্রভাত মৌনভণ্গ করে তাকে বসতে বলল। সারা রাত না খেরে থাকবে? তা কি কখনো হয়? একট্ব কিছ্ব মুখে দিক। অনেক দিন বাদে রত্ন প্রভাতের কণ্ঠশ্বর শ্বনল। অগত্যা বসতে হলো। কিল্কু মাখের শীতে আধ ঘণ্টা বাইরে পড়ে থেকে খাবার জ্বড়িয়ে হিম হয়ে গেছে। চাপাটি যেন চামড়া। সরিয়ে রেখে রত্ন বলল, "প্রভাত, ভাই, এক পেরালা কোকো কি কফি খাওয়াতে পার?"

প্রভাতকে রাত জাগতে হয় পরীক্ষার জন্যে পড়তে। কফি তার রাত জাগানিয়া। হাতের কাছে একটা থার্মোফ্লাম্কে ভরা থাকে। তার থেকে পেয়ালায় ঢেলে রত্নকে দিল, নিজে নিল। খান দুই বিস্কৃট সহযোগে।

কৃষিতে চুম্ব দিয়ে প্রভাত বলল, "রতন, তোমার চেহারা থেকে তো মাল্মে হয় না যে মন ভরে রয়েছে। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঝোড়ো কাকের মতো উস্কোখ্সেকা। ঢলঢলে খন্দরের পায়জামা খোঁচ লেগে ছেড়া খোঁড়া। জরির নাগরা ধ্লোকাদামাথা। কোথায় ছিলে তুমি এত ক্ষণ? গঙগার ধারে?"

এর উত্তরে রত্ন বলল, "বাতিটা চোখে লাগছে। বল তো নিবেয়ে দিই। ঘরে চাঁদের আলো আস্কুন। ধন্যবাদ। ভাই প্রভাত, এটা কোন রাত তোমার মনে আছে?"

"চয়োদশী বোধ হয়।"

"দ্রে! প্রিমা। মাঘী প্রিমা। এক বছর আগে এই রাতে যার পরিচয়

দিরেছিলে সে একদিন আমার জীবনে এলো। অভাবনীয়। তার পর থেকে অভাবনীয়ের যেন অন্ত নেই। পদে পদে চমক। ক্ষণে ক্ষণে চমক। ভাই, তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানিনে, আমা-হেন মান্মকেও একজন ভালোবেসেছে। আমি তো বিশ্বাস করতেই চাইনি, আমল দিইনি, উড়িয়ে দিরেছি। কাননকে সামনে ঠেলে দিরেছি যাতে ভালোবাসার পাত্রান্তর হয়। ধরা দিইনি, এড়িয়ে গেছি, পালিয়ে বেড়িয়েছি। নিজের প্রতিভার উপর আমার আস্থা ছিল, কিন্তু পোর্বের উপর ভরসা ছিল না। লোকে বলত আমি নাকি মেয়েলি। এখন মনে হচ্ছে আমি প্র্যুখ। নইলে গ্রীমতীর মতো মেয়ে আমার প্রেমে পড়ত না। তার প্রেম আমার পোর্বের প্রথম অভিজ্ঞান।"

প্রভাত স্তব্ধ হয়ে শ্নাছিল। স্থাল, "তুমিও কি ওর প্রেমে পড়েছ?" রঙ্গ পদ্মরাগের মতো রক্তিম হলো, কিন্তু তার মুখে ছায়া পড়েছিল। তাই দেখা গেল না। সামলে নিয়ে বলল, "আজ এত দিন পরে মনে হচ্ছে আমিও প্রেমে পড়েছি ওর।"

এর পরে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল তার নিজের ন্বিধান্বন্দের বিবরণ।

"তুমি তো জান আমি মালাদির উপাসনা করতুম। তিনিই আমার ভগবান। ভগবান আমার কাছে তাঁরই রূপ ধরে এসেছিলেন। মালাদির প্রতি অনুগতথেকে শ্রীমতীকে কী করে ভালোবাসতে পারি! সেইজন্যে আমি প্রাণপণে মালাজপ করেছি। শ্রীমতীর ফোটোগুলো একবারের বেশী দেখিন। প্রতি রাত্রে মালাদির ধ্যান করেছি। কাল রাত্রেও। আজ মনে হচ্ছে এত দিন বা আমি করেছি তা মালাদির প্রজা নয়, আমার মানসী নারীর প্রতিমা গড়ে সেই মন-গড়া প্রতিমার প্রজা। প্রতিমাভংগকারী আমি প্রতিমাপ্তক হয়েছি। ভগবান তাই আমার কাছে গোরী রূপ ধরে এসেছেন। প্রতিমা ভেঙে গেছে।"

প্রভাত বলল, "গোরী বৃঝি ওর ডাক নাম?"

"হাঁ। বেহারে ওর জন্ম। মাতুলালয়ে।"

প্রভাত আর একট্র কফি ঢেলে রত্নকে দিল। নিজে নিল। তার পর?

"তার পর তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলে প্যাশনের। বলেছিলে, শ্রীমতীর চোখে কী প্যাশন! আমি তো ভয়ে ওর দিকে তাকাতেই চাইনি। ফোটোকেও

ভয়। আমার যা শরীর আর আমার যে স্বভাব আমার পক্ষে ঠান্ডা থাতের মেরেই ভালো। গরম থাতের মেরেকে আমি সন্থী করতে পারব না। ও আমাকে ছাড়বে কিংবা মারবে। দুই ভয়াবহ। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সিম্থান্ত নিতে হলোযে আমি প্রবৃষ, আমি সম্মুখীন হব। জন্মতে হয় জন্মব। ভূগতে হয় ভূগব। আমার ভয় ভেঙে গেছে। যেমন ভেঙে গেছে প্রতিমা।"

প্রভাত হতভদ্ব হয়ে বলল, "তার পর?"

"তার পর যে মেয়ে বয়সে বড় তাকে আমি দিদির মতো সমীহ করি, শ্রন্ধা করি। তার সভ্যে মাটেই সহজ ও স্বাধীন বাধ করিনে। তার কাছে তটস্থ হয়ে থাকি। তার গায়ে হাত দিতে সাহস পাব না, গায়ে হাত দিলে মনে হবে পবিশ্রকে অপবিশ্র করল্ম। প্রজা কি তা হলে চিরকাল দ্র থেকে হবে? দ্রম্ব থাকলে সায্রজ্য হয় কথনো? আমার যা ধর্মমত তাতে প্রজা বলতে সব কিছুই বোঝায়। তার আদিতে বিরহতাপ, অল্ডে প্রমিলন। এর মধ্যে অপবিশ্রতা নেই। কিন্তু এমনি আমার সংস্কার যে বয়সে বড় হলে গোরীকেও আমি মালাদির মতো বরাবর পরিহার করতুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে আমার ছামাসের ছোট।"

প্রভাত হঠাৎ রসভণ্গ করে বলল, "তা হলেও তুমি বয়সে বড় নও। তোমার বয়স বাড়ছে না। বরং দিন দিন কমছে। তুমি বেমন আনপ্র্যাকটিকাল ছিলে তার চেয়েও বেশী হয়েছ। তুমি ধরে নিচ্ছ যে শ্রীমতী তার স্বামীর কাছ থেকে ছাড়পত্র পাবে, তোমার মতো গরিবকে বিয়ে করবে, তোমার স্ব্ধদ্ঃখের সন্ধিনী হবে। অসম্ভব! অবাস্তব! অকল্পনীয়! আঘটনীয়! যাও, শ্রেয়ে পড় গে। কাল রাত্রে ভূলে যাবে আজ রাত্রের পাগলামি। আমিও আজ আর দেরি করব না। তুমি আমার মাথা ধরিয়ে দিলে।"

রত্ন উঠছিল। কী মনে করে প্রভাত তাকে আবার বসতে বর্লল। আরো কফি দিল। সে ব্রুতে পারল প্রভাত কিছ্ব বলতে চায়। কত কাল বলার স্বুযোগ হয়নি।

"রতন, আমি কেন মৌন হয়েছি, জান?" "জানি বই-কি। পরীক্ষার পড়ায় মন দিতে।"

"মন দিতে পারছি কোখায়? জোর করে মন দিলে কি পড়া ভালো হয়? তব্য তোমার সংগ্য কথা বলতে ভয় পাই।"

"ভ-র পাও!" রত্ন অবিশ্বাস করল। "তোমার মতো ছেলে ভর পার!" প্রভাত কী ষেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু চেপে গিয়ে কৌশলে খ্রিরের বলল, "তা নর। তুমি তো জান আমি প্রেমে বার্থ হয়েছি। এর উপর যদি পরীক্ষার বার্থ হই তা হলে কি আমি জীবনসংগ্রামেও বার্থ হব না! রাত্রে আমার ঘ্রম হয় না, ঘেমে উঠি, ভয় হয় যে আমি হয়তো সব দিক দিয়ে বার্থ হতে বাচ্ছি। আমার জীবন বংখ।"

রত্ন বলল, "আমার কিন্তু পরীক্ষার ভয় নেই। আর জীবনসংগ্রামের ভাবনা যদি বল, জীবনকে আমি সংগ্রাম বলে ভাবিনে, সন্তরাং সে ভাবনাও আমার নেই।"

"কেন, বল তো? তুমি এমন কী সচ্ছল?"

"সচ্ছল! তুমি কি জান না আমাদের অবস্থা! কিন্তু আমার জীবনদর্শন হলো এই যে, মানুষ কী খাবে কী পরবে কোথার থাকবে এসব চিন্তার সমরক্ষেপ করবে না। সমরক্ষেপ মানেই জীবনক্ষেপ। জীবনের অপচর। তার বদলে ধ্যান করবে পরম সোক্ষেরে। অনুষ্ঠান করবে পরম কল্যাণের। অন্বেষণ করবে পরম সত্যের। সাধনা করবে পরম প্রেমের। এমনি করে সে অম্তের প্র অম্ত হবে। আমার ভাবনা যদি থাকে তবে তা মৈরেরীর মতো। যা দিরে আমি অমৃত না হব তা দিরে আমি কী করব!"

"তার জন্যে," প্রভাত ব্যাণ্গ করল, "একটি মঠবাড়ী দরকার। ভক্তরা সব কিছু জোগাবে। তুমি মালা জপবে আর চোখ বুজে খাবে। কিন্তু তুমি তো বলছ, মালাজপ ছেড়ে দিয়েছ। এখন থেকে গোরীনাম সংকীতন। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে উক্ত মহিলার ভোগবিলাস অত অলেপ মিটবে না।"

রত্ন প্রতিবাদ করে বলল, "গোরী ভোগবিলাসের ধার ধারে না। ওর মতো ত্যাগী মেয়ে ভূভারতে নেই।"

"বটে!" প্রভাত বলল শেলষের সঞ্গে, "তুমি বেন কত কাল থেকে ওকে চেন! দেখতে দেখতে চুল পেকে গেল! না, রতন?"

রক্ন অভিমানে কথা বলল না, শুধু উঠবে বলে উসখ্স করতে লাগল।

"রাগ কোরো না, লক্ষ্মিটি। আমার বন্তব্য আর কিছ্ম নর, এই। বার সংগে তোমার সাক্ষাং পরিচয় নেই তার সম্বন্ধে অলীক ধারণার উপর ভিত্তি করে কোনো রকম সিম্ধানত নিতে যেয়ো না। আমি যত দ্রে জানি ওটি একটি শ্বেতহঙ্গিতনী। হাভীপোষার ক্ষমতা তোমার নেই ও হবে না। তবে, হাঁ, তোমার বাস্তববোধ জাগবে।"

রঙ্গ প্রতিবাদ করল। তার পর কাতরভাবে বলল, "আমার শান্তি গেছে।"
"শানে দ্বঃখিত হল্ম। আমার শান্তি ফিরে এসেছে। আর তোমার গেছে।"
প্রভাত বলল গম্ভীর হয়ে, "তোমাকে আমি প্রথম থেকেই সতর্ক করে দিয়েছি।
কিন্তু তুমি, ভাই, এমন ছেলে বে, বেটি করতে বারণ করব সেই জিনিসটি
করবেই করবে। আগানে হাত দিয়ো না বললে আগানেই হাত দেবে তুমি।
বার বিরুম্থে হুশিয়ারি তারই খম্পরে পড়া চাই। তুমি কিনা স্বভাববিদ্রোহী।
শান্তি গেছে। বাবেই তো। কার দোব।"

রত্ন অম্লানবদনে বলল, "তুমিই তো ওর সঞ্চো আমার পরিচয় ঘটালো। দোষ তোমারই। কেন তুমি আমাকে ওর বর্ণনা দিতে গেলে?"

"তা বলে কি আমি তোমাকে ওর প্রেমে পড়তে বলেছিল্ম ?"

"প্রেমে পড়তে কি আমিই চেরেছিল্ম ! একটি বছরকাল প্রতিরোধ করে আজ্ব দেখছি প্রেম অপ্রতিরোধ্য। ভাই প্রভাত, ঐরাবতের মতো আমি ভেসে যাচ্ছি।"

প্রভাত দেনহভরে তার বন্ধর হাতে হাত রাখল। গাঢ়ন্দরে বলল, "আমি লক্ষ করেছি। কী করব, তুমি তো আমার কথা শন্নবে না। ভাই রতন, প্রেম অবশ্য বড় জিনিস, কিন্তু প্রেব্ধের জীবনের প্রেব্ধার্থ নয়। প্রেমের জন্যে অনেক কিছ্র দেওয়া যায়, কিন্তু সব কিছ্র দেওয়া উচিত নয়। ওসব মেয়েয়া পারে। ওদের তো পাবলিক লাইফ নেই। আমাদের পাবলিক লাইফ আছে। আমরা একদিন বিখ্যাত হব, যশন্বী হব। দেশবান্ধব প্রভাতমোহন মৈয়, দেশরত্ম রত্মকান্ত মল্লিক। প্রেমের জন্যে আমরা কি আমাদের উল্জব্বল ভবিষাং বিসর্জন দিতে পারি! গান্ধী রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ চিত্তরঞ্জন এরা কি কেউ পেরেছেন! তুমিই বল, এ কি পারা যায়!"

রত্ন বলল তেমনি গাঢ়স্বরে, "ভাই প্রভাত, আমার সে রক্ম কোনো উচ্চাভিলাব নেই। ধন মান জনপ্রিয়তা বশ ইত্যাদির জন্যে আমি লেশমার চেন্টা করব না। বদি আপনা হতে আসে আমি আসতে দেব, বদি আপনা হতে যার আমি যেতে দেব। কিন্তু যা বা নিয়ে আমি থাকতে চাই, বা যা এলে আমি ধন্য হই, বা যা গেলে আমি নিঃস্ব হই সেসব হলো প্রেম, স্বাধীনতা, স্ভিতপ্রেরণা, সত্যনিন্টা, সৌন্দর্যত্বা, ন্যায়পরায়ণতা, কল্যাণবােধ। ভাই প্রভাত, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে আমার গােরীর সন্থে মেলালে।"

প্রভাত কী যেন বলতে চাইল আবার। পারল না। দমন করল। রত্ন লক্ষ করল না। সে তার ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়ল, হাত মূখ ধ্য়ে দাঁত মেজে চির্নি দিয়ে চুল আঁচড়াল। তার পর গোরীর ফোটোগ্রিল বাক্স থেকে বার করে টেবিলে সাজিয়ে রেখে গোলাপের পাপড়িগ্রিল বিছানায় ছড়িয়ে দিল। তার পর গায়ে একটা আলোয়ান জড়িয়ে অত রাত্রে চিঠি লিখতে বসল। গোরীকে। তার কাশ্তাকে।

অনেক কথাই লেখবার ছিল সেই স্মরণীয় তিথিটিতে। কিন্তু প্রেম অনেক কথা বলে না, যদি বলে তবে সে প্রেম নয়। প্রেম শুধু একট্খানি স্বর ধরিয়ে দেয়। রম্ব লিখল—

এক বছর পরে সেই রাতটি আবার এলো যে রাতে তুমি প্রথম এলে আমরা চেতনায়। গোরী, সেই দিনটি থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে এসেছি। তোমাকে কি লিখেছি কোনো দিন প্রভাত আমার চোখে তোমার কী ম্তি একছিল? আজ আবিষ্কার করল্ম এত দিনে, ভর বলে যাকে জেনেছি তার আসল নাম ভালোবাসা। ভর তার ছম্মনাম। তোমাকে ভয় করেছি, সেই ছলে ভালোও বেসেছি। নিজের ভালোবাসা নিজের কাছেই গোপন ছিল। আজকেই আমি হাতে নাতে ধরে ফেলেছি সেই চোরকে যে এক বছর ধরে সিঁদ কাটতে কাটতে আমার যথাসর্বস্ব চুরি করেছে। মালাদির প্রতি আনুগত্যও তার মধ্যে পড়ে।

প্রেম, তোমার মতো প্রিয় আমার কেউ নেই। তুমি আমার স্বকীয়া। আমি তোমার স্বকীয়। যে যার সে তার। কবে আমাদের দেখা হবে,

আদৌ হবে কি না, এ নিয়ে আমি ভাবিনে। হলে অভাবিত রুপে হবে।
ক্ষেন করে হলো আমাদের চেনা, আমাদের ভাব, আমাদের ভালোবাসা।
প্রেম, তোমাকে আমি স্বীকার করে নিল্ম। আমার এই স্বীকৃতি আমাকে
মুক্তি দিল। সেইসঙ্গে নিবিড় করে বাঁধল। তাই আমার এক চোখে
হাসি, এক চোখে জল। আজ আমার সিম্বান্তের দিন। তোমার সঙ্গে
আমার সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। তুমি আমার কাশ্তা। আমি তোমার
কাশ্ত

চিঠি লেখা শেষ হতে না হতেই বাতি নিবে গেল। হস্টেলের নিরম। অমনি এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরে ঢ্কল। জ্যোৎস্না ফিনিক ফ্টল। রক্ষ জানালার ধারে গিরে চাঁদের দিকে চেয়ে রইল চন্দ্রাহতের মতো। মনে হলো গোরী চেয়ে আছে তার দিকে। শোবার সময় সে আর মালবিকার ধ্যান করল না। ধ্যান করল শ্রীমতীর।

প্রভাতের কাছে একট্ন আগে যা চাপা ছিল এখন আর তা ছাপা রইল না। উল্লাস। সব শশ্কা, সব জনালা, সব আফসোস ছাপিয়ে উঠে বাজতে থাকল উল্লাসের রাগিণী। উল্লাসের তালে তালে প্রতি অশ্যের প্রতি পরমাণ্যর নাচন শ্রুর হলো। মাতন লাগল শোণিতে শিরায় দ্নায়তে। কোথায় ঘ্না! খালি পেটে কফি পড়লে যা হয়। রঙ্গ একবার শোয়, একবার পায়চারি করে। হঠাৎ কী মনে করে মেজের উপর লাটিয়ে পড়ে। বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণতি পাঠায় কে জানে কোন দেবতাকে! কদ্মৈ দেবায়!

বলে, "মধ্বর, তুমি অনেক দিয়েছ। অশেষ দিয়েছ। নাও, নাও, কী নেবে নাও। নারী রূপে। গোরী রূপে।"

১৩৬২

প্রথম ভাগ সমাণ্ড

